BANGLAPDF.NET
মাসুদ রানা
চরসদ্বীপ
কাজী আনোয়ার হোসেন
শুভম

বাংলাপিডিএফ.নেট

মাসুদ রানা

চরসদ্বীপ

কাজী আনোয়ার হোসেন

ভারত বলছে, তারা বাংলাদেশের বন্ধু; কিন্তু তাহলে নিউক্লিয়ার ওঅরহেডসহ দূর পাল্লার মিসাইলগুলো ঢাকা ও চট্টগ্রামের দিকে তাক করা হয়েছে কেন?

এবার মাসুদ রানাকে শুধু ভারতীয় ওঅর স্ট্র্যাটিজির বিরুদ্ধে নয়, পাকিস্তানের নীতিহীন ইন্টেলিজেন্স সংস্থা আইএসআই-এর বিরুদ্ধেও লড়তে হচ্ছে। ওদিকে স্বঘোষিত এক শয়তান উপাসককে মেরে তাড়াবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, কারণ সে বলছে মহান শয়তানের ক্ষমতা নাকি ঈশ্বরের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।
হোক না সে মূর্তিমান অভিশাপ, নাদিরা আর তার প্রেমকে কিভাবে এড়িয়ে থাকবে রানা?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

SUVOM

মাসুদ রানা ৩১৮

চরসদ্বীপ

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-7318-5

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০২

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩১ ৪১৮৪
জি পি ও বক্স. ৮৫০
E-mail. Sebaprok@citechco.net

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana-318
CHARASHDWEEP
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

চল্লিশ টাকা

Rana- 318

চরসদ্বীপ

কাজী আনোয়ার হোসেন

Scan & Edited By:

SUVOM

Website:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
শুভম ক্রিয়েশন
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ
শু ভ ম
স্ক্যানিং
এডিটিং
শুভম
B
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ*রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন মৃত্যুর ঠিকানা*ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র*প্রমাণ কই? বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার গুপ্তহত্যা *তিনশত্রু *অকস্মাৎ সীমান্ত* সতর্ক শয়তান *নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ পাগল বৈজ্ঞানিক*এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট কুউউ*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি *জিপসী *আমিই রানা সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক*আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন*বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা*বন্দী গগল*জিম্মি তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট*সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার*স্বর্গরাজ্য উদ্ধার*হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা*চ্যালেঞ্জ শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ কামড়*মরণ খেলা অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস *ছদ্মবেশী *কালপ্রিট মৃত্যু আলিঙ্গন*সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য*অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা *সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর*শ্বাপদ সংকুল*দংশন*প্রলয় সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ*জাপানী ফ্যানাটিক সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ* শত্রু বিভীষণ *অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা*অপচ্ছায়া ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩*কালপুরুষ*নীল বজ্র*মৃত্যুর প্রতিনিধি কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা*রক্তচোষা*কালো ফাইল মাফিয়া*হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল*বিগ ব্যাং*অপারেশন বসনিয়া টার্গেট বাংলাদেশ*মহাপ্রলয়*যুদ্ধবাজ*প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি ধ্বংসের নকশা *মায়ান ট্রেজার *ঝড়ের পূর্বাভাস *আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি দুর্গম গিরি *মরণযাত্রা *মাদকচক্র *শকুনের ছায়া *তুরুপের তাস *কালসাপ গুডবাই, রানা* সীমা লঙ্ঘন*রুদ্রঝড়*কান্তার মরু*কর্কটের বিষ*বোস্টন জ্বলছে শয়তানের দোসর*নরকের ঠিকানা*অগ্নিবাণ*কুহেলি রাত*বিষাক্ত থাবা*জন্মশত্রু মৃত্যুর হাতছানি*সেই পাগল বৈজ্ঞানিক*সার্বিয়া চক্রান্ত*দুরভিসন্ধি*কিলার কোবরা মৃত্যুপথের যাত্রী*পালাও, রানা! *দেশপ্রেম *রক্তলালসা *বাঘের খাঁচা সিক্রেট এজেন্ট *ভাইরাস X-99 *মুক্তিপণ *চীনে সঙ্কট *গোপন শত্রু মোসাদ চক্রান্ত।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে এর প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

এক

'লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক...'

প্রায় বিশ লাখ মুসল্লি মক্কার বাইরে মিনা উপত্যকায় জড়ো হচ্ছেন। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছেন তাঁরা, আজ রাতটুকু মিনায় কাটিয়ে কাল হজ ব্রত পালন করবেন।

এটা ভিডিও ক্যামেরায় ধারণ করা গত বছরের অনুষ্ঠান, দেখানো হচ্ছে বাংলাদেশ বিমানের একটা বোয়িং-এর টিভি মনিটরে। বোয়িংটা বোম্বে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে আছে যাত্রাবিরতির নির্ধারিত সময় পার হবার পরেও।

এ বছর বাংলাদেশ বিমানের এটাই শেষ হজ ফ্লাইট। সব মিলিয়ে দুশো সত্তরজন আরোহী। বলাই বাহুল্য, সবাই তাঁরা হজ করার নিয়ত নিয়ে ঢাকা থেকে রওনা হয়েছেন। বেশিরভাগই প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ। মহিলাদের সংখ্যা মাত্র পনেরোজন, তাঁদেরও বয়স কারও পঞ্চাশের নিচে নয়। তবে পাঁচ থেকে এগারো বছরের সাতটি শিশু-কিশোর আছে। আরোহীরা জানেন না নির্দিষ্ট সময় পার হবার পরও প্লেন কেন টেক-অফ করছে না। এ-ব্যাপারে কেউ কোন প্রশ্ন তোলার আগেই ক্যাপটেনের নির্দেশে ভিসিআর অন করে গত বছরের হজ অনুষ্ঠান দেখাবার আয়োজন করেছে ফ্লাইট স্টুয়ার্ডরা। তাতে কাজও হয়েছে। আরোহীরা হজ পালনের প্রতিটি আনুষ্ঠানিকতা গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেখছেন। টেক-অফ করার প্রায় সকল প্রস্তুতি শেষ করার পর আধ ঘণ্টা পেরিয়ে

গেছে, তবু এখন পর্যন্ত কাউকে উদ্বিগ্ন বলে মনে হচ্ছে না। তবে আরোহীরা কেউ প্রশ্ন করলে এই দেরি হবার কারণ স্টুয়ার্ড বা সাধারণ ফ্লাইট ক্রুরা ব্যাখ্যা করতে পারবে না। তারা নিজেরাই জানে না কেন দেরি হচ্ছে।

ফ্লাইট ডেকে একটা থমথমে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। আধ ঘণ্টা আগে টেক-অফ করার অনুমতি চাওয়া হয়েছিল, কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে তখনই দুঃসংবাদটা দেয়া হয়। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের একটা যাত্রীবাহী বোয়িং দিল্লি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে রওনা হয়ে ইথিওপিয়ার আদ্দিস আবাবায় যাচ্ছিল, ভারতীয় মেইনল্যান্ড পিছনে ফেলে তিনশো কিলোমিটার যাবার পর প্লেনটা নিখোঁজ হয়ে গেছে। মেইনল্যান্ড ত্যাগ করার আগেই বোম্বে এয়ারপোর্টের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল পাইলট। কন্ট্রোল টাওয়ারকে কোন রকম যান্ত্রিক গোলযোগের কথা জানায়নি সে। আবহাওয়া ছিল খুবই অনুকূল—মেঘমুক্ত আকাশ, বাতাসের গতিবেগ স্বাভাবিক। তারপরই একটা বিস্ফোরণের শব্দ বেরিয়ে এলো কন্ট্রোল টাওয়ারের রেডিও থেকে। পরমুহূর্তে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কন্ট্রোল টাওয়ারের আতঙ্কিত টেকনিশিয়ানরা মরিয়া হয়ে চেষ্টা করল, কিন্তু প্লেনটা থেকে আর কোন সাড়াই পাওয়া যায়নি।

ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের ওই বোয়িং-এ নয়জন ক্রুসহ দেড়শো যাত্রী ছিল। তাদের মধ্যে ভারতীয় বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে একদল ব্যবসায়ীও আদ্দিস আবাবায় যাচ্ছিলেন ইথিওপিয়ায় বেসরকারী পুঁজি বিনিয়োগের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করার জন্যে।

এরকম একটা দুঃসংবাদে স্বভাবতই বাংলাদেশী বোয়িং-এর ফ্লাইট ডেকে শোকের ছায়া নেমে এলো। ক্যাপটেন সিদ্ধান্ত নিলেন, আরোহীদের খবরটা জানাবার দরকার নেই, কারণ তাতে আতঙ্ক ছড়াবার আশঙ্কা আছে।

দুঃসংবাদটা দেয়ার সময়ই কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে ক্যাপটেনকে জানানো হয়েছে, দিল্লি থেকে টেক-অফ করা ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের ওই প্লেন নিখোঁজ হবার সময়, অর্থাৎ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হবার মুহূর্তে যেখানে ছিল, ঠিক ওই জায়গার ওপর দিয়েই বাংলাদেশী বোয়িং-এর দুবাই হয়ে জেদ্দায় যাবার কথা, তাই টেক-অফ করার অনুমতি দিতে ইতস্তত করছে তারা। অন্য কোন এয়ারলাইন্সের প্লেন ওই সময় ওই এলাকায় ছিল কিনা জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। অকুস্থল বোম্বে থেকে যতটা দূরে, করাচী থেকে তারচেয়ে কিছুটা কাছে, তাই করাচী এয়ারপোর্টের কন্ট্রোল টাওয়ারের সঙ্গেও যোগাযোগ করে জানতে চাওয়া হয়েছে তারা কিছু জানে কি না। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, প্রশ্ন শুনে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল করাচী কন্ট্রোল টাওয়ার। তারপর রেডিও অপারেটর অত্যন্ত কর্কশ ও রূঢ় ভাষায় বলল, পাকিস্তানের লেজে পা দেয়া হলে এমন ছোবল মারবে তারা, বিষের জ্বালায় গোটা ভারত ছটফট করবে। কি প্রশ্নের কি জবাব! করাচী কন্ট্রোল টাওয়ারের এরকম উদ্ভট প্রতিক্রিয়ায় বোম্বে কন্ট্রোল টাওয়ার স্বভাবতই হতভম্ব হয়ে পড়েছে। তাদের সন্দেহ, প্লেনটা নিখোঁজ বা বিস্ফোরিত হবার পিছনে পাকিস্তানের হাত থাকতে পারে।

কিন্তু দশ মিনিটের ব্যবধানে ওই একই এয়ার স্পেস-এর ওপর দিয়ে উড়ে এলো দুটো বোয়িং—একটা ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের যাত্রীবাহী বিমান, এলো দুবাই হয়ে লন্ডন থেকে; আরেকটা সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের কার্গো প্লেন, এলো কুয়েত হয়ে আমস্টারডাম থেকে। নির্বিঘ্নে বোম্বে এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করল ওগুলো। কন্ট্রোল টাওয়ারের প্রশ্নের জবাবে বোয়িং দুটোর পাইলটরা জানাল, আরব সাগরে তারা কিছু আবর্জনা ভাসতে দেখেছে, ওগুলো নিখোঁজ প্লেনটার ধ্বংসাবশেষ হলেও হতে পারে। না, জীবিত কোন মানুষ তারা দেখেনি।

সাত মিনিট পর আরও একটি প্লেন ল্যান্ড করল বোম্বে

এয়ারপোর্টে, যাত্রাবিরতি শেষে দুবাই থেকে রওনা হয়ে একই এয়ার স্পেস-এর ওপর দিয়ে এসেছে। এটা একটা এনজিও-র চার্টার করা কার্গো প্লেন। এর পাইলটও আরব সাগরে কিছু আবর্জনা দেখেছে। তবে না, জীবিত কোন মানুষকে পানিতে ভাসতে দেখেনি।

তিনটে প্লেন নির্বিঘ্নে চলে আসায় বোম্বে কন্ট্রোল টাওয়ার এরপর স্বভাবতই সংশ্লিষ্ট এয়ার স্পেসকে নিরাপদ বলে ধরে নিল। নির্দিষ্ট সময়ের পঞ্চাশ মিনিট পর বাংলাদেশী বোয়িংকে টেক-অফ করার অনুমতি দিল তারা। তবে সাবধানের মার নেই ভেবে বোয়িং-এর ফ্লাইট প্ল্যান ঠিক রেখে এয়ার রুট সামান্য একটু বদলাতে বলা হলো। বাংলাদেশী বিমান এখন দুবাই পৌঁছানোর জন্যে কোন সরলরেখা অনুসরণ করবে না, পাকিস্তান থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকার জন্যে একটু বাঁকা পথ ধরে এগোবে। এই পরামর্শ দেয়ার আরও একটা কারণ হলো, ভারতীয় নৌ-বাহিনীর দুটো উদ্ধারকারী জাহাজ ও বিমান বাহিনীর এক ঝাঁক রেসকিউ হেলিকপ্টার অকুস্থলের দিকে রওনা হয়েছে, তাদেরকে নির্বিঘ্নে কাজ করতে দেয়ার জন্যে এলাকাটা খালি রাখতে পারলে ভাল হয়।

নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টা পর দুশো সত্তরজন হজযাত্রী নিয়ে টেক-অফ করল বাংলাদেশ বিমানের বোয়িং। অনিবার্য কারণবশত দেরি হবার কথা বলে আরোহীদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিলেন ক্যাপটেন।

আরব সাগর বা ভারত মহাসাগর, যাই বলা হোক, বোম্বে থেকে প্রায় চারশো কিলোমিটার দূরে চরস নামে একটা দ্বীপ আছে ভারতের। একটু ঘুর পথ ধরে আসায় সরাসরি ওই দ্বীপের ওপর চলে এলো বাংলাদেশ বিমানের বোয়িং। বোম্বে কন্ট্রোল টাওয়ারের সঙ্গে এখনও যোগাযোগ রক্ষা করছে পাইলট। প্রায় ত্রিশ হাজার ফুট ওপর থেকে পাহাড় ও জঙ্গল ছাড়া দ্বীপটার আর

কোন বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ল না। ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ার দ্বীপ থেকে প্রায় বিশ মাইল দক্ষিণে একটা সুপারট্যাংকার দেখতে পেয়ে ইঙ্গিতে সেদিকে কো-পাইলটের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। এর কারণ হলো, সাগরের বিশাল একটা এলাকা জুড়ে ওটা ছাড়া আর কোন জাহাজ দেখা যাচ্ছে না।

এরপর মর্মবিদারক যে ঘটনাটা ঘটল তার একমাত্র সাক্ষী হয়ে থাকল ওই সুপারট্যাংকারটি।

এ এমন এক সময়ের ঘটনা, যখন মার্কিনিদের সাহায্য নিয়ে চরম মৌলবাদী তালেবানরা আফগানিস্তান থেকে রুশ সৈন্যদের মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে; অন্যদেশের যুদ্ধক্ষেত্রে এই পরাজয়ের হাত ধরে নিজেদের দেশে হাজির হয়েছে রাজনৈতিক বিপর্যয়, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। একের পর এক বিভিন্ন রাজ্য ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করছে, দখল করে নিচ্ছে সামবিক স্থাপনা, মিলিটারি হার্ডওয়্যার-এর গুদাম, যুদ্ধজাহাজ, এয়ারফোর্স বেইস, মিসাইল ঘাঁটি ইত্যাদি। এই চরম বিশৃংখলা ও অরাজক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কিছু সামরিক অফিসার তাদের ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল। ঠিক তাদের দলে ফেলা না গেলেও, স্বেচ্ছাচারিতার দিক থেকে সবাইকে ছাড়িয়ে গেল একজন মেজর জেনারেল। তার নাম সের্গেই গোরস্কি।

ক্রেমলিন কর্মকর্তাদের প্ল্যান ছিল তালেবানদের পরাজিত করতে পারলে আফগানিস্তানে তারা স্থায়ী মিসাইল ঘাঁটি তৈরি করবে, কাবুল হবে রাশিয়ার বর্ধিত বাহু। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আফগাস্তিানে তারা মিসাইল পাঠাতে শুরু করে। প্রথম চালানে দূর, নিকট ও মাঝারি পাল্লার সত্তরটা মিসাইল ছিল, এগুলোর মধ্যে দশটা ছিল আইবিএম–ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালেস্টিক মিসাইল, নিউক্লিয়ার ওঅরহেড বহন করার ফ্যাসিলিটি

বা কেপাবিলিটিসহ।

তখনও ঘাঁটি, লঞ্চিং প্যাড বা সাইলো তৈরি করা হয়নি, নিউক্লিয়ার ওঅরহেড ও মিসাইলগুলো প্যাকিং-এর ভেতর ছিল। যুদ্ধে তালেবানদের কাছে রুশ সৈন্যরা হারছে, ওদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নও ভেঙে পড়ার উপক্রম করছে, এই অবস্থায় ক্রেমলিন থেকে জেনারেল গোরস্কির কাছে নির্দেশ পাঠানো হলো, মিসাইল ও নিউক্লিয়ার ওঅরহেড নিয়ে দেশে ফিরে এসো।

কিন্তু ক্রেমলিনের সেই নির্দেশ অমান্য করে, সমস্ত মিলিটারি হার্ডঅয়্যার এবং সঙ্গী অফিসার ও টেকনিশিয়ানদের নিয়ে আফগানিস্তান থেকে হারিয়ে বা গায়েব হয়ে গেল জেনারেল গোরস্কি। পাকিস্তানের প্রতি তার বিশেষ ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল, নিজের জীবনের বিনিময়ে হলেও চরম একটা আঘাত হেনে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে পাকিস্তানকে মুছে ফেলতে চায় সে। কিন্তু তা করতে হলে নিরাপদ একটা ঘাঁটি দরকার, যেখানে আধুনিক সমস্ত ফ্যাসিলিটি পাওয়া যাবে।

জেনারেল গোরস্কি সিদ্ধান্ত নিল, পাকিস্তানকে শায়েস্তা করার জন্যে ভারতের সাহায্য নেবে সে। হিন্দুকুশ পর্বতমালার কাছাকাছি, একটা এয়ার বেইস-এর তলায়, টানেলের ভেতর লুকানো ছিল তার কনভয়। ব্যক্তিগত প্রতিনিধি মারফত কাশ্মীর হয়ে দিল্লিতে প্রস্তাব পাঠাল সে; তাতে বলা হলো দশটা নিউক্লিয়ার ওঅরহেড সহ সত্তরটা বিভিন্ন পাল্লার মিসাইল গোপনে বিক্রি করা হবে অবিশ্বাস্য কম দামে; শর্ত হলো, জেনারেল গোরস্কি এবং তার সহকারী অফিসার ও টেকনিশিয়ানদের আজীবন রাজনৈতিক আশ্রয় দিতে হবে–বলাই বাহুল্য, গোটা ব্যাপারটা চিরকাল গোপনও রাখতে হবে।

ভারত তখনও পারমাণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটায়নি, তাদের অতি সাধের ক্ষেপণাস্ত্র 'অগ্নি'-ও সাফল্যের মুখ দেখেনি। তবে রুশ সরকার প্রায় শ'ছয়েক মিসাইল দিল্লিকে

উপহার হিসেবে দেয়, সেগুলোকেই ভারত নিজেদের তৈরি 'অগ্নি-১', 'অগ্নি-২', ও 'অগ্নি-৩' হিসেবে প্রচার করতে শুরু করে। এই সব মিসাইল বসানোর জন্যে চরস দ্বীপের একটা অংশে ঘাঁটি তৈরির কাজে হাত দেয় তারা। ঘাঁটি তৈরির কাজ পুরোদমে চলছে, এই সময় জেনারেল গোরস্কির প্রস্তাব পেয়ে ভারতীয় সামরিক কর্মকর্তারা উল্লসিত হয়ে উঠল। রাজনৈতিক নেতাদের প্রভাবিত করতে উঠেপড়ে লাগল তারা, যুক্তি দেখাল প্রত্যাখ্যান করা হলে জেনারেল গোরস্কি এই একই প্রস্তাব পাকিস্তানকেও দেবে, এবং ইসলামাবাদ এত বড় সুযোগ অবশ্যই হাতছাড়া করবে না।

জেনারেল গোরস্কি তার মনের গোপন ইচ্ছাটা সযত্নে চেপে রেখেছে, ভারতকে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে দেয়নি যে পাকিস্তানকে ধ্বংস করাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য। পাকিস্তানের যত বড় শত্রুই ভারত হোক, বিনা প্ররোচনায় অ্যাটম বোমা ফেলে দেশটাকে ধ্বংস করার প্ল্যান কখনোই তারা অনুমোদন করবে না, কারণ মার খেয়ে মার হজম করার মত জাতি পাকিস্তানীরা নয়। এই যুক্তি বোঝে বলেই জেনারেল গোরস্কি ভারতকে আসল কথাটা জানায়নি। তবে, সে কিছু না জানালে কি হবে, ভারতীয় সামরিক কর্মকর্তারা ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে প্রথম থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করে। সেটা অবশ্য অন্য প্রসঙ্গ।

বলতে গেলে প্রায় পানির দরে সত্তরটা মিসাইল ও পঞ্চাশ থেকে একশো মেগাটন ওজনের দশটা নিউক্লিয়ার ওঅরহেড কিনে নিল ভারত। জেনারেল গোরস্কি আর তার সহকারী অফিসার ও টেকনিশিয়ানদেরও গোপনে, আনঅফিশিয়ালি রাজনৈতিক আশ্রয় দেয়া হলো। কড়া ভারতীয় সামরিক প্রহরায় হিন্দুকুশ পর্বতমালা পেরিয়ে জেনারেল গোরস্কির কনভয় জম্মু ও কাশ্মীর হয়ে বোম্বেতে পৌঁছাল, সেখান থেকে নৌ-বাহিনীর কার্গো ভেসেলে তুলে সমস্ত কিছু পাঠিয়ে দেয়া হলো চরস দ্বীপে, সদ্য

তৈরি মিসাইল ঘাঁটিতে। গোপনীয়তা রক্ষার স্বার্থে জেনারেল গোরস্কি আর তার দলের সবাইকে পইপই করে বলে দেয়া হলো, আন্ডারগ্রাউন্ড ঘাঁটি থেকে যখনই তারা গ্রাউন্ড লেভেলে উঠবে, প্রতিবার রাবারের মুখোশ পরে নিতে যেন ভুল না করে। বলা হলো, বিশেষ করে মার্কিন স্যাটেলাইট ক্যামেরাকেই বেশি ভয়—এমনকি রাতের অন্ধকারেও স্পষ্ট ফটো তুলতে সক্ষম ওগুলো।

চোরাই মাল কিনে খুবই লাভবান হলো ভারত; চোরেরাও নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে খুব খুশি। চোরেদের সর্দার জেনারেল গোরস্কি মনে মনে বুদ্ধি আঁটছে, পাকিস্তানের ওপর চরম একটা আঘাত হানার সুযোগ কিভাবে তৈরি করা যায়।

চোরাই রুশ মিসাইল ও নিউক্লিয়ার ওঅরহেডগুলো শুধুমাত্র কমপিউটর আর নির্দিষ্ট রেডিও সিগন্যালের সাহায্যে অপারেট বা অ্যাকটিভেট করা যায়। বিশেষভাবে এই কাজের জন্যে তৈরি করা 'প্রোগ্রাম' যে কমপিউটরে ঢোকানো হয়েছে সেটা রয়েছে ইস্পাতের তৈরি একটা কামরায়, ওই একই কামরায় আছে রেডিও সেটটাও; কামরার ভেতরে ও বাইরে ভারতীয় গুর্খা রেজিমেন্টের সৈন্যরা রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা পালা করে পাহারা দিচ্ছে—বিনা অনুমতিতে রাশিয়ান কেউ তো দূরের কথা, ভারতীয় কোন অফিসারও ওটার কাছাকাছি যেতে পারে না।

ভারতীয় অফিসাররা মিসাইল ও নিউক্লিয়ার ওঅরহেড অপারেট ও অ্যাকটিভেট করার কলা-কৌশল শিখে নেয়ার পর সংশ্লিষ্ট কমপিউটরটিকে নিজেদের হেফাজতে রাখছে। জেনারেল গোরস্কি প্রতিবাদ করলেও ভারতীয় অফিসাররা তাতে কান দেয় না। রাগে ও আক্রোশে মনে মনে বেলুনের মত ফোলা ছাড়া চোরের সর্দারের আর কিছু করারও নেই। প্রতিটি মিসাইলে বিল্ট-ইন কমপিউটর আছে, তবে সেটার সাহায্যে শুধু টার্গেট ফিক্স করা যায়, মিসাইল নিক্ষেপ বা নিউক্লিয়ার ডিভাইস অ্যাকটিভেট করা

যায় না।

ঠিক এই পরিস্থিতিতে ঘরেরই এক শত্রু বিভীষণ হয়ে উঠল। অকস্মাৎ রাতারাতি চরস মিসাইল ঘাঁটি দখল করে নিল কয়েক হাজার সশস্ত্র ফ্যানাটিক। তাদেরকে নেতৃত্ব দিচ্ছে এমন একজন লোক, নিজেকে যে মহান্ শয়তান কর্তৃক প্রেরিত পুরুষ বলে দাবি করছে। সে এবং তার অন্ধ ভক্তরা নগ্ন তলোয়ার হাতে গোটা মিসাইল ঘাঁটিতে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিল।

পরিস্থিতি শান্ত হবার পর দেখা গেল জেনারেল গোরস্কি এবং তার দলকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। স্বভাবতই কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হলো তারা। পরকীয়া প্রেমের হাতছানি উপেক্ষা করতে না পেরে জেনারেল গোরস্কি জড়িয়ে পড়ল গভীর এক ষড়যন্ত্রে–যদিও এ-ব্যাপারে এখনও সচেতন নয় সে। পাকিস্তানের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারে ধৈর্য ধরতে বলা হয়েছে তাকে। ভারতীয় অফিসারদের মতই শাহ বকশীর ইরানী দেহরক্ষীরা তাদের ওপর সারাক্ষণ কড়া নজর রাখছে। তবে তাতে কিছু এসে যায় না, কারণ শাহ্ বকশীর তৃতীয় বেগম নাদিরা বুলবুলি ব্যক্তিগতভাবে তাকে খুবই পছন্দ করে। এতটাই যে রাতদিন যখন খুশি নাদিরার বেডরূমে ঢোকারও অনুমতি দেয়া হয়েছে তাকে। নাদিরা এরকম আভাসও দিয়েছে–অ্যামবিশন পূরণ করার স্বার্থে প্রয়োজনে স্বামীকেও ত্যাগ করতে পিছপা হবে না সে, তখন যদি বন্ধু গোরস্কি সাহায্যের হাত না বাড়ায় তাহলে সে সত্যি দুঃখ পাবে।

তার প্রতি পরমাসুন্দরী নাদিরা এতটা আকৃষ্ট হয়ে পড়ায় গোরস্কি নিজের প্ল্যানও খানিকটা বদলেছে। সে-ও যে নাদিরাকে ভালবাসে, এবং প্রাণ বাঁচানোর জন্যে তার প্রতি কৃতজ্ঞ, এটা বোঝাবার জন্যে মিসাইল অপারেটিং সিস্টেম ও নিউক্লিয়ার ডিভাইস অ্যাকটিভেট সিকোয়েন্স হাতে-কলমে শিখিয়ে দিয়েছে তাকে।

তবে একটি ব্যাপার লক্ষ করে গোরস্কি খুব উদ্বেগের মধ্যে

আছে। মাস্টার কমপিউটরের পাশে যে রেডিও সেটটা ছিল, সেটা হঠাৎ গায়েব হয়ে গেছে। ওই রেডিও সেটটা বিশেষভাবে তৈরি, ওটা থেকে পাঠানো রেডিও সিগন্যাল কমপিউটরকে সচল করতে পারবে, নির্দেশ দিতে পারবে মিসাইল অপারেট ও নিউক্লিয়ার ডিভাইস অ্যাকটিভেট করার; এক অর্থে রেডিও সেটটাকে রিমোট কন্ট্রোলও বলা যেতে পারে। কয়েক হাজার মাইল দূর থেকে সিগন্যাল পাঠালেও মিসাইল ও নিউক্লিয়ার ডিভাইস রেসপন্স করবে।

পাকিস্তানকে ধ্বংস করার জন্যে ওই রিমোট কন্ট্রোলটা জেনারেল গোরস্কির দরকার। কিন্তু…নিশ্চয়ই ব্যাটা শয়তান উপাসক ওটা সরিয়ে ফেলেছে।

এখন আবার ডাক পড়েছে সেই ইস্পাতের ঘরে। আরও একটা যাত্রীবাহী বিমান আকাশ থেকে খসাতে হবে তাকে।

ঘণ্টায় তিনশো মাইল গতিতে ছুটলেও রাশিয়ার তৈরি মিসাইলটার তুলনায় বাংলাদেশী যাত্রীবাহী বোয়িংটাকে মন্থরগতি কচ্ছপ বললেই হয়। তার ওপর, ওটা হিটসীকিং মিসাইল। বাংলাদেশী বোয়িং চরসকে পিছনে ফেলে একশো কিলোমিটার এগিয়ে আসার পর দ্বীপটা থেকে ছোঁড়া হলো মিসাইলটা। উৎক্ষেপণ থেকে লক্ষ্যভেদ পর্যন্ত সব মিলিয়ে সময় লাগল মাত্র বারো সেকেন্ড। রাডারে একটা অস্পষ্ট ইমেজ ধরা পড়লেও, কো-পাইলট বা ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ার পাইলটকে সতর্ক করার সময় পর্যন্ত পেলেন না। যা কিছু ঘটল, চোখের পলকে। রাডারে চোখ থাকায় পাইলট অবশ্য বিস্মিত হবার সুযোগটা পেলেন। তাঁর চোখ বিস্ফারিত হতে শুরু করেছে, এই সময় প্রথম মিসাইল পিছন থেকে আঘাত করল বোয়িং-এর এঞ্জিনে। গোটা প্লেন একটা অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হলো। 'মিসাইল ফ্রম চরস…,' রেডিওতে শুধু এই ক'টা শব্দ উচ্চারণ করতে পারলেন পাইলট, তাঁর অসমাপ্ত বাক্যের মধ্যে

বিস্ময় ও প্রশ্নের সুর। আগুনে ঘি ঢালার মত এই সময় আঘাত করল দ্বিতীয় মিসাইল, সময়ের ব্যবধান মাত্র তিন সেকেন্ড।

মাঝ আকাশে কয়েক হাজার গ্যালন ফুয়েলে আগুন লাগলে প্লেনটার বা আরোহীদের অবস্থা বর্ণনা করার কিছু থাকে না। ফুয়েল ট্যাংক বিস্ফোরিত হবার আগেই গোটা প্লেন আগুনে ঢাকা পড়ে গেল। আগুনের ভেতরই বিস্ফোরণটা ঘটল, তাতে বিচ্ছিন্ন ও ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল বোয়িং-এর ধাতব কাঠামো ও মানুষ। এখন ওগুলোকে আবর্জনা ছাড়া আর কিছু বলার উপায় নেই, সেই আবর্জনার প্রতিটি টুকরো বা কণাও আগুন ছাড়া কিছু নয়।

সুপারট্যাংকার-এর হুইলহাউস থেকে খালি চোখেই ঘটনাটা দেখা গেল। চরস দ্বীপ থেকে নিক্ষিপ্ত মিসাইলের যাত্রা পথ ক্যাপটেন খালি চোখ দিয়ে অনুসরণ করতে পারলেন। ওদিকে ঠিক ওই সময় সুপারট্যাংকারের কমিউনিকেশন রূমে বসে রেডিও অপারেটর তার রেডিওর নব ঘুরিয়ে বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সী ধরার চেষ্টা করছিল, হঠাৎ কাকতালীয়ভাবে বাংলাদেশী বোয়িং-এর ফ্রিকোয়েন্সী পেতেই শুনতে পেল ক্যাপটেনের চিৎকার, 'আ মিসাইল ফ্রম চরস...'

ত্রিশ সেকেন্ড পর ঝড়ের বেগে কমিউনিকেশন রূমে ঢুকলেন ক্যাপটেন, চোখে-মুখে অবিশ্বাস ও বিস্ময়।

'সার!' অপারেটর একটা ঢোক গিলল।

'নিজের চোখে দেখলাম আমরা, অপারেটর।' বললেন ক্যাপটেন। 'চরস থেকে মিসাইল ছুঁড়ে একটা যাত্রীবাহী বোয়িং উড়িয়ে দেয়া হয়েছে...'

'আমিও একটা ডিসট্রেস কল রিসিভ করেছি, সার,' বলল রেডিও অপারেটর। 'তবে পাইলট কলটা শেষ করতে পারেননি...'

'হেলমসম্যানকে আমি ফুল স্পীডে ছুটতে বলেছি,' বললেন ক্যাপটেন। 'এলাকা ছেড়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরে যাওয়া উচিত। তবে আমাদের একটা দায়িত্ব আছে, খবরটা সবাইকে

জানানো দরকার। তুমি এখুনি...'

'প্লেনটা কোন্ দেশী, সার?'

'যে দেশেরই হোক, যারা রেডিও খুলে বসে আছে তারা তিন হাজার মাইল দূর থাকলেও তোমার পাঠানো মেসেজ যেন রিসিভ করতে পারে। আমি ব্রিজে যাচ্ছি।' আবার ঝড়ের বেগেই কমিউনিকেশন রূম থেকে বেরিয়ে গেলেন ক্যাপটেন।

কুয়েত থেকে অপরিশোধিত জ্বালানী তেল নিয়ে শ্রীলঙ্কার কলম্বোয় যাচ্ছে সুপারট্যাংকারটা, কাজেই ক্যাপটেনের অস্থির ও উদ্বিগ্ন হবার যথেষ্ট কারণ আছে। এদিকে প্রচলিত অর্থে কোন যুদ্ধ চলছে না, তারপরও যদি মিসাইল ছুঁড়ে যাত্রীবাহী একটা বোয়িংকে ধ্বংস করে দেয়া হয়, এই নিশ্চয়তা কে দেবে যে তার সুপারট্যাংকার নিরাপদ?

একটু পরই জরুরী বেতার বার্তাটি চারদিকে তিন হাজার মাইল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। তাতে বলা হলো, সম্ভবত বোম্বে এয়ারপোর্ট থেকে টেক-অফ করা একটা যাত্রীবাহী বোয়িংকে ভারতীয় চরস দ্বীপ থেকে ছোঁড়া মিসাইল আঘাত করেছে...

তবে মেসেজটা মাত্র দেড় মিনিট প্রচার করা সম্ভব হলো। অকস্মাৎ ওই একই রেডিও থেকে প্রচারিত হলো অন্য একটা মেসেজ। সেটা জরুরী সাহায্য চেয়ে একটা ডিসট্রেস কল: 'মেডে! মেডে! মেডে! সুপারট্যাংকার সানফ্লাওয়ারে মিসাইল হামলা হয়েছে! মেডে! মেডে! মেডে! মুম্বাই বন্দর থেকে তিনশো নটিক্যাল মাইল পশ্চিমে রয়েছি আমরা। চরস দ্বীপ থেকে নিক্ষিপ্ত মিসাইলের আঘাতে সানফ্লাওয়ারে আগুন ধরে গেছে। মেডে! মেডে! মেডে! আমরা ডুবে যাচ্ছি! গোটা জাহাজে ছড়িয়ে পড়েছে আগুন! মেডে! মে...'

বাংলাদেশী বোয়িং যখন আক্রান্ত হয় তখন সানফ্লাওয়ার ছাড়া কাছাকাছি সাগরে আর কোন জলযান ছিল না, এলাকার আকাশও ছিল খালি। ভারতীয় নৌ-বাহিনীর উদ্ধারকারী জাহাজ ও বিমান

বাহিনীর রেসকিউ হেলিকপ্টারগুলো ছিল চরস থেকে প্রায় একশো নটিক্যাল মাইল উত্তর-পশ্চিমে। দূরত্বের এই হিসাবটা এক সময় গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে, এবং বিশ্লেষণ থেকে বেরিয়ে আসবে প্রকৃত সত্য—ভারতীয় যাত্রীবাহী প্লেনটাকে চরস থেকে নিক্ষিপ্ত মিসাইল দীর্ঘ একটা পথ ধাওয়া করার পর আঘাত করে।

ভারতীয় প্লেনটার বিধ্বস্ত হওয়া কেউ দেখেনি।

বাংলাদেশী বোয়িঙের দুর্ভাগ্য সানফ্লাওয়ারের অফিসাররা চাক্ষুষ করেছেন।

পরপর তিনটে মিসাইল যখন সানফ্লাওয়ারে আঘাত করল, আকাশ থেকে ঘটনাটা পরিষ্কার দেখতে পেল এক ঝাঁক পাকিস্তানী ফাইটার জেটের পাইলটরা। কেন কি ঘটছে, এ-সব কিছুই এখনও পরিষ্কার নয়। কাজেই বলতে হয় অকস্মাৎ আন্তর্জাতিক আকাশ সীমা পার হয়ে ভারতীয় দ্বীপের ওপর পাকিস্তান বিমানবাহিনীর ফাইটার জেটগুলো কেন উড়ে এলো সেটাও একটা বিরাট রহস্য।

সুপারট্যাংকার সানফ্লাওয়ারে মিসাইল আঘাত করার পর যে আগুনটা জ্বলল তার সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন দৃশ্য পাইলটরা জীবনে কখনও দেখেনি। তিন লাখ টন ক্যাপাসিটি, তেল ভরা হয়েছে ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশি তো কম নয়, সেই তেলে আগুন লাগার ফলে শিখাগুলো এমন লাফ দিল যেন ফাইটার জেটগুলোকে টার্গেট করেছে। সাগর ছুঁয়ে উড়ে আসা জেটগুলো দ্রুত দিক বদলে আকাশের ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে। ঠিক এই সময় চরস দ্বীপ থেকে আরও এক ঝাঁক মিসাইল ছোঁড়া হলো।

হিটসীকিং মিসাইল ধাওয়া করছে দেখে ভয় পেয়ে গেল পাকিস্তানী পাইলটরা, সাউন্ড ব্যারিয়ার ভেঙে সুপারসনিক স্পীড তুলল তারা, লেজ তুলে পালাতে দিশে পেল না। সাতশো মাইল পর্যন্ত ধাওয়া করে নিস্তেজ হয়ে পড়ল ভারতীয় মিসাইল, সাগরে পড়ে ডুবে গেল ঝাঁকটা।

ওদিকে পুড়ে ছাই হচ্ছে সানফ্লাওয়ার। মেডে কল অনেক আগেই থেমে গেছে। নাবিক ও ক্রুরা বোটে উঠে আত্মরক্ষা করার কোন সুযোগই পায়নি।

সেদিনের ঘটনা এখানেই শেষ নয়। ভারতীয় নৌ-বাহিনীর উদ্ধারকারী জাহাজকে সাগর থেকে এবং বিমানবাহিনীর রেসকিউ হেলিকপ্টারকে আকাশ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হলো। বলাই বাহুল্য, চরস দ্বীপ থেকে ছোঁড়া মিসাইলের আঘাতেই।

দুই

বাংলাদেশ বিমানের একটা বোয়িং ভারতীয় মিসাইলের আঘাতে বিধ্বস্ত হয়েছে, ক্রুসহ দুশো সত্তরজন হজযাত্রীর মধ্যে একজনও বাঁচেনি, এ-খবর দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল। দুশো সত্তরটা পরিবার এবং তাদের আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে মাতম শুরু হয়ে গেছে। দেশবাসী শোকে যেমন কাতর, বিস্ময়ে তেমনি স্তম্ভিত।

ঘটনাটা সকাল দশটার দিকে ঘটলেও, একের পর এক পরস্পরবিরোধী এমন সব গুজব ছড়াতে শুরু করল যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষে দ্রুত ইতিকর্তব্য স্থির করা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াল। বিকেল পাঁচটার পর রুদ্ধদ্বার কক্ষে শুরু হলো প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে মন্ত্রীসভার জরুরী বৈঠক। তবে তার আগেই বেশ কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। সেগুলো অনুমোদন ও পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণের জন্যেই এই বৈঠক ডাকা হয়েছে। বৈঠকের কাজ শুরু হলো ক্রুসহ নিহত দুশো সত্তরজন হজযাত্রীর

প্রতি সম্মান জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালনের মাধ্যমে।

ভারতীয় হাই কমিশনারকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তলব করে কড়া ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়ে ঘটনার ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে। উত্তরে হাই কমিশনার জানিয়েছেন, ভারত সরকার ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখছে। মন্ত্রীসভা তাঁর এই জবাব প্রত্যাখ্যান করল। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে দেয়া নতুন নির্দেশে বলা হলো, হাই কমিশনারকে আবার তলব করতে হবে। তাঁকে আরও কঠোর ভাষায় বলতে হবে, বারো ঘণ্টার মধ্যে ঘটনার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা এবং যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি না দেয়া হলে বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক বহাল রাখার বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করবে। ভারতীয় জবাবে শোক প্রকাশ করা হয়নি, এ-কথা উল্লেখ করে বলা হলো, এটা অমানবিক এবং কূটনৈতিক শিষ্টাচার বহির্ভূত আচরণ।

ইতিমধ্যে সীমান্তে বিডিআরকে সতর্কাবস্থায় থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বিডিআর, সেনাবাহিনী, পুলিস ও আনসারের সমস্ত ছুটি বাতিল করা হয়েছে পরবর্তী নোটিস না দেয়া পর্যন্ত। গভীর এই সংকটকে পুঁজি করে দেশের ভেতর মৌলবাদী গোষ্ঠি ও স্বার্থান্বেষী মহল অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে, তাই আইনশৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে ঢাকা সহ প্রতিটি বড় শহরে রিজার্ভ পুলিস ও বিডিআরকে টহল দিতে বলা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এ-ধরনের প্রতিটি সিদ্ধান্ত বৈঠকে অনুমোদন করা হলো।

সন্ধ্যায় দ্বিতীয়বার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এসে ভারতীয় হাই কমিশনার ঘটনার জন্যে গভীর শোক প্রকাশ করলেন, সেই সঙ্গে অনুরোধ করলেন প্রতিটি শোক-সন্তপ্ত পরিবারকে যেন ভারত সরকারের তরফ থেকে আন্তরিক সমবেদনা জানানো হয়। শোক প্রকাশে দেরি হবার কথা নিজেই তুললেন তিনি, এবং অকুণ্ঠচিত্তে ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতির কথা উঠতে

বললেন, বিষয়টি ভারত সরকার অবশ্যই যথাসময়ে সহৃদয়তার সঙ্গে বিবেচনা করবে। সবশেষে বারো ঘণ্টার মধ্যে ঘটনার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান প্রসঙ্গ। হাই কমিশনার এই সময়সীমা বাড়ানোর অনুরোধ করলেন। বললেন, বাংলাদেশের মত ভারত নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে-দেড়শো যাত্রীসহ তাদের একটি প্লেন নিখোঁজ হয়েছে, ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে দুটো উদ্ধারকারী জাহাজ, মিসাইল ছুঁড়ে এক ঝাঁক রেসকিউ হেলিকপ্টার ধ্বংস করা হয়েছে। এখুনি প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না, ভারতের ক্ষতি আরও অনেক ভয়াবহ ও ব্যাপক। তবে এই সন্ত্রাসী হামলার উপযুক্ত জবাব দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কেন এই হামলা ঘটল, কারা দায়ী, সংকটের সমাধান কি, এ-সব জানতে কিছু সময়ের প্রয়োজন। সেজন্যেই ভারত অন্তত আরও চব্বিশ ঘণ্টা ধৈর্য ধরার অনুরোধ জানাচ্ছে বাংলাদেশকে।

চব্বিশ ঘণ্টা পর, পরদিন সন্ধ্যায়, পরিস্থিতির নাটকীয় পরিবর্তন ঘটল। ভারতীয় হাই কমিশনারকে তলব করতে হলো না, তিনি নিজেই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে উপস্থিত হয়ে একটা চিঠি হস্তান্তর করলেন। পররাষ্ট্র সচিব এনভেলাপটা খুলতে পারলেন না, কারণ ওটা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে লেখা ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর চিঠি। খবর নিয়ে জানা গেল প্রধানমন্ত্রী এই মুহূর্তে সরকারী বাসভবনে আছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মাধ্যমে সঙ্গে সঙ্গে চিঠিটা সেখানে পাঠিয়ে দেয়া হলো। ভারতীয় হাই কমিশনার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়েই অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

চিঠির বিষয়বস্তু অত্যন্ত গোপনীয়; এতটাই যে প্রধানমন্ত্রীর সরকারী বাসভবন থেকে স্বীকারই করা হলো না ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর কোন চিঠি তারা পেয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর চিঠি পড়া শেষ হতে দ্রুততর হলো কূটনৈতিক তৎপরতা। ভারতীয় হাই কমিশনার তখনও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে

অপেক্ষা করছেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর সঙ্গে বৈঠকে বসে জিজ্ঞেস করলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের কাছ থেকে ঠিক কি ধরনের সাহায্য আশা করছেন?

হাই কমিশনার জানালেন, সেটা ব্যাখ্যা করার জন্যে দিল্লি থেকে ঢাকায় আসতে চাইছেন ইন্ডিয়ান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর চীফ কৈলাস জাঠোর ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নটবর মহাজন। তাঁদের এই বৈঠক প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে চলল।

রাত আটটায় প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানকে টেলিফোন করলেন। কাগজে-কলমে এই ফোন লাইনের কোন অস্তিত্ব নেই, কলটা কারও পক্ষে ট্রেস করাও সম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রী ডায়াল করলেন নিজের বেডরূম থেকে, এই মুহূর্তে সেখানে আর কেউ নেই, জানালা-দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।

প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'আসসালামোআলায়কুম। আপনি ভাল তো?'

রাহাত খান বললেন, 'ওয়ালাইকুম সালাম, মাননীয় প্রাইম মিনিস্টার। হ্যাঁ, আমি ভাল আছি। আপনি?'

'ভাল, জেনারেল। কি ঘটে গেছে তা তো আপনি জানেনই। এ-ও নিশ্চয় জানেন যে ভারতের প্রাইম মিনিস্টার এই সংকট থেকে মুক্তি পাবার উপায় বের করার ব্যাপারে বাংলাদেশের সাহায্য চাইছেন।'

'হ্যাঁ, এই কিছুক্ষণ আগেই কৈলাস জাঠোর টেলিফোনে আমার সঙ্গে কথা বলেছেন।'

'তাহলে তো মতামত দেয়াটা আপনার জন্যে সহজ হয়ে গেল। আর মিস্টার কৈলাস জাঠোরকে ঢাকা রিসিভ করবে কি না, এ সিদ্ধান্ত নেয়া হবে আপনার মতামত জানার পরই।'

রাহাত খান বললেন, 'উনি আসুন। কি বলেন সেটা আমাদের শোনা উচিত।'

'ধন্যবাদ, জেনারেল,' প্রধানমন্ত্রী বললেন। 'কিন্তু পাকিস্তানী ইন্টেলিজেন্স আইএসআই চীফ ইউসুফ হায়দার সম্পর্কে কি ভাবছেন? আমাকে জানানো হয়েছে, ভারতের অনুরোধ রক্ষা করতে রাজি হয়েছে ওরা, এখন শুধু আমরা সম্মতি জানালেই মিস্টার হায়দার ঢাকায় চলে আসতে পারেন।'

'মিস্টার হায়দারের সঙ্গেও আমার কথা হয়েছে,' রাহাত খান বললেন। 'তাঁর বিশেষ প্লেনটা রাত আড়াইটায় জিয়ায় ল্যান্ড করতে পারে, আর মিস্টার জাঠোর পৌঁছতে পারেন আধঘণ্টার মধ্যেই–যদি বাংলাদেশ সরকার অনুমতি দেয়।'

একটু যদি বিস্মিত হয়েও থাকেন, প্রধানমন্ত্রীর কথার সুরে তা প্রকাশ পেল না। 'বোঝা গেল আপনার অমত নেই। বেশ, এয়ারপোর্ট থেকে কিভাবে ওঁরা শহরে ঢুকবেন, মিডিয়াকে কিভাবে এড়ানো যায়, ত্রি-দেশীয় ইন্টেলিজেন্স চীফদের এই টপ-সিক্রেট মীটিং কোথায় বসবে–এ-সব বিষয়ে আপনাকে কারও কিছু বলার দরকার নেই, সেটাও আমি জানি। শুধু একটা প্রশ্ন।'

'জ্বি, বলুন?'

দুই সেকেন্ড বিরতির পর প্রশ্নটা করলেন প্রধানমন্ত্রী, 'আমাদের দুশো সত্তরজনকে কি খুন করা হয়েছে, নাকি ব্যাপারটা স্রেফ দুর্ঘটনা?'

'না, ব্যাপারটা দুর্ঘটনা নয়।'

'তাহলে আরও অনেক প্রশ্ন ওঠে,' একাধারে তিক্ত ও কঠোর হলো প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠস্বর। 'চরস দ্বীপ কি সত্যিই তবে ভারতের হাতছাড়া হয়ে গেছে?'

'দুঃখিত, ম্যাডাম,' রাহাত খান বললেন। 'এ প্রশ্নের উত্তর এখনও আমি জানি না।'

'আরেকটা প্রশ্ন। যদি বেদখলই হয়ে গিয়ে থাকে, যারা দখল করেছে তাদের হাতে কি নিউক্লিয়ার ওঅরহেড আছে?'

'আমাদের ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট বলে, আছে,' বললেন রাহাত

খান। 'তবে কত টনী, সংখ্যায় ক'টা, এ-সব আমরা এখনও জানি না।'

'আমার শেষ প্রশ্ন। এমন আশঙ্কা আছে কি, চরস থেকে বাংলাদেশকে টার্গেট করা হবে?'

'ধারণা করছি ওগুলো দূরপাল্লার মিসাইল, ম্যাডাম। কাজেই বাংলাদেশকে নাগালের মধ্যেই পাবে। তবে নিউক্লিয়ার ওঅরহেড সহ কোন মিসাইল এদিকে তাক করা আছে কি না, এ-মুহূর্তে ঠিক বলতে পারছি না।'

'আজ তাহলে এ পর্যন্তই,' বললেন প্রধানমন্ত্রী। 'আমি আশা করছি আপনারা মীটিঙে বসলে অনেক অস্পষ্টতাই কেটে যাবে। আপনার রিপোর্ট পেলে সরকারের পক্ষেও সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া অনেক সহজ হয়ে যাবে। আপনি কি সরাসরি অফিস থেকে আমাকে ফোন করবেন?'

'অফিস থেকে? না। আপনার অনুমতি পেলে মীটিংটা আমার বাড়িতে আয়োজন করতে চাই।'

'ও, আচ্ছা। ধরে নিন, অনুমতি আপনি পেয়েই গেছেন। আমি তাহলে আপনার ফোনের অপেক্ষায় থাকব।'

একেবারে শেষ মুহূর্তে ওঁদের আগমনের পুরো আয়োজন বদলে ফেলা হলো। সবই নিশ্ছিদ্র গোপনীয়তার স্বার্থে। আইএসআই চীফ ইউসুফ হায়দারের চার্টার করা প্লেনটা ল্যান্ড করল কুমিল্লার আর্মি এয়ারপোর্টে। তাঁকে রিসিভ করল বিসিআই-এর দু'জন এজেন্ট, জাহিদ ও রূপা। ইউসুফ হায়দারের বয়স পঞ্চান্ন, গায়ের রঙ কালো, সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী। প্লেন থেকে মাত্র একজন প্যাসেঞ্জারই নামলেন–তিনি একজন শ্বেতাঙ্গ, বয়স হবে সত্তরের কম নয়, মাথায় হ্যাট, এক হাতে ওয়াকিং স্টিক, আরেক হাতে সাদা একটা ব্রিফকেস। ইনিই ইউসুফ হায়দার, ছদ্মবেশ নিয়ে এসেছেন। প্লেন থেকে নামতেই বিসিআই অফিসাররা তাঁকে ঘিরে

ফেলল, প্রায় নিরেট পাঁচিলের মত একটা আড়াল তৈরি করে দ্রুত হাঁটিয়ে এনে তুলে দেয়া হলো অপেক্ষারত সামরিক হেলিকপ্টারে।

হেলিকপ্টার ল্যান্ড করল জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের প্রায় অন্ধকার এক প্রান্তে, একটা পাজেরো জীপের পাশে। জীপে কোন প্যাসেঞ্জার বা ড্রাইভার নেই। ইউসুফ হায়দারকে নিয়ে পিছনে উঠল রূপা, ড্রাইভিং-এ বসল জাহিদ। আগেই সব ব্যবস্থা করা আছে, কাস্টমস চেকিং বা ইমিগ্রেশন-এর আনুষ্ঠানিকতা এড়িয়ে যাওয়া হলো, খোলা গেট দিয়ে তীরবেগে এয়ারপোর্ট ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো পাজেরো। জানালার কাঁচ টিনটেড, তাছাড়া গাড়ির ভেতর আলোও জ্বলছে না, ফলে বাইরে থেকে আরোহীদের কাউকে দেখা গেল না।

দিল্লি থেকে রওনা হয়ে দ্বিতীয় প্লেনটা ল্যান্ড করল যশোর এয়ারপোর্টে। আইএসএস চীফ কৈলাস জাঠোরও একা এসেছেন। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছে মাসুদ রানা, সঙ্গে ওর প্রাইভেট সেক্রেটারি কাকলি। প্লেন থেকে তসবি গুনতে গুনতে নেমে আসছেন, যেন খুব বড় একজন মৌলানা তিনি–মুখভর্তি ধবধবে সাদা চাপ দাড়ি, মাথায় জরির কাজ করা ঝলমলে টুপি, সাদা রঙের ঢোলা জোব্বা ও সালোয়ার, কাঁধে একটা কালো রেশমি চাদর। ওরা তাঁকে পথ দেখিয়ে একটা সামরিক হেলিকপ্টারে এনে তুলল। হাতের ছোট্ট লেদার ব্যাগটা বুকের সঙ্গে চেপে ধরে আছেন ভদ্রলোক।

হেলিকপ্টার ল্যান্ড করল ঢাকার আর্মি স্টেডিয়ামে। এখানে একটা মার্সিডিজ অপেক্ষা করছিল। মৌলানা সাহেব অর্থাৎ কৈলাস জাঠোর পিছনের সিটে একা বসলেন। গাড়ি ছেড়ে দিল রানা। কাকলি ওর পাশে বসেছে।

মগজ খাটানোই যাঁদের মূল কারবার, শরীর-স্বাস্থ্য ঠিক রাখার প্রতিটি সুযোগই তাঁরা কাজে লাগান। কৈলাস জাঠোর ও ইউসুফ হায়দার দু'জনেই একটানা কয়েক ঘণ্টা প্লেনে থাকার সময় ঘুমিয়ে

নিয়েছেন। ওঁরা কখন পৌঁছাবেন জানা থাকায় রাহাত খানও সুযোগটার সদ্ব্যবহার করলেন। আজ তাঁর এই গুলশানের বাড়িতে প্রাইভেট সেক্রেটারি ইলোরা ওভারটাইম খাটছে, তাকে সাহায্য করছে সোহানা ও স্বাতী। বাড়ির সমস্ত চাকরবাকরকে বলে দেয়া হয়েছে তারা যেন আজ রাতে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত নিজেদের কোয়ার্টার ছেড়ে মূল দালানের ধারেকাছেও না আসে।

দুই অতিথিকে নিয়ে পাজেরো ও মার্সিডিজ আধ ঘণ্টার ব্যবধানে গেট দিয়ে বাড়িতে ঢুকে সরাসরি গ্যারেজের ভেতর থামল; ওখানে দু'জনকেই অভ্যর্থনা জানাল বিসিআই-এর চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার সোহেল আহমেদ। পিছনের একটা দরজা দিয়ে সরাসরি তাঁদেরকে গেস্টরূমে পৌঁছে দেয়া হলো। ওখানে তাঁরা হাত-মুখ ধুয়ে বা শাওয়ার সেরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবেন, পানাহার করবেন, তারপর রাহাত খানের স্টাডিরূমে এসে বসবেন মীটিঙে । সব কিছু ঘড়ির কাঁটা ধরে চলবে। মীটিং শুরু হবে ভোর ঠিক চারটের সময়।

ঘুম ভাঙার পর প্রথমে ফ্রেশ হয়ে নিলেন রাহাত খান। পরপর দু'কাপ কালো কফি খাবার সময় ইন্টারকম অন করে সোহেলের কাছ থেকে জেনে নিলেন তাঁর অতিথিরা ঠিকমত পৌঁছেছেন কিনা। তারপর নির্দেশ দিলেন, 'রানা, জাহিদ, কাকলি আর রূপাকে বাড়ি ফিরে ঘুমিয়ে পড়তে বলো।'

আয়োজন সম্পন্ন করতে যারা এত ছুটোছুটি করল, মূল নাটকে তাদেরকে থাকতে না দেয়ার এই নির্দেশ অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্স বলে মনে হতে পারে, কিন্তু সোহেল বসের সিদ্ধান্তের বিশেষ একটা তাৎপর্য খুঁজে পেল। মীটিঙে কি ধরনের সংকট নিয়ে আলোচনা হবে তা এখনও পরিষ্কার নয়, তবে আঁচ পাওয়া যাচ্ছে বিসিআইকে হয়তো কঠিন কোন দায়িত্ব পালন করতে হতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর দুর্ধর্ষ এজেন্ট ঢাকায় যারা আছে তাদেরকে সুস্থ-সতেজ থাকতে বলাটা অবশ্যই দূরদর্শিতার পরিচয়

বহন করে।

কথাটা শোনার পর রানা ও জাহিদ রাহাত খানকে মনে মনে শালা বুড়ো বলে গাল দিলেও, ওই গাল আসলে ভক্তি-শ্রদ্ধারই অপরিশীলিত প্রকাশ, এবং একটু গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট হলেও বাঙালী সংস্কৃতির সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। নির্দেশের অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পেরে ওরা কোন প্রতিবাদ না করে সুড়সুড় করে নিজেদের গাড়িতে গিয়ে উঠল। রূপা ও কাকলি পিছু নিল, ওদেরকে বাড়ির সামনে নামিয়ে দেয়া হবে।

ঠিক চারটের সময় অতিথিদের নিয়ে বসলেন রাহাত খান। নিজে তিনি হাভানা চুরুট ধরিয়েছেন, তবে কৈলাস জাঠোরের জন্যে সিগারেট আর ইউসুফ হায়দারের জন্যে পাইপ সহ টোবাকো সংগ্রহ করে রেখেছেন—কে কি পছন্দ করেন, তাঁর জানা আছে।

এঁরা সময় নষ্ট করার মানুষ নন, কুশলাদি বিনিময়ের খেই ধরেই মীটিঙের কাজ শুরু করে দিলেন। চাপ দাড়িতে হাত বুলিয়ে কৈলাস জাঠোর ছোট্ট একটা ভূমিকায় বললেন, 'আমি যে ইতিহাস ও ঘটনার বর্ণনা দেব, অনুরোধ করব দয়া করে সে-সব রাজনৈতিক দৃষ্টিতে দেখবেন না। আমি একটা প্রার্থনা নিয়ে এসেছি, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান ইন্টেলিজেন্স-এর সাহায্য চাই। আমার কথা শোনার পর আপনারা সিদ্ধান্ত নেবেন সাহায্য করা সম্ভব কি সম্ভব নয়। সম্ভব হলে এখানে বসেই প্ল্যান তৈরি করব আমরা। আর সম্ভব না হলে আপনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ফিরে যাব দিল্লিতে—মনে কোন ক্ষোভ বা দুঃখ পুষে না রেখেই।'

রাহাত খান বললেন, 'ফেয়ার এনাফ।'

ইউসুফ হায়দার পাইপে টোবাকো ভরছেন। তিনি কিছু না বলে শুধু মাথা ঝাঁকালেন।

কৈলাস জাঠোর সোফায় নড়েচড়ে বসে ধীর-স্থির ভঙ্গিতে শুরু

করলেন। শব্দ নির্বাচনের জন্যে সময় নিচ্ছেন তিনি। বাধ্য হয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক তথ্য ফাঁস করতে হচ্ছে, ফলে বেশ কয়েকবারই বিব্রত দেখাল তাঁকে। তবে সতর্ক থাকলেন, প্রয়োজনের চেয়ে বেশি যাতে বলে না ফেলেন। তাঁর দুই শ্রোতা মাঝে-মধ্যে বাধা দিয়ে দু'একটা বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা বা বর্ণনা শুনতে চাইলেন। সব মিলিয়ে তাঁর দীর্ঘ বক্তব্যের সারমর্ম দাঁড়াল এরকম:

দ্বীপটা আরব সাগরে, মালিক ভারত, বোম্বাই থেকে প্রায় চারশো কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে। বহুকাল আগে থেকেই জরথুস্ত্র-এর অনুসারী, অগ্নিউপাসক পারসীরা বসবাস করছে চরস নামে এই দ্বীপে। ওখানে পাথুরে পাহাড় আছে, তবে উপত্যকায় গাঁজার চাষ হয়। গাঁজা থেকে তৈরি হয় চরস, তাই এই দ্বীপের নামও চরস। চরস হিন্দি শব্দ।

দ্বীপে পারসীদের সংখ্যা ছিল হাজার সাতেক। তিন বছরে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় বিশ হাজার। এর জন্যে দায়ী ইরানের ইস্পাহান থেকে আসা পারসীদের নতুন ধর্মগুরু শাহ আল কাদরি আল বকশী। শাহ বকশী ইরানেই তার ধর্ম প্রচার শুরু করেছিল, কিন্তু সেখানকার মৌলবাদীদের তাড়া খেয়ে পালিয়ে চলে এসেছে ভারতে। ভারতে প্রচুর পারসী বসবাস করে, আর তাদেরকে বোম্বে, নাসিক সুরাট, রাজকোট ও নর্মদা নদীর দুই তীরে বেশি দেখা যায়–চরস থেকে ওই শহরগুলো তিনশো থেকে পাঁচশো কিলোমিটার দূরে।

শাহ বকশী ভারতে এলো একা নয়, কয়েকশো ভক্ত, অনুসারী ও দেহরক্ষীকে নিয়ে। তারা অনেকেই ব্যবসায়ী ও ধনী মানুষ। পশ্চিম ভারতের যে-সব এলাকায় পারসীরা কোণঠাসা বা অত্যাচারিত, তাদেরকে নানারকম প্রলোভন দেখিয়ে এই দ্বীপে আনা হয়েছে। নতুন যারা এলো তারা পেশা হিসেবে বেছে নিল গাঁজার চাষ ও চোরাচালান। শাহ বকশী তার এই নতুন শিষ্যদের

জরথুস্ত্র-এর প্রবর্তিত ধর্মের সঙ্গে নিজের উদ্ভাবিত ধর্ম পাঞ্চ করে গেলাচ্ছে। তার ধর্মের মূল কথা হলো: জরথুস্ত্র-এর অনুসারীরা অগ্নিউপাসক, আর অগ্নি যেহেতু শয়তানের প্রতিনিধিত্ব করে, তাই তাদেরকে শয়তানের উপাসনাই করতে হবে। জগতে দুই শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে—ঈশ্বর ও শয়তানের। ঈশ্বর মহাশক্তিশালী, এটা সে অস্বীকার করে না, তবে একইসঙ্গে এ-ও বিশ্বাস করে যে শয়তানও ঈশ্বরের তুলনায় কম শক্তিশালী নয়। শাহ বকশীর দাবি, পারসী বা শয়তান উপাসকদের জন্যে আলাদা আবাসভূমি চাই।

চরস দ্বীপে শাহ বকশীর অনুসারীর সংখ্যা বাড়ছে, তাদেরকে তলোয়ার ও আগ্নেয়াস্ত্র চালাবার ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে, এমনকি প্রতি মাসে আগুনে পুড়িয়ে নরবলি দেয়ার ঘটনাও ঘটছে, কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন চোখ-কান বুজে থাকায় গোটা ব্যাপারটা এতদিন দ্বীপের বাইরের লোকজন কিছুই জানতে পারেনি। প্রশাসনের এ ব্যর্থতা লজ্জাজনক, কৈলাস জাঠোর স্বীকার করলেন। তাঁর ধারণা, প্রশাসনিক কর্মকর্তারা শাহ বকশীর ঘুষ খেয়ে সব জেনেও না জানার ভান করেছে।

দ্বীপটা বেশ বড়। শাহ বকশীর আস্তানাটা পুব দিকে। দ্বীপের পশ্চিম দিকে ভারতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় গত কয়েক বছর ধরে ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছে বিশাল এক সামরিক স্থাপনা। প্রথমে বিরাট একটা এলাকা উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়। পাঁচিলের ভেতর কি করা হচ্ছে কাউকে তা জানতে দেয়া হয়নি। পাঁচিলের বাইরে থেকে শুধু আকাশ ছোঁয়া কিছু দালানের মাথা দেখতে পাওয়া যায়। পশ্চিম দিকে বেশ কয়েকটা আলাদা জেটি নির্মাণ করা হয়েছে, সামরিক বাহিনীর সদস্যরা মেইনল্যান্ড থেকে দ্বীপে আসা-যাওয়া করে ওই জেটি দিয়ে। ভুলেও কখনও তারা পাঁচিলের বাইরে অর্থাৎ দ্বীপের বাকি অংশে পা ফেলে না। পাঁচিলের ভেতর দ্বীপের কোন লোককে তারা ঢুকতেও দেয় না।

আসলে ভারতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় চরস দ্বীপে গোপনে একটা অত্যাধুনিক মিসাইল ঘাঁটি তৈরি করেছে। এরকম একটা মিসাইল ঘাঁটির পাশেই জনবসতি থাকতে দেয়া ঠিক নয়, কিন্তু পারসীদের উচ্ছেদ করলে মিডিয়াতে ও দেশে-বিদেশে বিরাট হৈ-চৈ পড়ে যাবে, এবং তখন আর ঘাঁটির অস্তিত্ব গোপন রাখা সম্ভব হবে না, এ-কথা ভেবে কর্তৃপক্ষ এ-ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ তো নেয়ইনি, বরং তাদের ব্যাপারে চোখ-কান বুজে থাকার নীতি গ্রহণ করে। শাহ বকশী আর তার অনুসারীদের এতটা বাড় বাড়তে পারার পিছনে এটাই সবচেয়ে বড় কারণ।

অগ্নি-১, অগ্নি-২ ও অগ্নি-৩, এই তিন ধরনের মিসাইল বসানো হয়েছে চরসে। প্রতিটির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করলেন আইএসএস চীফ কৈলাস জাঠোর। অগ্নি-১ সাধারণ মিসাইল। রেঞ্জ তিনশো কিলোমিটার। এটা সারফেস-টু-সারফেস মিসাইল, নিউক্লিয়ার ওঅরহেড ক্যারি করার ফ্যাসিলিটি রাখা হয়নি। অগ্নি-দুইও কনভেনশনাল মিসাইল, রেঞ্জ সাতশো কিলোমিটার। এটা হীট সিকিং, সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল। এতেও নিউক্লিয়ার ওঅরহেড বহন করার সুযোগ রাখা হয়নি। সবশেষে অগ্নি-৩ প্রসঙ্গ। আইএসএস চীফ গর্বের সঙ্গে বললেন, অগ্নি-৩ আসলে বিল্ট-ইন কমপিউটরের সাহায্যে স্বয়ং নিয়ন্ত্রিত ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল, রেঞ্জ কয়েক হাজার মাইল হওয়ায় অস্ট্রেলিয়া বা চীনের যে-কোন শহরে পৌঁছাতে পারবে, এবং নিউক্লিয়ার ওঅরহেড বহন করার জন্যে বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে।

এ-প্রসঙ্গে ঠিক প্রতিবাদ নয়, প্রাপ্ত তথ্যের উল্লেখ করে রাহাত খান বললেন, তাঁর জানামতে ভারত এখনও অগ্নি বানাতে সফল হয়নি। চরসে যে মিসাইলগুলো আছে সেগুলো সম্ভবত চোরাই মার্কেট থেকে কেনা রাশিয়ান মিসাইল। তাছাড়া, ভারতের কাছে পারমাণবিক বোমা থাকারও প্রশ্ন ওঠে না, যদি না তারা চোরা

বাজার থেকে সংগ্রহ করে থাকে।

উত্তরে কৈলাস জাঠোর বললেন, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দেয়া তথ্য তিনি তো আর যাচাই করে দেখতে যাননি, তবে তাঁকে সুনির্দিষ্টভাবে জানানো হয়েছে যে তিন ধরনের অগ্নির সফল পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে, এবং অগ্নি-৩ অবশ্যই ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল, এবং এগুলোর অন্তত দশটা চরস মিসাইল ঘাঁটিতে বসানো হয়েছে। পারমাণবিক বোমা প্রসঙ্গ সযত্নে এড়িয়ে থাকলেন তিনি।

গম্ভীর একটু হাসি দেখা গেল রাহাত খানের মুখে; বাধা দেয়ার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে কৈলাস জাঠোরকে আবার শুরু করার অনুরোধ জানালেন।

কিন্তু ইউসুফ হায়দার নাছোড়বান্দা হয়ে উঠলেন, প্রশ্ন তুললেন–ওই দশটা মিসাইলে অ্যাটমিক ওঅরহেড ফিট করা আছে কিনা, এবং থাকলে সেগুলো কোন কোন দেশের দিকে তাক করে বসানো হয়েছে?

কৈলাস জাঠোর সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, যেন মুখস্থ করাই ছিল–হ্যাঁ, মিসাইলগুলোর নির্দিষ্ট টার্গেট আছে, তবে দশটার মধ্যে তিনি মাত্র তিনটে টার্গেটের কথা জানেন, বাকি টার্গেটের কথা তাঁকে জানানো হয়নি। তিনটে টার্গেটের দুটো হলো চীনে–বেইজিং ও সাংহাই; একটা অস্ট্রেলিয়ায়–সিডনি। এবং, না; তাঁর জানামতে ওগুলোর নিউক্লিয়ার ওঅরহেড ফিট করা হয়নি।

মুচকি হেসে ইউসুফ হায়দার বললেন, বাকিগুলোর অন্তত দুটো যে পাকিস্তানের দিকে মুখ করে বসানো হয়েছে, এ ব্যাপারে তাঁর কোন সন্দেহ নেই; এমন কি কোন্ দুটো শহরকে টার্গেট করা হয়েছে তা-ও তিনি আন্দাজ করতে পারেন, এবং সেই আন্দাজ পুরোপুরি সঠিক কিনা জানতে পারলে বড়ই তৃপ্তি বোধ করতেন।

তাঁর এই কথা শুনে কৈলাস জাঠোরও মুচকি একটু হাসলেন

শুধু, অন্য কোন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকলেন।

ইতিমধ্যে বাইরে ভোরের আলো ফুটেছে। অতিথিদের সম্মতি পেয়ে ইন্টারকমে ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিলেন রাহাত খান। বাড়ির কিচেন থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে তা পরিবেশন করা হলো।

নাস্তা খাওয়ার শেষ পর্যায়ে অপ্রাসঙ্গিক গল্পে মেতে উঠলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন, ধী-গুণের অধিকারী তিন প্রবীণ প্রতিদ্বন্দ্বী। আইএসআই চীফ আইএসএস চীফকে জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রণয় জাঠোর তাহলে রাশিয়া থেকে ভালই কামাবে, কি বলেন? খবরের কাগজে দেখলাম, ইয়েলিৎসিনের সঙ্গে তার বেশ খাতির আছে, পারিবারিক বন্ধুই বলা যায়।'

'ই-সব বাত ছোড়িয়ে, ইয়ার!' জবাব দিলেন কৈলাস জাঠোর। 'এক হি ল্যাড়কা মেরা, সোঁচা থা পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার আপনায়ে গা, মাগার য্যায়সে হায়দ্রাবাদ কা নিজাম নিকলা।'

'হায়দ্রাবাদের নিজাম তো বিশাল ব্যাপার ছিল,' বললেন রাহাত খান। 'প্রণয়ের কি এত টাকা হয়েছে যে তাঁর সঙ্গে তুলনা করা চলে?'

'বিধ্বস্ত রাশিয়ায় খুব তাড়াতাড়ি পনেরো থেকে বিশ বিলিয়ন ডলারের নির্মাণ কাজ শুরু হতে যাচ্ছে,' বললেন কৈলাস জাঠোর। 'অন্তত গোটা চারেক বড় টেন্ডার তো পাবেই সে। গত হপ্তায় বলছিল, বাংলাদেশের গ্যাস পাইপ লাইন বসানোর কাজটাও তার কপালেই ঝুলছে। কেন, আপনি জানেন না, টান পড়লে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়াকে টাকা ধার দেয় প্রণয়?'

মৃদু হেসে রাহাত খান বললেন, 'তাহলে তো অবশ্যই প্রণয়কে কুমির বলা চলে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কৈলাস জাঠোর। 'রূপিয়াই কি সব রে ভাই! আমি ওকে রাজনীতি করতে বলেছিলাম টাকা রোজগারের জন্যে না, দেশ সেবার জন্যে। যোগ্যতা থাকলে বিশ্ব সমাজের সেবা করতেই বলতাম। কিন্তু আমাকে কাঁচকলা দেখিয়ে

নিজের সেবায় উঠেপড়ে লেগেছে সে।' ইউসুফ হায়দারের দিকে তাকালেন তিনি। 'এ-ব্যাপারে আমার চেয়ে আপনার কপাল হাজার গুণ ভাল।'

'হ্যাঁ,' বললেন রাহাত খান। 'আপনি আপনার বড় ছেলেটিকে নিয়ে সত্যি গর্ব করতে পারেন, মিস্টার হায়দার।'

বিস্মিত হয়ে ইউসুফ হায়দার বললেন, 'আপনি কামাল হায়দার সম্পর্কে কি জানেন মিস্টার খান?'

'অন্তত এটুকু জানি, যে-কোনদিন আমরা বলতে পারব–কামাল, তুনে কামাল কিয়া বেটা! স্টিফেন হকিঙের ছাত্র হলে কি হবে, পণ্ডিত মহলে বলা-কওয়া হচ্ছে শিষ্য গুরুকে ছাড়িয়ে যাবে। সে নাকি বিগ ব্যাঙ থিওরির বিপরীতে বিশ্ব সৃষ্টির একদম নতুন একটা থিওরি দিয়েছে। সবাই বলছে, যে-কোন দিন নোবেল পুরস্কার পেয়ে যেতে পারে সে।'

'প্রণয়ের যত টাকাই থাকুক, ভাইস্যাব, বললেন কৈলাস জাঠোর। 'সে কি একটা নোবেল প্রাইজ কিনতে পারবে?'

বিব্রত ভাবটুকু কাটাবার জন্যেই ইউসুফ হায়দার তাড়াতাড়ি রাহাত খানকে আলোচনার বিষয় হিসেবে বেছে নিতে চাইলেন, কিন্তু বিসিআই চীফ সে সুযোগ তাঁকে দিলেন না; ডান হাতের তালুটাকে কাঁসি বানালেন তিনি, বাঁ হাতের মুঠোটাকে হাতুড়ির মাথা, তারপর মুখ দিয়ে নিঃশব্দে উচ্চারণ করলেন–'ঢং! ঢং! ঢং!' অর্থাৎ বিরতির এখানেই সমাপ্তি, মীটিং আবার শুরু হতে যাচ্ছে।

আগেই বলা হয়েছে ধী-গুণ, অর্থাৎ কৌতূহল, শ্রবণ, আহরণ, স্মরণ, তর্ক, সন্দেহ-নিরসন, অর্থবোধ ও মর্মধারণ, এই অষ্টবিধ বুদ্ধিগুণের অধিকারী ওঁরা তিন প্রবীণ প্রতিদ্বন্দ্বী; আর বোধহয় সেজন্যেই চরম একটা সংকট নিয়ে সিরিয়াস আলোচনার ফাঁকেও হাস্যরসের অবতারণা করা এঁদের পক্ষে সম্ভব হলো। আবার যখন কাজের কথায় ফিরলেন, তিনজনই হয়ে উঠলেন গভীর

মনোযোগী: খানিক আগের অপ্রাসঙ্গিক গল্প-গুজব মস্তিষ্কের চোরা-কুঠরিতে চাপা পড়ে থাকল।

'ব্রেকফাস্টের আগে যেটুকু বলেছি,' আবার শুরু করলেন কৈলাস জাঠোর, 'সেটা ইতিহাস। এবার ঘটনার বর্ণনা দেব।'

ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি যা বললেন, সংক্ষেপে তা দাঁড়াল এরকম:

পরশু রাত বারোটার ঘটনা। সবাই ঘুমাচ্ছে। ওই সময় অতর্কিতে হামলা চালিয়ে শাহ বকশীর নেতৃত্বে তার সশস্ত্র অনুসারীরা চরস মিসাইল ঘাঁটি দখল করে নিয়েছে। তারা পাঁচিল ভাঙেনি, বা পাঁচিলের মাথাও টপকায়নি, মাটি কেটে টানেল বানিয়ে নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকেছে। তাদের অনেকের সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল, তবে সে-সব খুব একটা ব্যবহার করা হয়নি। মিসাইল ঘাঁটির সেনা সদস্যদেরকে ঘুমের মধ্যেই তলোয়ার দিয়ে পাইকারীভাবে জবাই করেছে তারা। সৈন্য ও টেকনিশিয়ান মিলিয়ে আড়াইশো লোক ছিল ঘাঁটিতে, দু'জন রেডিও অপারেটর ও একজন মেজর ছাড়া সবাই খুন হয়ে গেছে। তবে রাশিয়ানদের, অর্থাৎ জেনারেল গোরস্কি আর তার দলকে স্পর্শ করা হয়নি।

রেডিও অপারেটর দু'জনকে শাহ বকশী ইচ্ছা করেই বাঁচিয়ে রেখেছে, তাদের মাধ্যমে ভারতীয় সেনাবাহিনী ও সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যে। মেজর ভাগ্যগুণে বেঁচে যায়। আহত অবস্থায় কোন রকমে পালিয়ে সৈকতে চলে আসে সে, তারপর একটা ভেলায় চড়ে সাগর পাড়ি দেয়ার চেষ্টা করে। বারো ঘণ্টা পর, পরদিন, অর্থাৎ গতকাল সকাল দশটার দিকে একটা মাছ ধরার ট্রলার তাকে দেখতে পেয়ে তুলে নেয়, দুপুর বারোটার সময় পৌঁছে দেয় মেইনল্যান্ডে। তবে তার মুখ থেকে সব কথা শোনার আগে আরও অনেক ঘটনা ঘটে।

রাত বারোটায় চরস মিসাইল ঘাঁটির সঙ্গে মেইনল্যান্ডের সমস্ত

টেলি-যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়।

সকালে দিল্লি থেকে রওনা হওয়া এয়ার ইন্ডিয়ার একটা যাত্রীবাহী প্লেন মেইনল্যান্ড ছেড়ে তিনশো কিলোমিটার যাবার পরই নিখোঁজ হলো।

এই ঘটনার আধ ঘণ্টা পর পিআইএ-র একটা প্যাসেঞ্জার প্লেন করাচী থেকে জিবুতি যাচ্ছিল, পাঁচশো কিলোমিটার যাবার পর দুটো মিসাইল সেটাকে ধাওয়া করে, তবে অজ্ঞাত কোন কারণে একটাও লাগেনি। দুঃখজনক বিষয় হলো, এই ঘটনাকে করাচী এয়ারপোর্টের কন্ট্রোল টাওয়ার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর উসকানি বলে ধরে নেয়। আর তাই বোম্বে কন্ট্রোল টাওয়ার দিল্লি টু আদ্দিস আবাবা ফ্লাইট সম্পর্কে প্রশ্ন করায় করাচী কন্ট্রোল টাওয়ার রেগেমেগে জবাব দেয়—পাকিস্তানের লেজে পা দিলে এমন ছোবল মারবে তারা...। সে যাই হোক, তাদের এই উদ্ভট প্রতিক্রিয়ার কারণ পরে তারা ব্যাখ্যা করেছে।

এরপর বিধ্বস্ত হয় বাংলাদেশ বিমানের যাত্রীবাহী বোয়িং, ক্রুসহ দুশো সত্তরজন হজযাত্রী নিয়ে।

তালিকায় এরকম ঘটনা আরও বেশ কয়েকটা আছে, প্রায় প্রতিটি সম্পর্কে কমবেশি জানা আছে সবার। এবার ওই তালিকার বাইরে কি কি ঘটেছে সে-সম্পর্কে একটা ধারণা দিতে হয়।

বাংলাদেশী বোয়িং বিধ্বস্ত হবার এক ঘণ্টা পর চরস মিসাইল ঘাঁটির সঙ্গে আবার টেলিযোগাযোগ সম্ভব হয়। বোম্বাই এয়ারফোর্স বেইস থেকে জানতে চাওয়া হয়, রাত বারোটার পর থেকে যোগাযোগ বন্ধ ছিল কেন? রেডিও অপারেটর জবাব দেয়, যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিয়েছিল, তবে এখন আবার সব ঠিক হয়ে গেছে। চরস দ্বীপের আশপাশে একের পর এক অঘটন ঘটছে, তারা কিছু জানে কিনা, এ-প্রশ্নের উত্তরে রেডিও অপারেটর জানায়, না, কিছু জানে না। এরপর তাকে নির্দেশ দেয়া হয়,

ঘাঁটির কমান্ডার মেজর জেনারেল দিলীপ চৌহানকে ডেকে দাও। উত্তরে কিছু না বলে যোগাযোগ আবার বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়।

এরপর আর সময় নষ্ট না করে স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীকে চরস দ্বীপে সামরিক অভিযান চালাবার প্রস্তুতি নেয়ার নির্দেশ দেয়া হলো। আর ঠিক তখন থেকেই শুরু হলো আসল বিপদ।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে তিন বাহিনীর হেডকোয়ার্টারকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে প্রস্তুতি গ্রহণ শেষ হওয়ামাত্র রিপোর্ট করতে হবে। কিন্তু রিপোর্ট আসতে অস্বাভাবিক দেরি হচ্ছে। তাগাদার পর তাগাদা দেয়া হলো, কিন্তু নানা অজুহাত খাড়া করে প্রস্তুতি নিতে গড়িমসি করা হচ্ছে। প্রথমে সামরিক প্রস্তুতির যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হলো। পরামর্শ দিয়ে বলা হলো নিজেদের ঘাঁটি নিজেদের লোকজনই যখন দখল করে নিয়েছে তখন হামলা না করে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান খোঁজা উচিত।

এই সময় চরস দ্বীপ থেকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করল শয়তান উপাসকদের নেতা শাহ বকশী। সে জানাল চরস মিসাইল ঘাঁটি দখল করে নিয়েছে তারা, বিভিন্ন পাল্লার একশো বাহাত্তরটা মিসাইল এখন তাদের নিয়ন্ত্রণে। এরপর সে একটা তালিকা দিল—এগুলো সে মিসাইল ছুঁড়ে ধ্বংস করেছে—একটা করে ভারতীয় ও বাংলাদেশী যাত্রীবাহী প্লেন, শ্রীলঙ্কার জন্যে জ্বালানী তেল বহনকারী একটা সুপারট্যাংকার, ভারতীয় নৌ-বাহিনীর দুটো উদ্ধারকারী জাহাজ, ভারতীয় বিমানবাহিনীর পাঁচটা রেসকিউ হেলিকপ্টার। তালিকায় আরও আছে পাকিস্তানের একটা যাত্রীবাহী প্লেন, পাকিস্তান এয়ারফোর্সের এক ঝাঁক ফাইটার জেট, শ্রীলঙ্কার একটা কার্গো প্লেন ইত্যাদি; কিন্তু মিসাইলে ত্রুটি থাকায় এগুলো রক্ষা পায় বলে ক্ষোভ প্রকাশ করল শাহ বকশী।

তারপর জানাল, চরস দ্বীপের চারপাশে একশো কিলোমিটার পর্যন্ত আকাশকে 'নো ফ্লাই জোন' হিসেবে ঘোষণা করেছে সে।

ভারত, পাকিস্তান, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটান, সার্কভুক্ত এই সাতটা দেশের প্লেন তার ঘোষিত নো ফ্লাই জোনের ভেতর দেখা মাত্র মিসাইল ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হবে। চরস দ্বীপের চারপাশে একশো কিলোমিটার পর্যন্ত সাগরও সবার জন্যে নিষিদ্ধ এলাকা, অনুমতি ছাড়া ভেতরে ঢুকলে যে-কোন জলযানকে সারফেস-টু-সারফেস মিসাইল ছুঁড়ে ডুবিয়ে দেয়া হবে।

শাহ বকশী এরপর তার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করল। সে তার নিজের প্রবর্তিত ধর্মের নাম দিয়েছে—দাঁড়িপাল্লা। তার তত্ত্ব হলো: মানুষের পাপ ও পুণ্যের মধ্যে ব্যালেন্স বা ভারসাম্য নেই বলেই দুনিয়ায় এত বিশৃংখলা ও অশান্তি বিরাজ করছে। সব ধর্মের লোক তাদের ঈশ্বর বলতে অজ্ঞান, ঈশ্বরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ; কিন্তু ঈশ্বর যে-পথে চলতে বলেন সে-পথে খুব কম লোকই চলছে। এখানে অসঙ্গতিটা স্পষ্ট। তেমনি শয়তানকে নিয়েও এক ধরনের প্রহসনে মেতে আছে মানুষ। শয়তানের ক্ষমতা ঈশ্বরের সমান হলেও, এমন মানুষের সংখ্যা খুবই কম যারা শয়তানের উপাসনা করে, অথচ শয়তানের প্রদর্শিত পথে থাকতে কারুরই কোন আপত্তি নেই। এখানেও অসঙ্গতি প্রকট। এই অসঙ্গতি দূর করে তার নতুন ধর্ম দাঁড়িপাল্লা দুনিয়ার বুকে শান্তি ও শৃংখলা স্থাপন করবে। তার পরামর্শ হলো, ঈশ্বরের উপাসনা কমিয়ে আনতে হবে, বাড়াতে হবে শয়তানের আরাধনা। শুধু এভাবেই ভারসাম্য রক্ষা সম্ভব। সে তার ধর্ম প্রচার করার জন্যে অগ্নিউপাসক পারসীদের বেছে নিয়েছে। তার মতে, ভারতে পারসীরা নির্যাতিত হচ্ছে। তাদের মধ্যে যারা দাঁড়িপাল্লাকে নতুন ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করছে তাদের ওপর অন্য ধর্মের লোকজন ও পুলিস অত্যাচার চালাচ্ছে। তাই পারসীদের জন্যে আলাদা, স্বাধীন একটা আবাসভূমি চায় সে। পারসীদের এই স্বাধীন রাষ্ট্রের মানচিত্র কি হবে তাও জানিয়ে দিয়েছে।

ভারত সরকারকে সাতদিন সময় দিয়েছে শাহ বকশী। এর

মধ্যে তাদের দাবি মানা না হলে দিল্লি, ইসলামাবাদ, ঢাকাসহ সার্কের সাতটা দেশের রাজধানীকে তার মিসাইলের টার্গেট করা হবে। এর কারণ হিসেবে সে জানিয়েছে, সার্কের ছ'টা দেশ চাপ সৃষ্টি করলে ভারত তার দাবি দ্রুত মেনে নিতে বাধ্য হবে।

স্বাধীন আবাসভূমি ছাড়াও আরেকটা দাবি আছে শাহ বকশীর। নতুন ধর্মের প্রচার ও প্রসার এবং নতুন রাষ্ট্রের খরচ চালাবার জন্যে কিছু টাকা তার দরকার। বেশি নয়, ভারতীয় মুদ্রায় সাত হাজার কোটি রুপি পেলেই আপাতত কাজ চালিয়ে নেবে সে। এই টাকা ভারতকে একা দিতে হবে না। খুশি হয়ে সাতটা দেশ চাঁদা দেবে তাকে। রাষ্ট্রপ্রতি এক হাজার কোটি রুপি করে চাঁদা ধার্য করা হয়েছে। এ-ব্যাপারে বাকি ছ'টা রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে।

এই পর্যায়ে বিসিআই চীফ রাহাত খান ও আইএসআই চীফ ইউসুফ হায়দার জানালেন—হ্যাঁ, চরস দ্বীপ থেকে পাঠানো শাহ বকশীর ফ্যাক্স বার্তা ঢাকা ও ইসলামাবাদে পৌঁছেছে। রাষ্ট্র প্রতি এক হাজার কোটি রুপি যোগাড় করে রাখতে বলা হয়েছে, আগামী তিনদিনের মধ্যে পরবর্তী নির্দেশে জানানো হবে টাকাটা কিভাবে গ্রহণ করবে শাহ বকশী। চাঁদা দিতে ব্যর্থ হলে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ।

ওদিকে খোঁড়া অজুহাত দেখিয়ে কালক্ষেপণের পর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রবল চাপে অগত্যা ভারতীয় স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীর হেডকোয়ার্টার থেকে বলা হলো, চরস দ্বীপে সামরিক অভিযান চালাবার জন্যে এখন তারা প্রস্তুত, তবে সেই সঙ্গে এটাও ভেবে দেখতে অনুরোধ করল—দ্বীপটায় যে মিসাইল আছে সেগুলোকে এড়িয়ে কোন সফল হামলা চালানো আদৌ সম্ভব কিনা।

বাংলাদেশ বিমানের বোয়িং উড়িয়ে দেয়ার সাত ঘণ্টা পর চরস দ্বীপ পুনর্দখলের জন্যে প্রথম সামরিক অভিযান চালানো

হয়। এতে অংশগ্রহণ করে তিনটে যুদ্ধ জাহাজ, ছ'টা হেলিকপ্টার গানশিপ, তিনটে বোমারু ও পাঁচটা ফাইটার জেট।

অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, ভারতের এই সামরিক অভিযান শাহ বকশী একটা মিসাইল না ছুঁড়েও পুরোপুরি ব্যর্থ করে দেয়। ফ্রিগেট শ্রেণীর তিনটে যুদ্ধজাহাজ নৌ-ঘাঁটি থেকে রওনা হয়ে পঞ্চাশ কিলোমিটারও যেতে পারেনি, অচল হয়ে সাগরে দাঁড়িয়ে পড়ে। একটার এঞ্জিনে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়, দ্বিতীয়টার খোল লিমপেট মাইনের বিস্ফোরণে উড়ে যায়, তৃতীয়টার ফুয়েলে বালি পাওয়া যায়। বোমারু ও জেটগুলো আকাশে ওঠার পর পরই পাইলটরা গ্রাউন্ড কন্ট্রোলকে জানায়, তাদের সিটের নিচে থেকে সাদা রঙের গন্ধহীন ধোঁয়া বেরুচ্ছে। কেউই তার মেসেজ শেষ করতে পারেনি, জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। পাঁচটা ফাইটার আর তিনটে বোমারুর কি পরিণতি হয়েছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না–সবগুলো সাগরে পড়ে ডুবে গেছে। এরপর, বলাই বাহুল্য, হেলিকপ্টার গানশিপগুলো ভয় পেয়ে ঘাঁটিতে ফিরে আসে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জরুরী মীটিঙে বসল। তিন বাহিনীর বোম্বে ঘাঁটি থেকে হামলার প্রস্তুতি নেয়া হয়েছিল, কাজেই ধারণা করা হলো ঘাঁটিগুলোতে শাহ বকশীর অনুসারী অফিসাররা এই স্যাবটাজের জন্যে দায়ী।

দ্বিতীয় হামলার প্রস্তুতি নেয়া হলো অত্যন্ত গোপনে, ভারতের আরেক প্রান্ত থেকে–ত্রিবান্দ্রাম নৌ-ঘাঁটি থেকে রওনা হবে দুটো ফ্রিগেট, বাঙালোর এয়ারবেস থেকে আকাশে উঠবে তিনটে বোমারু ও চারটে ফাইটার।

শাহ বকশী এবারও জাদুবলে জিতে গেল। বোমারু ও ফাইটারগুলো বাঙ্গলোরের আকাশে উঠতেই পারল না, রানওয়ে ধরে ছোটার সময় ভেঙে পড়ল চাকা। বিস্ফোরণ, আগুন, ধোঁয়া ও আতংক ছড়িয়ে পড়ল এয়ারবেসে। ফ্রিগেটগুলোও ত্রিবান্দ্রাম নৌ-

ঘাঁটি থেকে রওনা হতে পারল না, ওগুলোর এঞ্জিনরুমে বিস্ফোরণ ঘটল—দায়ী সম্ভবত টাইমবোমা।

রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা রক্ষার স্বার্থে তিন বাহিনীর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কি ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তা প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকলেন কৈলাস জাঠোর। শাহ বকশীর বিরুদ্ধে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম সামরিক অভিযান সম্পর্কে বিশদ কিছু জানাতেও রাজি হলেন না। শুধু বললেন, এ অভিযানগুলোয় ভারতের বিভিন্ন ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি অংশগ্রহণ করে। কিন্তু সবগুলো অভিযানই ব্যর্থ হয়—একটি বারও চরস মিসাইল ঘাঁটিতে আঘাত হানা সম্ভব হয়নি। মাঝ থেকে ভারতীয় নৌ-বাহিনী দুটো সাবমেরিন হারিয়েছে।

ভারত সরকার উপলব্ধি করতে পারল শাহ বকশীর হাত কতটা লম্বা। সামরিক বাহিনীর ওপর ভরসা রাখা যাচ্ছে না, কারণ এটা এখন নিঃসন্দেহে প্রমাণিত যে প্রতিটি ঘাঁটিতে তার ভক্ত বা বেতনভুক লোকজন বসে আছে। একই অবস্থা ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলোরও। একটা দেশের জন্যে এরচেয়ে বিপজ্জনক অবস্থা আর কিছু হতে পারে না। আজ সকালে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হবে, কিন্তু তাতেও অবস্থা সামাল দেয়া যাবে কিনা সন্দেহ। এই পরিস্থিতিতে ভারত সরকারের সামনে একটা পথই খোলা আছে—তা হলো, প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাহায্য চাওয়া। তবে এ-ব্যাপারেও সংশয় আছে, প্রয়োজনীয় সাহায্য আদৌ পাওয়া যাবে কিনা। এখনকার এই ঢাকা বৈঠকে সার্কের সবগুলো দেশকে অংশগ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, কিন্তু বাংলাদেশ ও পাকিস্তান ছাড়া আর কোন সদস্য রাষ্ট্র আসতেই চায়নি, বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে এড়িয়ে গেছে। ভারত সরকার ধারণা করছে, এখানেও শাহ বকশীর হাত থাকা বিচিত্র নয়। সবশেষে কৈলাস জাঠোর বললেন, ভারতের সাহায্যের আহ্বানে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সাড়া দেয় কিনা এটাই এখন দেখার

বিষয়।

কথা না বলে সোফা ত্যাগ করলেন রাহাত খান। হাতের চুরুটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে রেখে ডান হাতটা নিঃশব্দে বাড়িয়ে দিলেন কৈলাস জাঠোরের দিকে। আসন ত্যাগ করে তাঁর সেই হাত পরম নির্ভরতার সঙ্গে চেপে ধরলেন আইএসএস চীফ। দেখা গেল আইএসআই চীফ ইউসুফ হায়দারও তাঁর ডানহাত বাড়িয়ে দিয়ে নিঃশব্দে অপেক্ষা করছেন, তবে চেপে রাখার চেষ্টা করলেও তাঁর মনের উল্লাস চোখের তারায় ফুটে উঠল। ব্যাপারটা রাহাত খানের দৃষ্টি এড়াল না। তাঁর মনে হলো, কোন গোপন ষড়যন্ত্র সফল হলেই শুধু কারও চোখের তারায় এরকম অশুভ ও নোংরা আলো ফুটতে পারে।

তিন

প্রথম শত্রু হয়ে দাঁড়াল প্রকৃতি; পনেরো হাজার ফুট ওপর থেকে নিচে তাকিয়ে সাগরের চিহ্ন পর্যন্ত দেখতে পেল না মাসুদ রানা, নিশ্ছিদ্র ঘন কুয়াশায় সব ঢাকা পড়ে আছে। পশ্চিম দিগন্তে হারিয়ে যাচ্ছে সূর্য, একটু পরই চারদিক অন্ধকার হয়ে যাবে।

পাকিস্তান এয়ারফোর্সের এটা একটা ছোট্ট টু-সিটার রিকনিসন্স প্লেন, করাচী থেকে রওনা হয়ে ঘুর পথ ধরে গালফ অভ ওমানের ওপর দিয়ে চলে এসেছে চরস দ্বীপের একশো মাইল দক্ষিণে। প্যারাশুট নিয়ে এখানেই কোথাও নামবে রানা, সাগরে ওর পাশেই ফেলা হবে একটা বোট। বোট না বলে ছোট্ট একটা

ভেলা বলাই ভাল–রাবার ও ফাইবার গ্লাসের সংমিশ্রণে তৈরি, ছোট্ট কিন্তু শক্তিশালী আউটবোর্ড মোটর ফিট করা আছে, চরসের দুর্গম দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছে দেবে ওকে। ওদিকে সৈকত বলতে কিছুই নেই, আছে সারি সারি জলমগ্ন গুহা। প্রায় সব গুহাই কানা, অর্থাৎ উল্টোদিক দিয়ে বেরুনো যায় না, পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে পাথুরে দেয়াল। তবে একটা কি দুটো গুহা বাদে। ওই রকম একটায় ওর জন্যে অপেক্ষা করছে ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট চন্দ্রা দেবযানি ও পাকিস্তানী স্পাই সাঈদ শাকির।

সময়ের অভাব ও গোপনীয়তার স্বার্থে তিনজনের দলটা দু'ভাগে আলাদা ভাবে রওনা হয়েছে। চন্দ্রা দেবযানি ছিল আফগানিস্তানে, সাঈদ শাকির করাচীতে, আর রানা ঢাকায়। রাহাত খান তাঁর অন্যতম দুর্ধর্ষ এজেন্টকে যখন ব্রীফ করছেন, চন্দ্রা তখন কাবুল থেকে রওনা হয়ে করাচীর পথে রয়েছে। টেলি-কনফারেন্সের সাহায্যে তিন ইন্টেলিজেন্স চীফ এই সিদ্ধান্ত ও প্ল্যান চূড়ান্ত করেন–চন্দ্রা করাচীতে পৌঁছালে সাঈদের সঙ্গে রওনা হয়ে যাবে। ইয়ানগন ও কাঠমাণ্ডু হয়ে করাচীতে পৌঁছাতে বেশ অনেকটা সময় লাগবে রানার। হোক টীম লীডার, পরিস্থিতির কারণে পরে পৌঁছানোতে কোন ক্ষতি নেই। বিশেষ করে সিক্রেসি ও সিকিউরিটি যেখানে টপ প্রায়োরিটি।

'অ্যাসাইনমেন্টটা পাকিস্তান থেকে শুরু হচ্ছে কেন?' ব্রিফ করার সময় বসকে এই প্রশ্নটাই আগে করেছে রানা।

রাহাত খান বলেছেন, গত আটচল্লিশ ঘণ্টার অভিজ্ঞতা থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে ভারতের প্রতিটি সামরিক ও ইন্টেলিজেন্স প্রতিষ্ঠানে শাহ বকশীর লোক আছে, তা না হলে প্রতিটি অভিযান প্রস্তুতি পর্বেই স্যাবটাজ করা সম্ভব হত না। অগত্যা বাধ্য হয়ে পাকিস্তান থেকে পাঠানো হচ্ছে ওদেরকে। কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে পাক-ভারত সীমান্তে উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে, জন্ম থেকেই দেশ দুটো পরস্পরের শত্রু, কাজেই শাহ বকশী

ভাবতেই পারবে না যে তার ব্যবস্থা করার জন্যে পাকিস্তানের সাহায্য নিচ্ছে ভারত। এ-ও আশা করা অযৌক্তিক নয় যে পাকিস্তানী সামরিক ও ইন্টেলিজেন্স প্রতিষ্ঠানে শাহ বকশীর কোন লোকজন নেই। তারপরও সাবধানের মার নেই ভেবে মূল প্ল্যানটা আইএসআই চীফ ইউসুফ হায়দার কাউকে জানাবেন না বলে কথা দিয়েছেন; এমনকি সাঈদ শাকির ও সংশ্লিষ্ট পাইলটকেও একেবারে শেষ মুহূর্তের আগে কিছু বলা হয়নি। এ-কথা চন্দ্রা দেবযানি সম্পর্কেও সত্যি। আইএসএস চীফ কৈলাস জাঠোর তাকে করাচীতে পৌঁছাতে বলেছেন শুধু, কি কাজে তা ব্যাখ্যা করেননি।

প্রসঙ্গত কৈলাস জাঠোর রাহাত খানকে জানিয়েছেন, মাসুদ রানা যদি কোন কারণে চরস দ্বীপে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয় তাহলে ওকে সেখানে পৌঁছে দেয়ার বিকল্প একটা ব্যবস্থা তাঁদের হাতে আছে।

ব্রীফ করার সময় বিশেষ করে তিনটে বিষয় রানাকে ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছেন রাহাত খান।

এক, অগ্নি মিসাইল সম্পর্কে আইএসএস চীফ যে দাবি করছেন তা সত্যি নয়; এত দূর পাল্লার মিসাইল এখনও তারা তৈরি করতে পারেনি। তবে বিসিআই গোপন সূত্রে জানতে পেরেছে, আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত রাশিয়ার বেশ কিছু ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল চুরি গেছে, তারই অন্তত দশটা মিসাইল ভারত কিনেছিল–এই দশটার মধ্যে ছ'টা সম্ভবত চরসে বসানো হয়েছে। সত্যি-মিথ্যে জানার একমাত্র উপায়, ঘাঁটিতে গিয়ে নিজ চোখে দেখা। প্রসঙ্গত রানাকে তিনি জানিয়েছেন, ওই ঘাঁটির প্রতিটি মিসাইলই আন্ডারগ্রাউন্ড সাইলোতে রাখা হয়েছে। রুশ ওই মিসাইলগুলো বিল্ট-ইন ও মাস্টার কমপিউটর, দু'ভাবে অপারেট করা যায়, টার্গেট স্থির করার পর লক করার সিস্টেম আছে–এর মানে হলো, যেদিকে

মুখ করেই বসানো হোক বা নিক্ষেপ করা হোক, আকাশে ওঠার পর আগে থেকে সেট করা টার্গেটের দিকে ঘুরে যাবে। রানাকে তিনি বলেছেন, ছ'টা বা দশটার মধ্যে কোন মিসাইল বাংলাদেশের দিকে তাক করা আছে কিনা, প্রথম সুযোগেই সে-ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে। রাহাত খানের আরও একটা উদ্বেগ-দূর পাল্লার এই রুশ মিসাইল নিউক্লিয়ার ওঅরহেড ফিট করা যায়। ফিট করা আছে কিনা, তাও দেখতে হবে রানাকে। যদি থাকে, সেক্ষেত্রে ওর প্রথম কাজ হবে যেভাবে হোক বাংলাদেশের দিকে তাক করা মিসাইলটা ধ্বংস করা, তারপর অন্যান্য।

দুই, শাকির সাঈদ আসলে আমাদের লোক, তিন বছর আগে তাকে আইএসআইতে রোপণ করা হয়েছিল। পরস্পরকে সাহায্য করবে ওরা, তবে লক্ষ রাখতে হবে সাঈদের আসল পরিচয় যাতে কিছুতেই ফাঁস না হয়। এই অ্যাসাইনমেন্ট শেষ করে আবার পাকিস্তানেই ফিরে যাবে সে।

তিন, শাহ বকশীকে বাইরের কোন শক্তি অবশ্যই সাহায্য করছে। ভারত বিরাট একটা দেশ, তার সামরিক শক্তিও এশিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হতে চলেছে, এই অবস্থায় অন্য কোন রাষ্ট্রের সাহায্য-সহযোগিতা ও উৎসাহ না পেলে একজন মৌলবাদী ধর্ম প্রচারক এতটা স্পর্ধা দেখাবার সাহস পেত না। রানাকে তিনি চোখ-কান খোলা রাখতে বললেন। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়লে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। শেষ পর্যন্ত হয়তো দেখা যাবে শাহ বকশী আসলে পুতুল মাত্র, পিছন থেকে তাকে নাচাচ্ছে অন্য কেউ। বললেন, পাকিস্তানকেই তিনি সবচেয়ে বেশি সন্দেহ করছেন।

সদ্য পাওয়া ওয়েদার রিপোর্ট দেখে ঘাবড়ে গেল পাইলট।

'বড় একটা ঝড় আসছে, সার,' রানাকে বলল সে। ইতিমধ্যে বারো হাজার ফুটে নেমে এসেছে প্লেন, নিচে কুয়াশা এখনও আগের মতই গাঢ়। রানা দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে। ওর

হেডসেটে বিশেষ ধরনের অত্যন্ত শক্তিশালী রেডিও ফিট করা আছে, সাগরে নামার পর ফ্রিকোয়েন্সী বদলে এই সেট দিয়েই চন্দ্রা ও সাঙ্গীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে। 'ছোট্ট ওই বোট নিয়ে সাগর পাড়ি দেবেন, আমার তো ভয়ে কলজে শুকিয়ে যাচ্ছে।'

'ঝড়টা কোনদিক থেকে আসছে?' রানা শান্ত, প্রায় নির্লিপ্তই বলা যায়। 'বাতাস আমাকে চরসে পৌঁছাতে সাহায্য করবে কিনা?'

'দক্ষিণ দিক থেকে আসছে, সার,' মাউথপীসে বলল পাইলট। 'উত্তরমুখো বাতাস।'

রানার ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি ফুটল। 'দ্যাট'স গুড!'

'জ্বী?' হাঁ করে তাকিয়ে থাকল পাইলট।

'নিচে নামুন,' নির্দেশ দিল রানা। 'আমি তিন হাজার ফুট থেকে জাম্প করব।'

'কিন্তু, সার, চরস এখান থেকে এখনও পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে। তুফান শুরু হলে স্রোত আপনাকে কোথায় ঠেলে নিয়ে যাবে...'

'যে যার নিজের নিরাপত্তা নিয়ে মাথা ঘামানোই সবদিক থেকে ভাল,' বলল রানা। 'আমাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করতে পারলে আপনারই লাভ—ঝড়টা ধাওয়া করে ধরার আগেই এয়ারবেসে ফিরে যেতে পারবেন আপনি।'

'তা ঠিক,' বলে নার্ভাস হাসি হাসল পাইলট। দ্বিধা আর ইতস্তত ভাব এখনও কাটিয়ে উঠতে পারছে না।

রানা ভাবছে, মাসীর এত দরদ কেন?

'ঠিক আছে, সার।' শ্রাগ করল পাইলট, আলটিমিটারের দিকে তাকিয়ে আছে। 'দশ হাজার ফুট...নয় হাজার...আট হাজার ফুট...আপনি রেডি তো, সার?'

প্লেনের দরজা খুলে একপাশে দাঁড়াল রানা, ওর মাথার পাশে

ইস্পাতের রডের সঙ্গে ঝুলছে ভাঁজ ও প্যাক করা ভেলাটা, নব ধরে টানলে নিজে থেকেই বাতাসে ফুলে উঠবে। 'হ্যাঁ, রেডি।' ভেলা বা বোটের সঙ্গে পাতলা নাইলন কর্ডের একটা কুণ্ডলী রয়েছে, অপর প্রান্তটা রানার কোমরে জড়ানো।

'চার হাজার ফুট থেকে জাম্প করবেন, ঠিক তো?'

'হ্যাঁ।' রানার মন খুঁত খুঁত করছে।

'সাত হাজার ফুট, সার,' বলল পাইলট, আলটিমিটারে চোখ, ভুলেও রানার দিকে তাকাচ্ছে না।

'ছয় হাজার ফুট...পাঁচ হাজার...'

জরুরী কথাটা ইচ্ছে করেই পাইলটকে রানা মনে করিয়ে দিচ্ছে না। লোকটাকে পরীক্ষা করা দরকার।

'চার হাজার ফুট, সার!' হেডসেটের রিসিভারে পাইলটের চিৎকার শোনা গেল। 'জাম্প!'

লাফ দেয়ার ভঙ্গি করল রানা, কিন্তু যেন শেষ মুহূর্তে কিছু মনে পড়ে যাওয়ায় নিজেকে সামলে নিল। ঘাড় ফিরিয়ে পাইলটের দিকে তাকাল ও। লোকটা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। তার এই বিস্ময় কৃত্রিম কি না বোঝা যাচ্ছে না। 'বোটটার কথা ভুলে গেছেন আপনি,' বলল রানা, সম্পূর্ণ শান্ত। 'রিলিজ বাটনটায় চাপ দেননি।'

'আগে আপনি লাফ দিন, তারপর...'

'না,' তাকে থামিয়ে দিল রানা। 'বোট আর আমি একসঙ্গে নিচে পড়ব–কিংবা বোটের পিছু নেব আমি।' এ-কথা আর মুখের ওপর বলছে না–আমি জাম্প দিলাম, কিন্তু তুমি বোট না ফেলে কর্ডটা কেটে দিলে, অথৈ সাগরে আমার ডুবে মরার ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল!

সিটের ওপর খানিকটা ঘুরে বসল পাইলট, আড়াল থেকে ডান হাতটা বের করে আনল, ছোট্ট পিস্তলটা তালুর ভেতর প্রায় লুকিয়ে আছে। 'জাম্প, ইউ বাস্টার্ড!' হাত তুলে লক্ষ্য স্থির

করছে।

প্লেনের ভেতর গুলি করায় মারাত্মক ঝুঁকি আছে, তবে দরজা খোলা থাকায় তার মাত্রা অনেক কমে গেছে। ঠিক মত লাগাতে পারলে একটা বুলেটই ধাক্কা দিয়ে দরজার বাইরে ফেলে দেবে রানাকে।

মাথার দু'পাশে হাত তুলল রানা, আত্মসমর্পণের ভঙ্গি; চোখে-মুখে বিস্ময় ও বিমূঢ়তার ভাব ফুটিয়ে তুলল। 'কে তুমি? শাহ বকশী...'

'শাহ বকশীকে গুলি মারো!' বলল পাইলট। 'মাসুদ রানাকে জীবিত বা মৃত ধরে দিতে পারলে বিশ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল আইএসআই। আমার জানামতে সে ঘোষণা প্রত্যাহার করা হয়নি। জাম্প!'

'আমাকে বা আমার লাশ না দেখে কে তোমাকে পুরস্কার দেবে? সাগর সেচতে হলে খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি হয়ে যাবে না?' রানা আশা করছে, মিথ্যে বলে ধরা পড়ায় অন্তত এক সেকেন্ডের জন্যে অপ্রস্তুত বোধ করুক লোকটা, লাফ দিয়ে তার সিটের পিছনে পৌঁছাতে এক সেকেন্ড যথেষ্ট সময়।

কিন্তু এক সেকেন্ড যে অনেক বেশি দীর্ঘ হয়ে উঠতে পারে, তার প্রমাণ পাওয়া গেল। রানাও লাফ দিল, লোকটাও গুলি করল; দরজার সামনে ও না থাকায় বুলেটটা ওর পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। আধ সেকেন্ডও পেরোয়নি, পাইলটের পিছনে ডাইভ দিয়ে পড়ল ও, তার সিটের হাতলের তলায় আঙুল ঢুকিয়ে ইজেক্টর লিভার রিলিজ করে দিল। সেকেন্ড পুরো হয়নি, ছেড়ে দেয়া স্প্রিং সিটসহ পাইলটকে ওপর দিকে ছুঁড়ে দিল, ছাদ ফুঁড়ে প্লেনের বাইরে বেরিয়ে গেল সে। এয়ারপীস-এ তার আর্তচিৎকার শুনতে পাচ্ছে রানা। অটোতে রয়েছে প্লেন, যেমন উড়ছিল তেমনি উড়ছে। একেই বলে পরের জন্যে গর্ত খুঁড়লে সেই গর্তে নিজেকেই পড়তে হয়। রানাকে ডুবিয়ে মারতে চেয়েছিল লোকটা,

এখন নিজেই ডুবে মরবে।

ধীরে সুস্থে প্রস্তুত হলো রানা। প্লেন ঝাঁকি খাচ্ছে দেখে বুঝতে পারল ঝড়টা কাছে চলে আসছে। আলটিমিটারে চোখ বুলাল একবার। তিন হাজার ফুটে নেমে এসেছে প্লেন। রিলিজ বাটনে চাপ দিয়ে প্যাক করা ভেলাটা অবমুক্ত করল ও। স্পীডোমিটারের কাঁটার দিকে তাকাল, পাইলটকে দশ কিলোমিটার পিছনে ফেলে এসেছে।

দরজার কাছে ফিরে এলো রানা। ভেলা বা বোটের সঙ্গে আটকানো কর্কের কুণ্ডলীটা পরীক্ষা করল। রড থেকে চাকা লাগানো হুক খুলে নিচে ফেলে দিল প্যাকটা, ওটার পিছু নিয়ে লাফ দিল নিজেও।

প্যারাশুট দুটো ঠিক মতই খুলল। ঝড়ো বাতাসের প্রবল টান অনুভব করল রানা। খানিক আগে সন্ধ্যা নেমেছে, তার ওপর কুয়াশা, নিচে কি আছে দেখা না গেলেও আরব সাগরের গর্জন শুনে বুকের রক্ত হিম হয়ে এলো ওর। প্লেনটায় কোন আলো জ্বলছে না, তবে এঞ্জিনের চাপা গর্জন শুনতে পেল রানা, ক্রমশ দূরে মিলিয়ে গেল। ফুয়েল ফুরিয়ে গেলে সাগরে পড়ে ডুবে যাবে ওটা। রানা সকৌতুকে ভাবল, সবচেয়ে ভাল হয় ওটা যদি শাহ বকশীর মাথায় ভেঙে পড়ে।

পানিতে পড়ার পর দ্রুত প্যারাশুট মুক্ত হলো রানা। সাগরের হিংস্র ভাব দেখে নিজেকে অভয় দেয়ারও সাহস হচ্ছে না ওর। প্যাকটা টেনে এনে স্ট্র্যাপগুলো খুলল প্রথমে, তারপর নবটা খুঁজে নিয়ে টান দিল–ফোঁস ফোঁস শব্দ তুলে বাতাসে ভরে উঠল রাবার বোট। বোটের কঠিন অংশ বলতে শুধু আউটবোর্ড মোটর আর ছোট্ট সিটটা, দুটোই বোটের ফাইবার গ্লাস দিয়ে তৈরি পিছনের অংশে ফিট করা।

এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে বোট ছেড়ে দিল রানা, জানে না কোন দিকে যাচ্ছে। সিটের তলা হাতড়ে একটা ইমার্জেন্সী প্যাক পেল,

ভেতর থেকে একে একে বের করল কম্পাস, নেভিগেশনাল চার্ট, টর্চ, রেইনকোট, গরম কফি ভর্তি ফ্লাস্ক ইত্যাদি। চার্ট ও কম্পাস দেখে বোটের কোর্স বদলাল রানা। রেইনকোট গায়ে দিচ্ছে, শুরু হয়ে গেল তুমুল বৃষ্টি। ফ্লাস্কটা প্যাকে ভরে রাখতে হলো, কফিতে চুমুক দেয়া এখন কোনভাবেই সম্ভব নয়। ঢেউ ও বাতাস একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ছে বারবার খুদে বোটটার ওপর।

রানার হিসাবে চরস দ্বীপ চল্লিশ কিলোমিটার দূরে থাকতে প্লেন থেকে জাম্প করেছে ও। প্রচণ্ড বাতাস আর স্রোত বোটটাকে যদি কোর্স থেকে সরিয়ে না দেয়, দ্বীপটায় পৌঁছাতে দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা লাগবে ওর।

কিন্তু হিসাবের গরমিলটা এক ঘণ্টা পর ওর পৈত্রিক প্রাণ কেড়ে নেয়ার ষড়যন্ত্র করল। উন্মত্ত সাগরকে অনুভব করতে পারছে রানা, অন্ধকারে তার ভয়াল রূপ দেখতে পাচ্ছে না। একদিক থেকে ব্যাপারটা স্বস্তিকর, দেখতে না পাওয়ায় রুদ্র প্রকৃতির মর্জির ওপর নিজেকে ছেড়ে দিতে পারছে। কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না বলে বিপদটা তো আর ওকে রেহাই দেবে না। অকস্মাৎ ছোট্ট বোটটার যেন ডানা গজাল। শক্ত কিছুর সঙ্গে বোটের তলা ঘষা খাওয়ার পরিণতি। ওর হিসেবে চরস দ্বীপ এখনও বিশ কিলোমিটার দূরে। তাহলে কিসের সঙ্গে ঘষা খেলো? বোটের কিনারা ধরে তাল সামলাবার চেষ্টা করছে রানা, ঝপাৎ করে পানিতে পড়ল বোট। আগেই কোলের ওপর ইমার্জেন্সী প্যাকটা টেনে নিয়েছিল, বোট থেকে ছিটকে পড়ার সময় সঙ্গেই থাকল ওটা। নিরেট পাথরের ওপর পড়ল ও, হাড়গুলো যেন গুঁড়ো হয়ে গেছে। আওয়াজ শুনে বুঝতে পারল, কাছেপিঠে কোথাও ভেঙে চুরমার হচ্ছে মোটরটা, নিশ্চয়ই কোন বোল্ডারে বাড়ি খেয়েছে।

পরবর্তী ঢেউ ছিনিয়ে নিল রানাকে, তুলে আছাড় মারার ভঙ্গিতে বিশ-পঁচিশ ফুট দূরে আরেক পাথরের ওপর ফেলে গেল। এভাবে একের পর এক ঢেউগুলো ওকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে।

ব্যাপারটা ঘন ঘন, বিরতিহীন ঘটছে–দম নেয়ারও সুযোগ নেই। পাথরে বাড়ি খেয়ে খুলি ফেটে মগজ বেরিয়ে পড়তে পারে। একবার মনে হলো ওর চারপাশে শুধু পাথর আর পাথর। তারপর সন্দেহ হলো, বিপরীতমুখী স্রোত আবার গভীর পানির দিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওকে। এত কিছুর মধ্যেও মাথাটা ঠিক রেখেছে রানা। হিসাবের গরমিলের জন্যে পাকিস্তানী পাইলট দায়ী। তার প্ল্যান ছিল, চরস দ্বীপের যতটা সম্ভব কাছাকাছি রানার লাশ পাওয়া যাক। কেন, সে-প্রশ্নের উত্তর সে-ই দিতে পারত। সে যখন বলেছে চরস পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে, তখন আসলে দূরত্ব ছিল বিশ কি পঁচিশ কিলোমিটার।

হঠাৎ রানা অনুভব করল পানির একটা চওড়া স্তম্ভ ওকে নিয়ে দ্রুত বেগে ওপর দিকে উঠছে। সারা শরীরে চাবুকের মত আঘাত করছে নিচের পাথরে বাধা পেয়ে ফিনকি হয়ে ওঠা বিপুল জলরাশি। একটু পরই শুরু হলো পতন। রানা জানে না কোথায়, কিসের ওপর ফেলা হবে ওকে। ইমার্জেন্সী প্যাকটা দিয়ে মাথা ও হেডসেট আড়াল করার চেষ্টা করল ও।

পড়ল পানিতেই, সেই পানি ওকে সবেগে ভাসিয়ে এনে আছাড় মারল একটা বোল্ডারের গায়ে। জ্ঞান হারিয়ে নেতিয়ে পড়ল রানা, হাত থেকে ছুটে গেল ইমার্জেন্সী প্যাক। আরেকটা ঢেউ ছুটে এসে আঘাত করল ওকে, অচেতন শরীরটাকে ডুবতে দিল না, বরং পরম উপকারী বন্ধুর মত তুলে দিল বোল্ডারটার চওড়া মাথায়।

একমিনিটও পার হয়নি, জ্ঞান ফিরে পেল রানা। বাতাসের গর্জনকে ছাপিয়ে উঠছে প্রতি মুহূর্তে বিস্ফোরিত ঢেউয়ের বিকট আওয়াজ। ক্লান্ত শরীর নিয়ে পড়ে থাকল ও, অনুভব করল ইমার্জেন্সী প্যাকটা পাঁজরের নিচে চাপা পড়েছে। হেডসেটটা এখনও মাথায় আটকে আছে, বুঝতে পেরে অবাক হলো ও। তবে রেডিওটা অক্ষত আছে কিনা পরীক্ষা করার উৎসাহ বোধ করছে না।

*

পাঁচ মিনিট পর ধীরে ধীরে বসল রানা। ঝড়ের তাণ্ডব একটু যেন কমেছে। তবে অন্ধকার এত গাঢ়, নিজের হাত পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে না। প্রথমে ইমার্জেন্সী প্যাকটা সামলে রাখল ও। তারপর হেডসেটটা অ্যাডজাস্ট করল মাথায়। অন্ধকারে হাতড়ে রেডিওর নবটা পেয়ে ঘোরাচ্ছে চন্দ্রার ফ্রিকোয়েন্সি পাবার চেষ্টায়। 'রোমিও কলিং জুলিয়েট। দিস ইজ রোমিও, কলিং জুলিয়েট...'

সঙ্গে সঙ্গে যান্ত্রিক নারীকণ্ঠ শুনতে পেল রানা, 'জুলিয়েট বলছি। তুমি কোথায়, রোমিও?'

'থ্যাঙ্ক গড!' বিড়বিড় করল রানা। 'কি করে বলব কোথায়। অন্ধকারে কিছু দেখতে পেলে তো। অনেকগুলো বোল্ডারে বাড়ি খেয়ে একটার মাথায় এসে বসে আছি। বোটটা আগেই গুঁড়িয়ে গেছে।'

'ইমার্জেন্সী প্যাক?'

'ওটা আছে।'

'চার্ট বের করে টর্চ জ্বালো,' বলল নারীকণ্ঠ। 'আমিও তাই করছি। কে কোথায় আছি জানতে পারলে মিলিত হওয়া কোন সমস্যা নয়।'

'কোড,' বলল রানা।

'আই লাভ ইউ। আর তোমারটা?' জিজ্ঞেস করল ইন্ডিয়ান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট চন্দ্রা দেবযানি।

'আই লাভ ইউ, টু' বলল রানা, চার্ট ও টর্চ বের করছে।

পেন্সিল টর্চের আলো পরিবেশ বা চারপাশ সম্পর্কে ধারণা পেতে কোন সাহায্যে এলো না, তারচেয়ে রক্ত-মাংসের শ্রবণযন্ত্রের সেবা অনেক উন্নতমানের–জানিয়ে দিল, ঝড় থেমে যাচ্ছে।

'সব মিলিয়ে বড় আকৃতির জলমগ্ন বোল্ডার বাইশটা,' হেডসেট হয়ে চন্দ্রার গলা ঢুকল রানার কানে। 'তুমি সম্ভবত

ওগুলোর মাঝখানে রয়েছ। ঝুঁকি নিতে না চাইলে ঝড় না থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করো, তারপর সাঁতরে বোল্ডারগুলোকে পিছনে ফেলে একশো গজ এগোও—পাহাড়ের গা ঘেঁষে এসো।'

'তোমরা কোথায়?'

উত্তর দিতে এক সেকেন্ড দেরি করল চন্দ্রা। 'আমরা নই, আমি এখানে একা। পাহাড়ের গা ঘেঁষে একশো গজ এগোলে প্রথম গুহাটা দেখতে পাবে। গুনে গুনে পাশ কাটাবে। তেরো নম্বর গুহায় আছি আমি।'

'তুমি একা? মানে?' দম আটকে অপেক্ষা করছে রানা।

'আগে তুমি আমার কাছে পৌঁছাও, তারপর বলব,' বলল চন্দ্রা, একটু গম্ভীর।

'সে আসেনি?' রানা এখুনি জানতে চায়।

'এসেছিল, কিন্তু...পরে ব্যাখ্যা করব।'

সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ কেটে দিল রানা। নব ঘুরিয়ে সাঈদ শাকিরের ফ্রিকোয়েন্সি পাবার চেষ্টা করছে। 'রোমিও কলিং রোমিও। দিস ইজ রোমিও, কলিং রোমিও...'

বিরতিহীন তিন মিনিট চেষ্টা করেও সাঈদের কোন সাড়া পাওয়া গেল না। রানা উদ্বিগ্ন। কোন দুর্ঘটনা ঘটে থাকলে রেডিওতে তা ব্যাখ্যা করত চন্দ্রা। তারচেয়ে বড় কিছু ঘটেছে। সাঈদ শাকিরের সঙ্গে রানার পরিচয় নেই, জীবনে কখনও দেখেনি, কিন্তু ওরই মত একজন বিসিআই এজেন্ট সে। পরিচয় গোপন রেখে পাকিস্তানী ইন্টেলিজেন্স আইএসআই-এর ভেতর ঢোকা, তাদের বিশ্বাস অর্জন করা, তারপর ঢাকায় মূল্যবান তথ্য পাচার করা চাট্টিখানি কথা নয়। এরকম বিরল কৃতিত্ব রানারও খুব কম আছে। সাঈদ দেশের একটা অমূল্য সম্পদ, এ-কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। কাজেই রানার উদ্বিগ্ন হওয়াটা স্বাভাবিক।

আবার নব ঘোরাল রানা। চন্দ্রা ওকে ডাকছে। সাড়া না দিয়ে ইমার্জেন্সী প্যাক বন্ধ করে ঝুপ করে পানিতে নামল ও। বাতাস

নেতিয়ে পড়লেও বৃষ্টি থামেনি।

বোল্ডারগুলো পিছনে ফেলে এলো রানা। পাহাড়ের গায়ে শ্যাওলা জমেছে, পিছলে যাচ্ছে হাত। চন্দ্রার গলার উদ্বেগ, তবু সাড়া না দিয়ে এগোচ্ছে। হাতের স্পর্শ দিয়ে অনুভব করল প্রথম গুহা। রেডিওটা বন্ধ করে দিল ও। গুহাগুলো পাশাপাশি, খানিক পরপর। গুনছে রানা।

তেরো নম্বর গুহা। আনলাকি থারটিন। বারো নম্বরকে পাশ কাটাচ্ছে রানা। চন্দ্রা সম্ভবত তেরো নম্বরের ভেতর দিকে আছে; কিংবা হয়তো মুখেই দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু টর্চ জ্বালছে না। রেডিও অন করল রানা, শুনতে পেল চন্দ্রা ডাকছে, 'জুলিয়েট কলিং রোমিও। আচ্ছা, তুমি কি আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছ?'

পানিতে দাঁড়িয়ে একটা ছোট পাথরের ওপর রেখে ওয়াটারপ্রূফ ইমার্জেন্সী প্যাকটা খুলল রানা। ওয়ালথারটা বের করে হাতেই রাখল। গ্রেনেডগুলো চালান করে দিল বেল্টের সঙ্গে আটকানো লেদার পাউচে।

চন্দ্রা অসহায় বোধ করছে, অন্তত গলা শুনে সেরকমই মনে হলো রানার। 'মা দুর্গা, এ আবার কি বিপদে ফেললে আমাকে! জুলিয়েট কলিং রোমিও...'

অনেকক্ষণ পর এই প্রথম সাড়া দিল রানা। 'এ যে দেখছি আদি ও অকৃত্রিম বঙ্গললনা! তা টর্চ জ্বালোনি কেন?'

'উফ!' সশব্দে নিঃশ্বাস ছাড়ল মেয়েটা, গলার আওয়াজে স্বস্তি ও বিস্ময় দুটোই প্রবল। 'বলি, মশাই কি আমার সঙ্গে কৌতুক করছ?'

হাতের স্পর্শ দিয়ে তেরো নম্বর গুহার মুখ অনুভব করল রানা। উঁকি দিয়ে ভেতরে তাকিয়ে আলোর কোন আভাসই পেল না। 'টর্চ জ্বালো!' নির্দেশটা ধমকের মত শোনাল।

'টর্চ আমি জ্বালছি না,' বলল চন্দ্রা। 'তুমিও জ্বালতে পারবে না। অসুবিধে আছে।'

কল-কল শব্দ করে গুহার ভেতর পানি ঢুকছে। রানার এক হাতে পিস্তল, আরেক হাতে পেন্সিল টর্চ। ইমার্জেন্সী প্যাকটা স্ট্র্যাপ দিয়ে বেল্টে লটকে রেখেছে। দেয়াল ঘেঁষে গুহার ভেতর ঢুকছে ও। মাউথপীসে ফিসফিস করল, 'কি অসুবিধে?'

চন্দ্রা সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলল না। তবে তার নিঃশ্বাসের শব্দ পাচ্ছে রানা। রহস্যটা জটিল লাগছে। মেয়েটা হাঁপাচ্ছে কেন? 'আ-আমি...আমার পরনে কিছু নেই।'

'হোয়াট! কেন?'

'তুমি কি তেরো নম্বর গুহায় ঢুকেছ?' জানতে চাইল চন্দ্রা।

গুহাটা কত বড়, চন্দ্রা কোথায় রয়েছে, অন্ধকারে বোঝার কোন উপায় নেই। 'না–ঢুকতে যাচ্ছি,' মিথ্যে বলল রানা। চন্দ্রাও হয়তো প্রাণের দায়ে মিথ্যে কথা বলছে। রানার আশঙ্কা, মেয়েটাকে কেউ জিম্মি করে থাকতে পারে।

'গুহার মুখ থেকে বিশ-বাইশ গজ ভেতরে আমি,' বলল চন্দ্রা। 'কোন ভয় নেই, সোজা চলে এসো। তবে আলো জ্বেলো না, প্লীজ।'

কথা না বলে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে রানা। পানির দ্রুতগতি আসা-যাওয়া খুব কাজে লাগাছে, চন্দ্রার সঙ্গে কেউ থাকলে ওর এগোবার শব্দ শুনতে পাচ্ছে না। রেডিও অফ করে হেডসেটটা মাথা থেকে খুলে ফেলল। আরও কয়েক পা এগোতে গুহার শুকনো মেঝে পাওয়া গেল। দেয়াল ঘেঁষে বসল রানা, তারপর শুয়ে পড়ল, ক্রল করে এগোচ্ছে। 'আমার হাতে গ্রেনেড আছে,' ফিসফিস করল ও। 'পিন খোলার বদলে বোতামে চাপ দিতে হয়।'

তিন হাত সামনে থেকে মেয়েটার কাঁপা কাঁপা নার্ভাস হাসির শব্দ ভেসে এলো। 'যা ভাবছ তা নয়, আমার সঙ্গে কেউ নেই।'

গলার আওয়াজ শুনে আরও একটু এগিয়ে পেন্সিল টর্চটা জ্বালল রানা, নিঃশ্বাসের শব্দকে তাক করে।

ক্লাসিক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে নগ্ন নারীমূর্তি—একটা হাত নাভীর নিচে, আরেকটা হাত বুকের ওপর আড়াআড়ি ভাবে ভাঁজ করা। আঁতকে ওঠার শব্দ বেরুল চন্দ্রার গলা থেকে, দ্রুত পিছিয়ে গেল এক পা। 'আচ্ছা মানুষ তো! ছি!'

'দুঃখিত,' বলল রানা, টর্চটা নিভিয়ে ফেলল। 'নিশ্চিত না হয়ে উপায় ছিল না আমার।' দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা, পিস্তলটা হাতে তৈরি। 'তোমার এই অবস্থা হলো কি করে? সাঈদই বা কোথায়? ভাল কথা; আমি মাসুদ রানা।'

'আমি চন্দ্রা দেবযানি। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলছি, শুরুতেই কেঁচে গেছে মিশন,' ম্লান গলায় বলল চন্দ্রা।

'মানে?' গায়ের রেইনকোটটা খুলে চন্দ্রার হাতে ধরিয়ে দিল। 'এটা পরো।'

'তোমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পা দুটো অবশ হয়ে গেছে। এসো, আগে কোথাও বসি, তারপর বলছি সব।'

'বেশ। কিন্তু এখানে বসব কোথায়?'

'আমার সঙ্গে এসো,' বলল চন্দ্রা, অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে রানার একটা কব্জি খুঁজে নিল। 'এই গুহাটা আমি কপালগুণে পেয়ে গেছি। এটার দ্বিতীয় মুখ লেকের পানিতে অর্ধেক ডোবা। ওরা ধাওয়া করছিল, জান বাঁচাবার জন্যে লেকে ঝাঁপিয়ে পড়ি। লেক পেরিয়ে একটা বাতি দেখে ভেতরে ঢুকে পড়েছি।'

রানা অনুভব করল গুহার মেঝে ক্রমশ ঢালু হয়ে গেছে। আবার পানিতে পা দিল ওরা। গোড়ালি, তারপর হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেল।

আরও বিশ গজ এগোবার পর থামল চন্দ্রা, দেয়াল হাতড়ে বলল, 'কার্নিসটা পেয়েছি। উঠে বসো।'

রানাও হাত দিয়ে কার্নিসের স্পর্শ পেল। পা ঝুলিয়ে বসল ও, চন্দ্রাকে উঠতে সাহায্য করল।

প্রথম থেকে শুরু করল চন্দ্রা।

ওরা প্লেন থেকে জাম্প করে দুপুর দুটোর একটু পর। কুয়াশা থাকায় সুবিধেই হয়েছিল, বোট নিয়ে ওদের দ্বীপে ওঠা কেউ দেখতে পায়নি। এই গুহাটা বাদে আর মাত্র একজোড়া গুহার দুটো করে মুখ আছে, বাকি সব কানা। রানার পৌঁছাতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে, এ-কথা বলে সাঈদ সিদ্ধান্ত নেয় দ্বীপটা একবার ঘুরে দেখে আসবে। চন্দ্রা একটু আপত্তি করেছিল, কিন্তু সাঈদ বারবার একই কথা বলতে থাকায় শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে ও বলে, ঠিক আছে, গেলে একা যাও, এবং বলে যাও ঠিক কখন ফিরবে। সাঈদ কথা দেয়, এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসবে সে। দু'জন মিলে একটা দু'মুখো গুহা খুঁজে বের করে ওরা, বোটটা টেনে তোলে, তারপর চন্দ্রাকে সেখানে রেখে সাঈদ চলে যায়।

আধ ঘণ্টা পর্যন্ত সাঈদের সঙ্গে রেডিও যোগাযোগ ছিল চন্দ্রার। তারপর হঠাৎ করেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, অনেক ডেকেও তার কোন সাড়া পায়নি ও। দেখতে দেখতে এক ঘণ্টা পার হয়ে গেল। সাঈদ ফিরল না। নিশ্চয়ই কোন বিপদে পড়েছে, সাহায্য দরকার,, এ-কথা ভেবে পিস্তল ও গ্রেনেড নিয়ে সাঈদের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে চন্দ্রা। লেকের পাশ ঘেঁষে, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সাবধানে হাঁটতে থাকে ও। ঘড়ির কাঁটার ওপর চোখ রেখে সময়ের একটা হিসাব রাখছিল, আধ ঘণ্টা পর ফাঁকা একটা জায়গার কিনারায় পৌঁছে থামল, ধারণা করল এই জায়গা থেকেই নিখোঁজ হয়েছে সাঈদ। জঙ্গল থেকে উঁকি দিয়ে দেখল, ফাঁকা জায়গাটার মাঝখানে পাশাপাশি তিন-চারটে কুঁড়েঘর দাঁড়িয়ে আছে। ঘরগুলো খালি মনে হলো চন্দ্রার। ওখানে দাঁড়িয়ে কি করবে ভাবছে, এই সময় ওর দু'পাশ ও পিছন থেকে পাঁচ-ছ'জন লোক ঘিরে ফেলল ওকে। পিস্তল চালাবার কোন সুযোগই পায়নি চন্দ্রা। ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ধরে ফেলে লোকগুলো। তাদের সবার পরনে সাদা-কালো আলখেল্লা ছিল—কালো কাপড়ের ওপর সাদা রঙে মানুষের খুলি প্রিন্ট করা; হাতে ছিল খোলা তলোয়ার।

লোকগুলো গুজরাটি ভাষায় কথা বলছিল। চন্দ্রাকে নিয়ে একটা কুঁড়ে ঘরে ঢোকে তারা। পরে তাদের সঙ্গে একজন বয়স্ক রাশিয়ান লোক যোগ দেয়। লোকটা রাবারের মুখোশ পরে ছিল। সবাই তাকে 'জেনারেল গোরস্কি' বলে সম্বোধন করছিল। নামটা শুনে মনে মনে চমকে উঠল রানা।

জেনারেল চন্দ্রাকে ইন্টারোগেট করার দায়িত্ব দিয়ে চলে গেল। সে চলে যাবার পর পাঁচজনের দলটা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া শুরু করে। আগে রেপ, নাকি আগে ইন্টারোগেট–এই নিয়ে মতবিরোধ। শেষ পর্যন্ত ভোটাভুটিতে স্যাডিস্টরা জিতল। চন্দ্রার কাছ থেকে পিস্তল ও গ্রেনেড আগেই কেড়ে নিয়েছিল লোকগুলো, এবার পরনের কাপড়ও কেড়ে নিল।

নিজেদের মধ্যে টস করল ওরা। তারপর একজনকে রেখে বাকি চারজন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। লোকটা জিজ্ঞেস করল, নিয়তিকে মেনে নিয়ে চন্দ্রা তার সঙ্গে সহযোগিতা করবে কি না। চন্দ্রা জানাল, করবে। লোকটা তলোয়ার ও সদ্য খোলা কাপড়চোপড় মেঝেতে রেখে খাটিয়ার ওপর চন্দ্রার পাশে শুয়ে পড়ল।

বিশদ বর্ণনায় গেল না চন্দ্রা। নাগালের মধ্যে থাকায় এক সুযোগে তলোয়ারটা তুলে নেয় হাতে, দু'হাতে ধরে গেঁথে দেয় লোকটার পাজরের ফাঁকে। সময় মত তার মুখে হাতচাপা দিতে পারেনি ও, ফলে তার চিৎকার শুনে পাশের ঘর থেকে লোকগুলো হৈ-চৈ করে ওঠে। খাটিয়া থেকে লাফ দিয়ে নেমে কোন দিকে তাকায়নি চন্দ্রা, দরজা খুলে ছুটতে থাকে।

লোকগুলো ওকে ধাওয়া শুরু করে একটু দেরিতে। তারা ওকে দেখতে পায়নি, তবে পায়ের আওয়াজ শুনেছে। ছুটতে ছুটতে লেকের সামনে চলে আসে চন্দ্রা। চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে বুঝতে পারে তিনদিক থেকে ছুটে আসছে ওরা, সংখ্যায় বিশ-পঁচিশজনের কম হবে না। ধরা পড়ার ভয়ে বাধ্য হয়ে লেকের পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ও। কচুরিপানার তলায় কিছুক্ষণ লুকিয়ে

ছিল, তারপর ডুব সাঁতার দিয়ে লেকের এপারে চলে আসে। যেখান থেকে রওনা হয়েছিল, সেই দু'মুখো গুহায় ফিরে যাবার কোন উপায় ছিল না, কারণ সেদিকে কয়েকজন লোককে ছুটোছুটি করতে দেখতে পায় ও। লেকের কিনারায় চওড়া একটা গর্ত দেখে বাধ্য হয়ে তার ভেতরই ঢুকে পড়ে। সেই গর্তই এই গুহা। ভাগ্যই বলতে হবে যে ওর খোঁজে লোকগুলো লেকের এপারে আসেনি।

চন্দ্রা থামতে রানা জিজ্ঞেস করল, 'লোকগুলো বা জেনারেল গোরস্কি সাঈদ সম্পর্কে কিছুই বলল না?'

'আমার কাছেও ব্যাপারটা আশ্চর্য লেগেছে,' বলল চন্দ্রা। 'সাঈদ ধরা পড়লে অন্তত গর্ব করেও তো কথাটা বলত ওরা। না, কোন আভাসও পাইনি।'

'তবে তোমাকে যেভাবে হঠাৎ ঘিরে ধরে, ওরা যেন জানত সাঈদের খোঁজে তুমি আসবে,' বলল রানা।

'হ্যাঁ, তা-ও ঠিক।'

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা। 'শত্রুর হাতে ধরা পড়ার পর নিজেকে মুক্ত করে আনতে পারলে প্রাণ বাঁচানো ছাড়াও কিছু না কিছু লাভ হয়ই। প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। তুমি কি কি পেলে, চন্দ্রা?'

'আজ রাত ন'টায় ওদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান,' বলল চন্দ্রা। 'শাহ বকশীর শুধু ভক্ত যারা, দীক্ষা নিয়ে আজ তারা তার সাক্ষাৎ শিষ্য হবে। নতুন শিষ্যদের এক সেট করে পোশাক আর একটা করে তলোয়ার দেয়া হবে। শামিয়ানার নিচে সারারাত ধরে শয়তানের উপাসনা চলবে। একজন বলল, নরবলিও নাকি দেয়া হবে। ওরা আশা করছে ওটা দেখতেই অন্তত পাঁচ হাজার লোক জড়ো হবে।'

'ভেরি গুড,' মন্তব্য করল রানা।

'মানে?' প্রায় চ্যালেঞ্জের সুরে প্রশ্ন করল চন্দ্রা। 'কি করতে চাও তুমি?'

অন্ধকারে হাসল রানা। 'যা করতে এসেছি।'

'ওরা কমপক্ষে পাঁচ হাজার,' প্রতিবাদের সুরে বলল চন্দ্রা। 'আমরা মাত্র দু'জন, তার মধ্যে একজন নিরস্ত্র ও বিবস্ত্র; কিছুই তো করতে পারব না।'

'পাঁচ হাজারের বেশিরভাগই নিরীহ মেষপালক,' বলল রানা, 'তাদের কাছে কোন অস্ত্রও থাকবে না।'

'ভেবো না মৃত্যুভয়ে কাঁপছি আমি,' শান্ত গলায় বলল চন্দ্রা। 'তবে এ-কথা না বলে পারছি না, যে সমাবেশে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি হবে, সেখানে আমাদের হাজির হওয়াটা সাহসের পরিচয় নয়, কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজ হবে−নেহাতই বোকামি।'

অন্ধকারে রানার চেহারা একটু কঠিন হলো। 'এই মিশনের লীডার হিসেবে সেই বোকামি করারই নির্দেশ দিচ্ছি তোমাকে আমি, চন্দ্রা দেবযানি। আমার কাছে প্রচুর গ্রেনেড আছে, অতিরিক্ত একটা পিস্তলও আছে, লাগবে মনে করলে ধার চাইতে পারো।'

বিশ সেকেন্ড চুপ করে থাকল চন্দ্রা। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, দাও। বলাই তো হয়েছে, এটা সুইসাইড মিশন। কিন্তু তোমার এই রেনকোট ট্র্যান্সপারেন্ট নয় তো? সেক্ষেত্রে...'

'হ্যাঁ, ওটা স্বচ্ছ,' বলল রানা। 'তবে তা না হলেও খুলতে হত, কারণ ওটা পরে হাঁটলে বড় বেশি খসখস শব্দ হবে।'

'তাহলে আমি যাব কিভাবে?' চন্দ্রার গলায় রাগ।

'আগে জিজ্ঞেস করো কোথায় যাবে।'

'কোথায়?'

'যে ঘরে খাটিয়াটা আছে। ওই যে, যে খাটিয়ায় তোমাকে শোয়ানো হয়েছিল।'

হঠাৎ ফোঁস করে উঠল চন্দ্রা। 'তুমি কি আমাকে বিদ্রূপ করছ?'

'ওখানে তোমার ছেড়ে আসা কাপড়চোপড় আশা করা যায় এখনও পড়ে আছে,' বলল রানা। 'বিদ্রূপ? নাহ! বোকামি করে ধরা পড়েছিলে ঠিকই, কিন্তু বীরত্বের পরিচয় দিয়ে নিজেকে মুক্ত

করেছ—কাজেই প্রশংসাই তোমার প্রাপ্য।'

'ধন্যবাদ,' থমথমে গলায় বলল চন্দ্রা। 'তা বোকামিটা করলাম কোথায়?'

'বোকামিটা শুরু করে সাঈদ, টীম লীডার পৌঁছানোর আগেই ঝুঁকি নিয়ে কিছু করতে যাওয়াটা উচিত হয়নি তার। গেলই যখন, তার উচিত ছিল তোমাকে ব্যাকআপ হিসেবে পিছনে রাখা। তাকে একা খুঁজতে গিয়ে বোকামির মাত্রা আরও বাড়িয়েছ তুমি। ওরা সতর্ক হয়ে আছে।'

'হ্যাঁ, ভুল হয়ে গেছে,' স্বীকার করল চন্দ্রা। 'সেজন্যেই তো বলছি, মিশনটা কেঁচে গেছে।'

'না, আমি তা মনে করি না। ওরা আর যাই আশা করুক, এটা নিশ্চয়ই আশা করছে না যে ওই কুঁড়ে ঘরে যাব আমরা। কাজেই ওখান থেকেই শুরু করব। আর শুরু করার পর দেখবে সম্ভাবনার কেমন ডালপালা গজায়।'

চন্দ্রা হঠাৎ উৎসাহী হয়ে উঠল। 'তাহলে চলো, ভগবানের নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।'

অন্ধকারে মুচকি হাসল রানা। 'আমি বিসমিল্লাহ বলে রওনা হব।'

চার

প্রবল ঝড় সমস্ত কুয়াশাকে আগেই ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছে, ইতিমধ্যে মেঘ সরে যাওয়ায় রাতের আকাশে মিটমিট করে বেশ

কিছু তারাও জ্বলতে দেখা গেল। ফাঁকা জায়গাটা কোন্ দিকে জেনে নিয়ে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ করে নিয়ে একাই এগোচ্ছে রানা। পিছনে ও খানিকটা ডানপাশে কোথাও আছে চন্দ্রা, ওর ব্যাকআপ হিসেবে। ধরা পড়লে যে-কোন একজন; পরে তাকে যাতে অপরজন সাহায্য করতে পারে।

জঙ্গলের ভেতর পায়ে চলা পথ একটা আছে, তবে সেটাকে এড়িয়ে যাচ্ছে রানা। শুকনো পাতার ওপর কিভাবে পা ফেলতে হবে শিখিয়ে দিয়েছে ও, ফলে চন্দ্রার কোন শব্দ পাচ্ছে না। রেনকোটটা গুহায় ফেলে রেখে এসেছে মেয়েটা, ওটার বদলে রানার কালো লেদার জ্যাকেট পরেছে সে। ওটা যথেষ্ট লম্বা হলেও চন্দ্রার কলা গাছ তুল্য উরু দুটো ঢাকতে পারেনি, তবে লজ্জা নিবারণের কাজে লাগছে। পিস্তলটা হাতে রাখতে বলে দিয়েছে রানা। গ্রেনেডগুলো সাইড পকেটে। একান্ত বাধ্য না হলে পিস্তল বা গ্রেনেড কিছুই ব্যবহার করা যাবে না।

রানার ধারণা ছিল, শাহ বকশীর প্রহরীরা লেকের ওপর কড়া নজর রাখছে। কারণ তারা তো জানেই যে লেকের কাছাকাছি কোথাও ওদের চোখকে ফাঁকি দিয়েছে চন্দ্রা। তাই লেক পেরোবার সময় খুব সাবধান ছিল ওরা, পানিতে প্রায় কোন আলোড়নই উঠতে দেয়নি। ছোট্ট লেকটা আড়াআড়িভাবে পেরুতে প্রায় আধ ঘণ্টা সময় লেগেছে ওদের। তীরে উঠে পাঁচ মিনিট নড়েনি। কিন্তু না, কোন গার্ড দেখেনি ওরা।

বিপদ হয়নি বলেই মনটা খুঁত-খুঁত করছে রানার। লেকে পাহারা না রাখাটা খুবই বিস্ময়কর। এর পিছনে নিশ্চয়ই কোন তাৎপর্য আছে। সেটা কি হতে পারে তা অবশ্য এখনও বোঝা যাচ্ছে না।

কোথাও একটা ফাঁদ থাকার কথা। কিন্তু কোথায়?

ফাঁকা জায়গাটার কিনারায় পৌঁছে প্রথমেই রানা লক্ষ করল, কুঁড়েগুলোয় কোন আলো জ্বলছে না। রাত মাত্র শুরু হয়েছে,

লোকজন এরইমধ্যে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়বে না, বিশেষ করে দ্বীপে আজ যেখানে নরবলি দেয়া হবে। তবে কি অনুষ্ঠান দেখতে চলে গেছে সবাই?

নিঃশব্দে ওর পাশে এসে দাঁড়াল চন্দ্রা। একটা হাত তুলে ডান পাশের নিঃসঙ্গ কুঁড়েটা দেখাল ওকে, ফিসফিস করে বলল, 'ওটায়–আমাকে শোয়ানো হয়েছিল।'

'কাজেই ওই ঘরে আমাকে ঢুকতে হবে,' বলল রানা। 'তুমি বাইরে পাহারায় থাকবে।'

'কিন্তু ভেতরে যদি লোক থাকে?' একটা ঢোক গিলল চন্দ্রা।

'গ্রামে কখনও থেকেছ?' জিজ্ঞেস করল রানা, অস্পষ্ট ভাবে টের পেল চন্দ্রা মাথা ঝাঁকাচ্ছে। 'তাহলে নিশ্চয়ই জানো যে টিনের চালে ভৌতিক ইঁট পড়ে। আর ইঁট একবার পড়লে হয়, হৈ-হৈ করে বেরিয়ে আসে লোকজন, নিদেনপক্ষে মা-বাপ তুলে গালিগালাজ তো করেই।' বসে পড়ল রানা, মাটিতে হাত দুলিয়ে ইঁট বা পাথর খুঁজছে। ছোট্ট দুটো নুড়ি পাথর পেল।

'কিন্তু ওরা তো জেনে ফেলবে!' চন্দ্রা হতভম্ব। 'নিশ্চয় ধাওয়াও করবে। তখন?'

'বিপদ দেখলে গুলি করব। আর যদি ওদের চোখে ধরা না পড়ি, দ্বীপের পুবদিকে পৌঁছাতে চেষ্টা করব।'

'পুবদিকে কেন?' জিজ্ঞেস করল চন্দ্রা। 'মিসাইল ঘাঁটিটা তো পশ্চিম দিকে।'

'পুবদিকে শাহ বকশীর আস্তানা। তাছাড়া, তুমিই বলেছ যে আজ রাতে নরবলি অনুষ্ঠানের আয়োজন ওদিকেই করা হয়েছে।'

'হ্যাঁ; শাহ বকশী যে কেল্লায় থাকে, তার সামনের চত্বরে। কিন্তু তোমার উদ্দেশ্যটা কি? ওদের অনুষ্ঠান পণ্ড করা?'

'সুযোগ পেলে অবশ্যই ছাড়ব না,' বলল রানা। 'কারণ আমি বর্বরতার বিরুদ্ধে। তবে অনুষ্ঠানে আমি যেতে চাইছি শাহ বকশীর মাথায় পিস্তল ঠেকাবার জন্যে। তাকে ধরতে পারলে মিসাইল

ঘাঁটিও আমাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে।'

'স্পর্ধার মত শোনাচ্ছে না?' বিড়বিড় করল চন্দ্রা। 'এ আমি কার পাল্লায় পড়লাম!'

উত্তরে প্রথম নুড়িটা ছুঁড়ল রানা। নিস্তব্ধ জঙ্গলের ভেতর টিনের চালে যেন বোমা পড়ল। টান টান কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর ঢিল পড়ল পেশিতে। ঘর থেকে কেউ বেরুচ্ছে না, কোন চিৎকারও নেই। পেশিতে ঢিল পড়লেও, রানার মন আগের চেয়ে বেশি খুঁত-খুঁত করছে।

পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করল ওরা। ঢিল পড়ার শব্দ শুনে আশপাশ থেকেও কেউ এলো না। চন্দ্রাকে ঝোপের ভেতর পাহারায় রেখে ফাঁকা জায়গায় নিজেই বেরুল রানা। কোথাও কোন শব্দ নেই, শুধু ঝিঁঝি পোকারা ডাকছে। নির্দিষ্ট কুঁড়ের পাশে থামল ও। দরজাটা বন্ধ, তবে হাতের চাপে খুলে গেল। পেন্সিল টর্চের আলো ক্ষীণ হলেও অন্ধকার গাঢ় হওয়ায় ফাঁকা ঘরের সবটুকুই অস্পষ্টভাবে দেখা গেল। ভেতরে ফার্নিচার বলতে শুধু রশি দিয়ে তৈরি সেই খাটিয়াটা। মেঝেতে জিনসের ট্রাউজার, শার্ট ও খাটো লেদার জ্যাকেট স্তূপ হয়ে পড়ে আছে। টর্চ নিভিয়ে দ্রুত ভেতরে ঢুকল রানা, কাপড়গুলো তুলে নিয়ে বেরিয়ে এলো সঙ্গে সঙ্গে।

'তলোয়ার বা লাশটা আছে ওখানে?' রানার হাত থেকে কাপড়গুলো নিয়ে জিজ্ঞেস করল চন্দ্রা।

ঝোপের ভেতর হাঁটু মুড়ে বসে চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে রানা। 'তা নেই,' বলল ও। 'কিন্তু যেভাবে ফেলে রেখে গেছে, ওরা যেন জানে কাপড়গুলো তুমি নিতে আসবে।'

'তাহলে নিশ্চয়ই কোথাও একটা ফাঁদ পেতে রেখেছে,' ফিসফিস করল চন্দ্রা, দ্রুত কাপড় পরছে সে।

বোতাম টিপে রোলেক্স হাতঘড়ির ডায়াল আলোকিত করল রানা। 'সাড়ে সাতটা। ঠিক শুনেছ, ওদের অনুষ্ঠান ন'টায় শুরু

হবে?' ঝোপ থেকে বেরিয়ে সাবধানে এগোচ্ছে ও, ঠিক ওর পাশেই রয়েছে চন্দ্রা।

'ন'টায় ভাষণ দেবে শাহ্ বকশী। নরবলি কখন হবে জানি না।'

'দেড় ঘণ্টায় কেল্লার সামনে পৌঁছাতে পারব?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ম্যাপ রেফারেন্স যতটা মনে আছে, এখান থেকে কেল্লাটা মাইল চারেকের বেশি হবে না, কিন্তু দুটো পাহাড় আর তিনটে উপত্যকা পেরুতে হবে।'

'কেল্লাটাও তো আরেক পাহাড়ের মাথায়,' বলল চন্দ্রা। 'জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পাহাড়ী পথ, সময়মত পৌঁছানো যাবে বলে মনে হয় না।'

'তাহলে বৃথা পরিশ্রম করার কোন মানে হয় না। চলো, তোমাদের বোটটা খুঁজে বের করি, তারপর সাগর পাড়ি দিয়ে বোম্বে গিয়ে উঠি।'

'ভালই বিদ্রূপ করতে জানো দেখছি,' বলল চন্দ্রা, সুরটা নরম। 'তবে আমি কিছু মনে করছি না, কারণ নিজেকে তুমি একজন ভদ্রলোক বলে প্রমাণ করেছ।'

'তাই! কিভাবে?'

'নিজের সম্ভ্রম রক্ষার জন্যে আমাকে গলদঘর্ম হতে হয়নি,' চন্দ্রার গলায় কৃতজ্ঞতার সুর। 'তোমার জায়গায় অন্য কেউ হলে...' কথাটা শেষ করল না।

অন্ধকারে মুচকি হেসে রানা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। 'কি হারালাম ভেবে এখন আফসোস হচ্ছে।'

জঙ্গল ঢাকা চড়াই বেয়ে উঠছে ওরা। বিশ মিনিট পর ছোট একটা পাহাড়ের মাথায় উঠে এলো। নিচু ঝোপ ছাড়া উঁচু কোন গাছপালা নেই এখানে। শেষ প্রান্তে একটা কাঠামো দেখা গেল, আকাশের গায়ে ফুটে আছে। চন্দ্রা জিজ্ঞেস করল, 'কি ওটা? এখানে কি শাহ্ বকশী ফুটবল খেলে?'

কাঠামোটা হুবহু গোলপোস্টের মতই দেখতে বটে। ফাঁকা জায়গাটার চারদিকে ভাল করে তাকাল রানা। তারপর মাথা নাড়ল। 'ফুটবল খেলতে দুটো গোলপোস্ট দরকার। আরেকটা কোথায়?'

ধীরে ধীরে, সাবধানে এগোচ্ছে ওরা। কাঠামোটা আরও স্পষ্ট হচ্ছে। হঠাৎ রানার কব্জির ওপরটা সজোরে খামচে ধরল চন্দ্রা, দাঁড়িয়েও পড়েছে। 'হে ভগবান, ওগুলো কি!'

রানাও দেখতে পেয়েছে–ক্রসবার থেকে কি সব ঝুলছে। অল্প বাতাসে দুলছে ওগুলো। রশির সঙ্গে ঝুলিয়ে বাঁধা, তাই পাক খাচ্ছে অলস গতিতে। ওগুলোর আকৃতিই ভয় পাবার জন্যে যথেষ্ট।

গোলপোস্ট নয়, ফাঁসিকাঠ। গজখানেক ব্যবধানে তিনটে লাশ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। 'শুয়ে,' নির্দেশ দিল রানা, 'কাভার দাও আমাকে। আকাশের গায়ে আমার হাত দেখলে এগোবে।'

সাবধানে ফাঁসিকাঠের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। লাশগুলোর পরনে ধুতি ও ফতুয়া। তিনজনেরই জিভ বেরিয়ে পড়েছে। খালি পা ঠাণ্ডা হিম হয়ে আছে। অন্তত পাঁচ-সাত ঘণ্টা আগে মারা গেছে লোকগুলো।

চোখের কোণ দিয়ে কিছু একটা নড়তে দেখল রানা। ছোট একটা বোর্ড, একদিকের পোস্টে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। গুজরাটী ভাষায় কি সব লেখা রয়েছে বোর্ডে, রানা পড়তে পারছে না। মাথার ওপর একটা হাত তুলে সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে নিল রানা।

দ্রুত ওর পাশে এসে দাঁড়াল চন্দ্রা। কিছু বলতে হলো না, বোর্ডের লেখা ফিসফিস করে পড়ল–'গুপ্তচর ছাড়া চরস থেকে কেউ পালাতে চেষ্টা করবে না। এই লোকগুলো পালাতে গিয়ে ধরা পড়েছে। শাহ বকশী একদিকে যেমন দয়ার সাগর, আরেকদিকে তেমনি নিষ্ঠুর পাষাণ। মহামান্য শয়তান শাহ বকশীর মাধ্যমে এদেরকে শাস্তি দিয়েছেন।'

পরের পাহাড় চূড়ায় এরকম আরও পাঁচটা লাশ ঝুলতে দেখল ওরা, বোর্ডে একই কথা লেখা। কয়েকটা শেয়াল লাফ দিয়ে লাশগুলোর নাগাল পাবার চেষ্টা করছিল, ওদের দেখে পালিয়ে গেল।

'বিকেলে গ্রামের সাধারণ লোকজন এই পথ দিয়ে কেল্লার দিকে গেছে,' বলল রানা। 'সম্ভবত তাদেরকে দেখাবার জন্যেই এভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে লাশগুলো।'

'তবে অন্য কোনভাবে খুন করে ঝোলানো হয়নি,' বলল চন্দ্রা। 'ফাঁসিতে লটকেই খুন করা হয়েছে।'

'আমারও তাই ধারণা।'

'ধরা পড়লে আমাদেরও এই অবস্থা করবে।'

লাশগুলো পরীক্ষা শেষ করে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'মনে হয় না,' বলল ও। 'অন্তত সাঈদকে ওরা ফাঁসিতে ঝোলায়নি।'

'তারমানে, দুটো জিনিস ধরে নিচ্ছ তুমি। এক, সাঈদ ওদের হাতে ধরা পড়েছে। দুই, সামনে আর কোন ঝুলন্ত লাশ নেই।'

ভুল করলে স্বীকার করার মানসিকতা রানার আছে। 'না, সামনে আরও লাশ থাকতে পারে।'

আছে, তবে ওদের চলার পথে সেগুলো পড়ল না। পাহাড় থেকে নেমে উপত্যকা পেরুচ্ছে ওরা। পাহাড়ের নিচে জঙ্গল আরও ঘন, তার ওপর পায়ে হাঁটা সরু পথ এড়িয়ে নিজের পথ তৈরি করে নিয়ে এগোচ্ছে, এগোবার গতি স্বভাবতই অত্যন্ত ধীর। একদল শেয়ালের লাফ-ঝাঁপ ওদেরকে সতর্ক করে তুলল। দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা, কান পেতে শুনল কিছুক্ষণ। 'ওদিকে আরও লাশ আছে,' ফিসফিস করল চন্দ্রা। 'তবে দেখতে না যাওয়াই ভাল।'

'তবু দেখতে যেতে হবে,' বলল রানা। 'সাঈদ মারা গেছে কিনা জানা দরকার।'

'আমি তোমাকে কাভার দেব,' বলল চন্দ্রা।

ঝোপ-ঝাড় এড়িয়ে সরু পথের ওপর এসে দাঁড়াল রানা। ওকে দেখে শেয়ালগুলো ছুটে পালাল। এদিকে কোন পোস্ট খাড়া করা হয়নি, লাশগুলো ঝোলানো হয়েছে গাছের ডালে। মাত্র দুটো লাশ। এদের পরনে জেলেদের পরিচ্ছদ ধুতি ও ফতুয়া নয়, তার বদলে লম্বা এক প্রস্থ কালো সুতি কাপড়, তাতে সাদা রঙ দিয়ে মানুষের খুলি প্রিন্ট করা। মাথায় মুকুট আকৃতির টুপি রয়েছে, সামনের দিকে সুতো দিয়ে দাঁড়িপাল্লা বোনা।

চন্দ্রার কাছে ফিরতে দশ মিনিট দেরি হলো রানার। আড়াল থেকে চন্দ্রা দেখেছে, লাশগুলো নিয়ে কিছু একটা করেছে ও। কাছে আসতে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'সাঈদকেও তাহলে ঝুলিয়েছে?'

'না।' চন্দ্রার হাতে এক প্রস্থ কালো কাপড় ও একটা টুপি ধরিয়ে দিল রানা। 'সারা গায়ে এটা ভাল করে জড়িয়ে নাও। ট্রাউজারের পা খানিকটা গুটিয়ে নিলে ভাল হয়। মাথাও ঘোমটা দেয়ার মত করে ঢাকো।'

'এ মা!' ঘৃণায় কিংবা ভয়ে এক পা পিছিয়ে গেল চন্দ্রা। 'তুমি আমাকে মরা মানুষের গা থেকে খোলা কাপড় পরতে বলছ?'

'বলছি, কারণ আমি চাই না তুমিও মরা মানুষের দলে নাম লেখাও,' বলল রানা। 'শাহ বকশীর অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে হলে এরচেয়ে নিরাপদ ক্যামোফ্লেজ আর পাবে কোথায়?'

এরপর আর আপত্তি না করে কাপড়টা ভাল করে গায়ে-মাথায় জড়িয়ে নিল চন্দ্রা। রানাও আরেক প্রস্থ সাদা-কালো কাপড়ে নিজেকে মুড়ে নিয়েছে। সময় নষ্ট না করে আবার রওনা হয়ে গেল ওরা। ঢাল বেয়ে আরেকটা পাহাড়ে উঠছে, এটার চূড়াতেই শাহ বকশীর আস্তানা বা কেল্লা।

জঙ্গলের কিনারা থেকে বিশাল চত্বরটা জ্বলন্ত মশাল দিয়ে ঘেরা দেখল ওরা. আগুনের ওই বৃত্ত ডায়ামিটারে সিকি মাইলের বেশি

হবে তো কম নয়। বৃত্তের একধারে আকাশের গায়ে ভৌতিক রেখা তৈরি করে দাঁড়িয়ে আছে মাঝারি আকারের পাথুরে কেল্লা।

চত্বরের কোথায় কি ঘটছে ভাল করে দেখার জন্যে একটা বড় বোল্ডারের মাথায় চড়ল ওরা। পাথরটা আকারে প্রায় একটা দোতলা বাড়ির সমান, ছোট ছোট ধাপ কাটা আছে, মাথাটা সমতল। শুয়ে পড়ল দু'জনেই, নাইটগ্লাসটা চন্দ্রার কাছ থেকে নিয়ে চোখে তুলল রানা।

দু'ধরনের লোকজন ভিড় করেছে বিশাল শামিয়ানার নিচে। একদল বসেছে মঞ্চ থেকে যথেষ্ট দূরে, ধুতি ও ফতুয়া পরা সাধারণ জেলে বা চাষী। সংখ্যায় তারা হাজার তিনেকের কম হবে না। চত্বরের সামনের দিকটা দখল করেছে শয়তান উপাসক শাহ বকশীর বিশ্বস্ত শিষ্যরা। তাদের পরনে এক প্রস্থ কালো কাপড়, কালোর ওপর সাদা রঙের খুলি প্রিন্ট করা। মাথায় দাঁড়িপাল্লা বোনা লম্বাটে টুপি তো আছেই, প্রত্যেকের হাতে শোভা পাচ্ছে একটা করে নাঙ্গা তলোয়ার। সংখ্যায় এরা গ্রামবাসীদের সমান বা কিছু বেশি হবে। সবাই বসে নেই, বেশ কিছু শয়তান উপাসক চারদিকে ঘুরে পাহারা দিচ্ছে।

রানা লক্ষ করল, ইঁট বিছানো চওড়া একটা রাস্তা ধরে দু'একটা করে প্রাইভেট কার এসে মশাল দিয়ে তৈরি বৃত্তের বাইরে থামছে। প্রতিটি গাড়ি থেকে নামছে হুবহু একই চেহারার একজন করে কৌতুকাভিনেতা—অর্থাৎ, প্রত্যেকের পরনের কাপড়চোপড়ও এক রকম, মুখে আঁটা উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত রাবারের মুখোশগুলোও হুবহু তাই।

'ওরা কারা বলো তো?' রানার পাশ থেকে ফিসফিস করল চন্দ্রা। ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট হিসেবে উত্তরটা তারই ভাল জানার কথা—কে জানে, জেনেও হয়তো না জানার ভান করছে।

'ওরা রাশিয়ান হলে আমি একটুও আশ্চর্য হব না। শাহ বকশী চরস দ্বীপ দখল করার পর ভারতীয় সামরিক অফিসার ও

টেকনিশিয়ানদের মেরে ফেললেও, রাশিয়ানদের মারেনি; মিসাইল ব্যবহার করতে হলে ওদেরকে তার দরকার হবে।'

'তুমি বলতে চাইছ, আমাদের সামরিক বাহিনী যথেষ্ট যোগ্য ও দক্ষ নয়, তাই মিসাইল ব্যবহারের জন্যে বিদেশীদের সাহায্য নিতে হয়?' চন্দ্রার গলায় তীব্র ঝাঁঝ।

'আমার ধারণা, এই ঘাঁটিতে রাশিয়ার তৈরি ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল আছে বেশ কয়েকটা,' শান্ত গলায় জবাব দিচ্ছে রানা। 'ভারত ওগুলো রুশ সরকারের কাছ থেকে নয়, কিনেছে চোরদের কাছ থেকে। সেই চোরেরা মিসাইল এক্সপার্টও বটে। তাদের রাজনৈতিক আশ্রয় দরকার ছিল, ফলে মিসাইলগুলো কিভাবে অপারেট করতে হয় তা তারা ভারতীয়দের জানায়নি, বরং প্রস্তাব দিয়েছে মিসাইল অপারেটর হিসেবে তাদেরকে চরস দ্বীপে থাকতে দেয়া হোক। তোমাদের সামরিক কর্তাদের এই প্রস্তাব মেনে না নিয়ে উপায় ছিল না।'

'আমি যেখানে কিছুই জানি না,' চ্যালেঞ্জের সুরে বলল চন্দ্রা, 'তুমি সেখানে এত কথা জানলে কিভাবে?'

'এ স্রেফ কাণ্ডজ্ঞান বা কমনসেন্স,' বলল রানা, হাসছে। 'অবশ্য সংগ্রহ করা টুকরো-টাকরা নানা তথ্য সাজাতেও জানতে হয়।'

'তো, শ্রীমান সবজান্তা, দয়া করে বলবে কি যে লোকগুলো মুখোশ পরে আছে কেন?'

'আগেই বলেছি, ওরা চোর। চোরেদের সবচেয়ে বড় ভয়—পরিচয় যেন ফাঁস না হয়। তাই মুখোশ পরেছে।'

'এখানে এমন কে আছে যে পরিচয় ফাঁস হয়ে গেলে ওদের বিপদ হবে?' অবজ্ঞার সুরে প্রশ্ন করল চন্দ্রা।

'এখানে নেই, তবে আকাশে আছে,' বলল রানা। 'রুশ ও মার্কিন স্যাটেলাইটগুলোর ক্যামেরা এত শক্তিশালী, অন্ধকারেও প্রতিটি অবয়ব সমস্ত বৈশিষ্ট্য সহ ধরা পড়বে।'

ম্লান মুখে চুপ করে থাকল চন্দ্রা, রানার দিকে তাকাচ্ছে না।

প্রাচীন কেল্লার একটা অংশ অনেক আগেই ধসে পড়েছে। ওটার পাশেই তৈরি করা হয়েছে বেশ বড় একটা মঞ্চ। সাদা-কালো লেবাসধারী শয়তান উপাসকরা ঘোরাফেরা করছে ওটার ওপর ও চারপাশে, প্রত্যেকের হাতে খোলা তলোয়ার। শামিয়ানাটা বেশ উঁচু করে টাঙানো; কয়েক সারি ফোল্ডিং চেয়ার ফেলে বসার ব্যবস্থা, তবে সবার জন্যে নয়। মুখোশ পরা লোকগুলোই শুধু গাড়ি থেকে নেমে এসে বসছে ওই চেয়ারে, তাদের কারও হাতে তলোয়ার নেই। শাহ বকশীর বেশ কিছু শিষ্য চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, তাদের হাঁটাচলা আর হাবভাব দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না শুধু যে উপস্থিত গ্রামবাসীদের ওপর নজর রাখছে তা নয়, অনাহুত বা অবাঞ্ছিত কেউ আছে কিনা খুঁজছে।

ন'টা বাজতে চলেছে। একাধিক ফ্লাডলাইটের আলোয় শামিয়ানার ভেতরটা দিনের মত আলোকিত। ইতিমধ্যে তারার মেলা বসে গেছে আকাশে, কানা ভাঙা একটা নিষ্প্রভ চাঁদও উঠেছে দিগন্তরেখার কাছাকাছি। বাতাস প্রায় নেই বললেই চলে। কয়েকটা পোলে লাউডস্পীকার বাঁধার কাজ চলছে, তারগুলো টেনে মঞ্চে তোলার পর খাড়া করা মাইকের সঙ্গে সংযোগ দেয়া হচ্ছে।

মঞ্চের ওপর একটা নয়, তিনটে সিংহাসন দেখল রানা। শাহ বকশী ছাড়া আরও দু'জন বসবে ওখানে। রানার কোন ধারণা নেই কারা হতে পারে তারা। শাহ বকশীর তৃতীয় স্ত্রী নাদিরা বুলবুলি যেমন দশ লাখে একটা সুন্দরী, তেমনি তেজস্বিনী নারী হিসেবেও তার খ্যাতি এক সময় গোটা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। অক্সফোর্ডে লেখাপড়া; ঘোড়ায় চড়া, নৌকা বাওয়া, সাঁতার কাটা, তলোয়ার চালানো, দৌড়, লং জাম্প—এরকম বহু খেলা ওখানেই শেখে সে। তার জন্মভূমি ইস্পাহান, সমরকন্দ, নাকি ভারতের কোন রাজ্যে তা কেউ বলতে পারে না। এ-ও

জানা যায়নি যে শাহ বকশীর সঙ্গে কিভাবে পরিচয় বা কবে তাদের বিয়ে হয়েছিল। তা জানা না গেলেও বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনাটা মিডিয়াতে বেশ কাভারেজ পায়। অবশ্য আরও বেশি কাভারেজ পায় তাদের পুনর্বিবাহ। নাদিরা সম্পর্কে গোপন আরেকটা তথ্য রাহাত খান জানেন, সেই সূত্রে রানাও। তবে ও এখন ভাবছে, খালি দুটো সিংহাসনের একটায় শাহ বকশীর তৃতীয় বেগম নাদিরা বুলবুলি যদি বসে তাহলে আরেকটায় কে বসবে? জেনারেল গোরস্কি?

রানাকে ব্রিফ করার সময় এই জেনারেল সের্গেই গোরস্কি সম্পর্কেও কিছু তথ্য দিয়েছেন রাহাত খান। সোভিয়েত রাশিয়া যখন ভেঙে পড়ছিল, সের্গেই গোরস্কি তখন একটা কনভয় নিয়ে আফগানিস্তানে ছিল। চরম বিশৃংখলতার সুযোগ নিয়ে ওই কনভয় সহ অকস্মাৎ নিখোঁজ হয়ে যায় সে। ব্যাপারটা প্রমাণ করা যায়নি, তবে গুজব শোনা গেছে যে কনভয় ভর্তি সামরিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সে ভারতে পালিয়ে আসে। ওই অস্ত্রের মধ্যে নাকি রাশিয়ার তৈরি দশটা আইবিএম অর্থাৎ ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইলও ছিল, নিউক্লিয়ার ওঅরহেড সহ।

জেনারেল গোরস্কির ভারতে পালিয়ে এসে আত্মগোপন করা নিয়ে অনেকে অনেক ব্যাখ্যা দিয়েছে, তবে সবচেয়ে বেশি বিশ্বাসযোগ্যতা পায় তালেবানদের সঙ্গে পাকিস্তানের কানেকশন ও ক্যাপটেন সের্গেই বুকানিনের মৃত্যু। গোরস্কির একমাত্র সন্তান বুকানিন তালেবানদের সঙ্গে যুদ্ধে আফগানিস্তানে প্রাণ হারায়। ছেলের এই মৃত্যুর জন্যে জেনারেল গোরস্কি দায়ী করে পাকিস্তানকে। এর কারণ হিসেবে বলা হয়, তালেবান যোদ্ধাদের যে-সব পাকিস্তানী সামরিক অফিসার ট্রেনিং দিচ্ছিল তাদেরই একজনের হাতে খুন হয় বুকানিন। সবাই ধরে নেয়, ছেলের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে পাকিস্তানে পারমাণবিক বোমা ফেলার প্ল্যান করেছে জেনারেল গোরস্কি। কিন্তু আফগানিস্তান চষে

ফেলেও কোথাও তাকে পাওয়া যায়নি, এমনকি তার সঙ্গে পালিয়ে আসা সত্তরজন রুশ সামরিক অফিসার ও টেকনিশিয়ানেরও কোন হদিশ পাওয়া যায়নি।

সেই জেনারেল গোরস্কি সত্যি যদি চরস দ্বীপে তার দলবল নিয়ে আশ্রয় পেয়ে থাকে, এর চেয়ে বড় দুঃসংবাদ পাকিস্তানের জন্যে আর কিছু হতে পারে না। গোটা পরিস্থিতিটা রানার কাছে অত্যন্ত জটিল লাগছে। কারণ এখানে ও সাপ আর নেউলকে হাত মেলাতে দেখতে পাচ্ছে। রাহাত খান ওকে স্পষ্ট করেই জানিয়েছেন, নাদিরা বুলবুলিকে একসময় পাকিস্তানী ইন্টেলিজেন্স আইএসআই-এ যোগ দেয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল।

রাহাত খান আরেকটা কথা রানাকে জানিয়েছেন। তাঁর ধারণা, ভারত জেনারেল গোরস্কির কাছ থেকে শুধু যে দশটা আইবিএম কিনেছে, তা নয়; তার এবং তার সঙ্গে পালিয়ে আসা টেকনিশিয়ান ও সৈনিকদের সার্ভিসও কিনেছে। পরে শাহ বকশী যখন মিসাইল ঘাঁটিটা দখল করে নেয়, ভরতীয় সামরিক অফিসার ও টেকনিশিয়ানদের নির্মমভাবে খুন করে সে, কিন্তু জেনারেল গোরস্কি আর তার দলকে বাঁচিয়ে রাখে। সম্ভবত জেনারেল গোরস্কির সঙ্গে শাহ বকশীর একটা চুক্তি হয়েছে।

সেই চুক্তির বিষয়বস্তু যাই হোক, রানার ধারণা, তৃতীয় সিংহাসনটা তার জন্যেই রাখা হয়েছে মঞ্চে।

ইঁট বিছানো রাস্তা ধরে আরও দুটো প্রাইভেট কার এসে চত্বরের পাশে থামল। দুই গাড়ির প্যাসেঞ্জার সিট থেকে দু'জন নামল। পরস্পরকে আলিঙ্গন করল তারা। মুখে মুখোশ থাকলেও, তাদের মধ্যে একজনকে মেয়ে বলে সনাক্ত করল রানা। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে চত্বর ও মশালের দিকে পিছন ফিরল তারা, হাত ধরাধরি করে পায়চারি করছে; ধীরে ধীরে অন্ধকার ঝোপের দিকে সরে যাচ্ছে সবার অলক্ষে।

সাধারণ গ্রামবাসীরা চত্বরের বেশিরভাগ জায়গা দখল করে

রেখেছে। তাদের মধ্যে নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-যুবা সব ধরনের লোকজনই আছে। এদের আর্থিক অবস্থা যে সবার সমান নয় তা বেশভূষা দেখলেই পরিষ্কার বোঝা যায়। সস্তাদরের ধুতি আর ফতুয়া পরা জেলে, চাষী, খেত-মজুররাই সংখ্যায় বেশি। তবে ট্রাউজার ও শার্ট, এমনকি কোট-টাই পরা কিছু লোকও আছে। তাদের বসার ব্যবস্থাও আলাদা। সাধারণ গ্রামবাসীরা বসেছে চাটাইয়ের ওপর। ধোপদুরস্ত কাপড়চোপড় পরা লোকজন বসেছে চত্বরের মাঝামাঝি জায়গায়, তেরপলের ওপর। আরও একদল লোক বসেছে মঞ্চের একবারে সামনে, ডান দিক ঘেঁষে, বাঁশ দিয়ে ঘেরা একটা চৌকো জায়গার ভেতর। এদেরকে তলোয়ারধারী প্রহরীরা পাহারা দিয়ে রেখেছে, যেন পালাতে চেষ্টা করলে বাধা দেবে। তাদের সংখ্যা খুব বেশি নয়, বিশ-বাইশজন হবে।

মঞ্চের ডান দিকের ফাঁকা জায়গায় কয়েকজন লোক মাঝখানে দশ গজ ফাঁক রেখে দুটো পোস্ট খাড়া করল, মাটির যথেষ্ট গভীরে পোঁতা হয়েছে। কয়েকজন লোক কাঁধে করে বয়ে নিয়ে এলো কুচকুচে কালো হুবহু একই আকৃতির দুই শয়তানকে—পাথরের তৈরি নগ্ন দানব, বেঢপ ও কিম্ভূতকিমাকার অবয়ব—মুখ, কান, চোখ ও নাক থেকে ধোঁয়া ও আগুন বেরুচ্ছে। সদ্য পোঁতা একটা পোস্টের দু'পাশে খাড়া করা হলো মূর্তি দুটোকে। দ্বিতীয় পোস্টটা খালিই থাকল।

'তুমি এই জায়গা ছেড়ে নড়বে না,' চন্দ্রাকে বলল রানা। 'আমি একজোড়া মুখোশ নিয়ে আসি।'

'মুখোশ...পাবে কোথায়?' চন্দ্রা বিস্মিত।

'তুমিও জানো কোথায় পাব,' বলল রানা। 'রাশিয়ানরা দেবে।'

'আমি জানি!' চন্দ্রা যেন আকাশ থেকে পড়তে চায়। 'মানে?'

'যদি বলো ওদের দুই প্রেমিক-প্রেমিকাকে তুমি দেখতে পাওনি,' মৃদু হেসে বলল রানা, 'তাহলে স্পাই হিসেবে তোমার

পর্যবেক্ষণ শক্তিকে খাটো করে দেখতেই হয়। ওদের প্রেমে ব্যাঘাত ঘটিয়ে মুখোশ দুটো নিয়ে আসব। সাবধান, আমি না ফেরা পর্যন্ত এই জায়গা ছেড়ে নোড়ো না।'

'ঠিক আছে,' বলল চন্দ্রা। 'দুর্গতিনাশিনী মা ভগবতী তোমার সহায় হোন।'

ধাপ বেয়ে বোল্ডারের মাথা থেকে নামার সময় নিঃশ্বাসের সঙ্গে বিড়বিড় করে কিছু একটা উচ্চারণ করল রানা, পিছন থেকে ভেসে এলো চন্দ্রার মিষ্টি গলার চাপা হাসি।

মশাল দিয়ে ঘেরা বৃত্তটার বাইরে, ঝোপ আর গাছপালার ভেতর থাকল রানা; ঘুর-পথে পার্ক করা গাড়িগুলোর দিকে এগোচ্ছে। ও একা নয়, বৃত্তের বাইরে ওর মতই ঢোলা কাপড় পরা কিছু লোক হাঁটাহাঁটি করছে, প্রত্যেকের হাতে খোলা তলোয়ার।

খুলি প্রিন্ট করা প্রতিটি কালো বসনের সঙ্গে দুটো করে লাল কর্ড আছে। একটা কোমরে জড়ানো, এটাই দীর্ঘ কাপড়টাকে শরীরে আটকে রেখেছে; আরেকটা চিবুক ও মাথায় পরানো, মুখের দু'পাশে ঘোমটা দেয়ার আদলে কাপড়টাকে আটকেছে। সবার দেখাদেখি রানাও এই ভঙ্গিতে পরেছে কাপড়টা, ফলে ওর চেহারা প্রায় পুরোটাই ঢাকা। তবে ওর হাতে তলোয়ার নেই। অর্থাৎ ওকে শাহ বকশীর শিষ্য বলে মনে করা হবে না।

ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর ঢুকে যে দু'জনকে পাশাপাশি বসে বিভোর হয়ে গল্প করতে দেখল রানা, তাদের কাছেও তলোয়ার নেই। সাধারণ সিভিল ড্রেস পরনে। রাবারের একজোড়া মুখোশ ঘাসের ওপর নামিয়ে রাখা হয়েছে। রানা লক্ষ করল, শ্বেতাঙ্গ হলেও, দীর্ঘদিন উপমহাদেশের কড়া রোদ লাগায় ওদের ত্বক হয়ে উঠেছে তামাটে।

রানা শুনতে পেল প্রেমিক রুশ ভাষায় কথা বলছে। ইংরেজিতে অনুবাদ করলে তার কথা শুনতে হবে এরকম, 'ওলগা,

মাই ডার্লিং, গিভ মি আ প্যাসেজ, সো আই ক্যান ট্র্যাভেল ইন স্পেস অ্যান্ড হেভেন!'

উত্তরে মেয়েটা বলছে, 'মিখায়েল, মাই লাভ, গিভ মি আ সান, সো আই ক্যান ক্লেইম ইউ অ্যাজ মাই হাজবেন্ড।'

'ওউন্ট ইউ কাম টু মাই রূম টু-নাইট, ডার্লিং?'

'আ'ল ট্রাই মাই বেস্ট, মাই লাভ। কীপ দ্য ডোর...'

শুধু মুখোশ দুটো চুরি করতে পারলে হতো, কিন্তু চুরি যাওয়া মুখোশের জন্যে ওরা হৈ-চৈ বাধাতে পারে, তাই উল্টো করে ধরা পিস্তলের বাঁট দিয়ে দু'জনের খুলিতে মাপমত দুটো টোকা দিতে হলো, যাতে অন্তত ঘণ্টা দুয়েক জ্ঞান ফিরে না পায়।

শয়তান উপাসকদের সাদা-কালো পোশাক খুলে মিখাইলের শার্ট, ট্রাউজার, জ্যাকেট ও জুতো জোড়া দ্রুত পরে নিল রানা; জ্যাকেটের ভেতর লুকিয়ে রাখল ওলগার কাপড়চোপড়, চন্দ্রাকে পরতে দেবে।

ঝোপগুলো পিছনে ফেলে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে আসছে, মুখোশের ভেতর থেকে দেখল আরও একটা দামী গাড়ি এসে থামল পার্কিং এরিয়ায়। রানা বিস্মিত, কারণ এটা একটা রোলসরয়েস, এবং এটাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে এলো দুটো ভ্যান। তবে কি ভাগ্যগুণে নাটের গুরু শাহ বকশী স্বয়ং ডালে বসা বোকা পাখির মত সহজ টার্গেট হিসেবে নিজেকে তুলে দিতে যাচ্ছে রানার হাতে? পিস্তলটা বাগিয়ে ধরল ও, শাহ বকশীর কপাল ফুটো করার সুযোগ পেলে ছাড়বে না। তবে মনে যে একেবারে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই, তা নয়। পাঁচ-সাত হাজার লোকের সামনে শাহ বকশীকে খুন করা যদি সহজ একটা কাজ হয়ও, খুন করার পর নিজেকে রক্ষা করা অসম্ভব কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

শাহ বকশী নাটের গুরু হলেও, রানা ভাবল, চরস দ্বীপে সে-ই একমাত্র ক্ষমতার উৎস নয়; অন্তত আরও দু'জন শাহ বকশীর ক্ষমতায় ভাগ বসিয়েছে। অর্থাৎ শাহ বকশীকে খতম করলেই যে

শয়তান উপাসকরা নেতৃত্বশূন্য হয়ে পড়বে, এমন মনে করার কোন কারণ নেই। শাহ বকশীর মত বাকি দু'জনকেও নিউট্রালাইজ করা সমান জরুরী। তারপরেও কথা আছে। মেজর জেনারেল রাহাত খান আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, চরস মিসাইল ঘাঁটির অন্তত একটা ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল সম্ভবত ঢাকার দিকে তাক করে বসানো হয়েছে, নিউক্লিয়ার ওঅরহেডসহ। ভারত সরকার স্বীকার করুক বা না করুক, আশঙ্কাটা সত্যি হবারই বেশি সম্ভাবনা–কারণ এই হুমকি দিয়েই সার্ক-সদস্য দেশগুলোকে টাকা দেয়ার ব্যাপারে বাধ্য করতে চেয়েছে শাহ বকশী। এটাই স্বাভাবিক–দাবি আদায় করার স্ট্র্যাটেজি। শুধু ঢাকার দিকে তাক করা হয়নি, কমপিউটরের মাধ্যমে লকও করে দেয়া হয়েছে–অন্তত রানা ও বিসিআই চীফের তাই ধারণা। ওই মিসাইল চরস দ্বীপ থেকে তো বটেই, এমনকি পাকিস্তান বা ভারতের যে-কোন শহর থেকেও রেডিও সিগন্যালের সাহায্যে নিক্ষেপ করা যাবে।

অর্থাৎ শাহ বকশীকে খুন করতে পারলে রানার কাজ মাত্র শুরু হবে। সে কাজটা হলো, মাতৃভূমিকে সম্ভাব্য বিপর্যয় থেকে রক্ষা করা।

পাঁচ

পালিশ করা রুপোর মত ঝকঝকে রোলসরয়েসের সঙ্গে এলো হুড খোলা দুটো প্রকাণ্ড ভ্যান, তাতে একে/ফরটিসেভেন বাগিয়ে ধরে

দাঁড়িয়ে আছে সত্তর থেকে আশিজন তরুণ দেহরক্ষী; পরনে ভারতীয় আর্মির খাকি ইউনিফর্ম। ইউনিফর্মের বিভিন্ন পকেট ও বেল্ট স্মল আর্মস, গ্রেনেড আর অ্যামিউনিশনে ঠাসা। লীডারের নির্দেশে লাফ দিয়ে নিচে নামল সবাই, শৃঙ্খলা বজায় রেখে একটা দল চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল রোলসরয়েসকে, বাকি সবাই মঞ্চের চারদিকে সতর্ক অবস্থান নিল। চেহারাই বলে দিচ্ছে, লোকগুলো ইরানী; হাবভাবে উগ্র ধর্মীয় উন্মাদনার অশুভ ছাপ, চোখে-মুখে খুনের নেশা। সন্দেহ নেই, শাহ বকশীর অন্ধ ভক্ত এরা। তবে ভারতীয় আর্মির ইউনিফর্ম পরে থাকার রহস্যটা ঠিক বোঝা গেল না।

শামিয়ানার ভেতর একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। রোলসরয়েস থেকে কে বেরুবে জানার জন্যে সবাই ভারি উৎসুক। শাহ বকশীর শিষ্যরা তলোয়ার উঁচিয়ে ছুটোছুটি করছে উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্যে। এরই সুযোগ নিয়ে বোল্ডার অর্থাৎ চন্দ্রার কাছে ফিরে এলো রানা, ঘাড় ফিরিয়ে বারবার দেখছে রোলসরয়েসের খোলা দরজা দিয়ে কেউ বেরুচ্ছে কিনা।

হাতে পেয়েই দ্রুত ওলগার কাপড়চোপড় ও মুখোশটা পরে নিল চন্দ্রা। রানার মুখে শুনে দুই প্রেমিক-প্রেমিকার নাম মনে গেঁথে রাখল সে।

বিশৃঙ্খলা ও হৈ-হট্টগোল থামছে না বলেই রোলসরয়েস থেকে আরোহী বা আরোহীরা নামতে দেরি করছে। প্রথম গুরুত্ব অবশ্যই নিরাপত্তা। ইরানী দেহরক্ষীরাও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার কাজে শাহ বকশীর শিষ্যদের সাহায্য করছে। মুখোশ পরা লোকজনকেও দূরে সরিয়ে দিচ্ছে তারা। ইতিমধ্যে রানার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে, জেনারেল সের্গেই গোরস্কির সঙ্গী সামরিক অফিসার ও টেকনিশিয়ানরাই শুধু মুখোশ পরেছে।

এক সময় পরিস্থিতি শান্ত হলো। রোলসরয়েস থেকে

আরোহীরা নামল, তবে বোঝা গেল না কে বা কারা তারা। দেহরক্ষীরা নিশ্ছিদ্র একটা পাঁচিল তৈরি করল, সেই সচল পাঁচিলের আড়াল নিয়ে মঞ্চে গিয়ে উঠল সে বা তারা।

সিংহাসনগুলোর পিছনে সতর্ক পাহারায় দাঁড়াল ইরানীরা। এতক্ষণে দেখা গেল সিংহাসন তিনটে এখন আর খালি নয়।

শাহ বকশীকে দেখামাত্র চেনা গেল। মাঝখানের সিংহাসনে বসেছে সে–শিরদাঁড়া খাড়া, সোনা ও রুপোর কাজ করা একটা ছড়ির মাথায় ডান হাত, বাম হাতে কুৎসিত-কদাকার পাথরের মূর্তি–পোস্টের সঙ্গে খাড়া করা শয়তানের হুবহু খুদে সংস্করণ। শাহ বকশীর বয়স আন্দাজ করা কঠিন, কারণ চুল-দাড়ি-গোঁফ সব পেকে সাদা হয়ে গেলেও, তার মধ্যে বার্ধক্যের অন্য কোন ছাপ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। চেহারায় দরবেশসুলভ নূরানি একটা ভাব থাকলেও, সেটা যেন খানিকটা বানোয়াট বা কৃত্রিম বলে মনে হলো রানার। বাম হাতের শয়তানকে মাঝে মধ্যে পরম শ্রদ্ধাভরে চুমো খাচ্ছে সে। মাথায় ঝুঁটিসহ একটা টুপি, টোপর বা মুকুট আকৃতির, কপালের দিকে সুতো দিয়ে একটা দাঁড়িপাল্লা বোনা হয়েছে।

শাহ বকশীর তৃতীয় পক্ষ নাদিরা বুলবুলি বসেছে ডান পাশের সিংহাসনে। বিসিআই কমপিউটর রানাকে জানিয়েছে, মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়স তার। সে-ও আজ কালো ড্রেস পরেছে, তবে তাতে মানুষের খুলি নয়, লাল গোলাপ প্রিন্ট করা–আঁটসাঁট কামিজ ও সালোয়ার, দুটোতেই। ওড়না একটা আছে বটে, তবে সেটা উন্নত স্তনযুগল না ঢেকে সাপের মত সরু হয়ে গলায় পেঁচিয়ে আছে। গায়ের রঙ দুধে আলতা, ঠোঁট জোড়া কমলার কোয়া, তারপরও ঠোঁট ও মুখে প্রচুর রুজ ও লিপস্টিক ব্যবহার করা হয়েছে। কোলের ওপর পড়ে আছে লালচে রঙের বড় আকারের লেদার ব্যাগ, সেটার মুখ বারবার খুলছে আর বন্ধ করছে সে। রানার সন্দেহ হলো, যে-কোন কারণেই হোক নাদিরা

বুলবুলি খুব উত্তেজিত বা নার্ভাস হয়ে আছে।

মঞ্চে, নাদিরার সিংহাসনের ঠিক পিছনে, প্রাচীন আমলের হাবশি ক্রীতদাসের মত কুচকুচে কালো এক কাফ্রী দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা হালকা ঘিয়ে রঙের সুট পরেছে। হাবভাব দেখে মনে হলো নাদিরার বডিগার্ড। শাহ্ বকশীর বাম দিকে বসেছে বহু কৌতুকাভিনেতার একজন, অর্থাৎ হাসিতে উদ্ভাসিত রাবারের সেই মুখোশ পরা এক লোক। লোকটার পায়ে ভারতীয় সামরিক বুট, গায়ে ভারতীয় সামরিক ইউনিফর্ম, বুকে সাঁটা ও লটকানো পদক ও মেডেলগুলোও রাশিয়ান নয়, ভারতীয়। চোর হলেও, ভারতীয় সেনাবাহিনী উপকারের বিনিময়ে জেনারেল সের্গেই গোরস্কিকে উদারহস্তে পদক ও মেডেল একেবারে ঢেলে দিয়েছে।

একটু পরেই সভার কাজ শুরু হলো। অনুষ্ঠান উপস্থাপনের দায়িত্বে থাকল নাদিরা বুলবুলি। ঢলঢল রূপ-যৌবন থাকায় উপস্থিত দর্শকদের মনোযোগ কাড়তে তাকে কোন বেগ পেতে হলো না। শামিয়ানার নিচে সামান্য যে বিশৃঙ্খলা ছিল, মাইকের সামনে নাদিরাকে দাঁড়াতে দেখে তাও আর থাকল না। এমনকি, শাহ্ বকশীর নামে শিষ্যদের মুহুর্মুহু জয়ধ্বনিও হঠাৎ করে থেমে গেল।

নাদিরা হিন্দী ও ইংরেজিতে ঘোষণা করল, 'মহান শয়তান কর্তৃক প্রেরিত পুরুষ, মানবজাতির মহান ত্রাণকর্তা, অগ্নিউপাসক জরথুস্ত্র-এর অনুসারীদের বিশেষ বন্ধু, নতুন এক বৈপ্লবিক ধর্ম দাঁড়িপাল্লার প্রবর্তক মহামান্য শাহ্ আল কাদরি আল বকশী এখন আপনাদের উদ্দেশে তাঁর মূল্যবান বক্তব্য পেশ করবেন। ভাষণ শেষ হবার পরপরই শিষ্যত্ব গ্রহণে ইচ্ছুক ভক্তবৃন্দকে দীক্ষা দেবেন তিনি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, শয়তান উপাসক হিসেবে যারা দীক্ষা নেবেন তাদের জন্যে উপহার ও পুরস্কার হিসেবে রয়েছে সাদা-কালো পরিচ্ছদ, দাঁড়িপাল্লা মার্কা টুপি, সুদৃশ্য তলোয়ার এবং নগদ পাঁচ হাজার টাকা।

'দীক্ষা দান শেষ হলে শুরু হবে বলিদান অনুষ্ঠান। আগুন যেহেতু শয়তানের প্রতীক, তাই আজ এক জ্যান্ত মানুষের গায়ে আগুন দেয়া হবে। এভাবে বলি দিলে মহান শয়তান অবশ্যই আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। এবার একটি বিশেষ ঘোষণা।'

নাটকীয় বিরতি নিচ্ছে নাদিরা। ধীরে ধীরে বিদ্রূপাত্মক হাসির রেখা ফুটল রাঙা ঠোঁটে, সেই হাসি ছড়িয়ে পড়ল সারা মুখে। তার ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে কালো ভূত সেই কাফ্রীটা, নাদিরার কানে ফিসফিস করে কি যেন বলল একবার।

তারপর আবার শুরু করল নাদিরা, 'আপনাদের জন্যে একটি চমকপ্রদ খবর আছে। তথ্য ও প্রমাণ হাতে পেয়েই বলছি, চরস দ্বীপে বিদেশী গুপ্তচরের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। না-না, আপনাদের আতঙ্কিত হবার কিছু নেই। শুধু সাবধান থাকুন, কড়া নজর রাখুন চারপাশে। তাদেরকে চিনতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উর্দি পরা শয়তান উপাসকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। খবরদার, এই বিদেশী গুপ্তচরদের বিরুদ্ধে নিজেরা কিছু করতে যাবেন না। ওরা অত্যন্ত বিপজ্জনক, সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক আছে, বিপদ দেখলে খুন করতে ইতস্তত করবে না।'

শামিয়ানার নিচে হাজার হাজার মানুষ তীব্র উত্তেজনায় প্রায় একযোগে শিরদাঁড়া খাড়া করল, আশপাশে অচেনা কেউ থাকলে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে, সবাই একসঙ্গে কথা বলায় কে কি বলছে বোঝা যাচ্ছে না।

'তোমার মুখের চেয়ে মুখোশটা আকারে বড় কেন?' চন্দ্রার বাম পাশের চেয়ারে বসা একজন লোক রুশ ভাষায় প্রশ্ন করল, কথার সুরে কৌতুকই বেশি, সন্দেহের বা অভিযোগের ভাবটুকু অস্পষ্ট।

মনে মনে প্রমাদ গুণল রানা, চন্দ্রার ডান পাশের চেয়ারে বসে আছে। চন্দ্রা কি উত্তর দেবে তা নিয়ে ও ভাবছে না, ভাবছে আদৌ উত্তর দিতে পারবে কি না। সে কি রুশ ভাষা জানে?

চন্দ্রা কথা বলছে না, তাকিয়ে আছে অন্যদিকে, যেন লোকটার কথা শুনতে পায়নি। লোকটা কিন্তু জবাব পাবার আশায় একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে চন্দ্রার দিকে, দেখাদেখি আশপাশের তিন-চারজন লোকও তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ করছে চন্দ্রাকে।

মুখোশের ভেতর রানার মুখ ঘামছে। ও কল্পনাও করেনি এত তাড়াতাড়ি এরকম কঠিন একটা পরীক্ষায় পড়তে হবে।

'কিছু মনে কোরো না, তোমাকে একটা সৎ পরামর্শ দিই,' আবার বলল লোকটা। 'পারলে এখুনি মুখোশটা বদলে ফেলো, তা না হলে লোকজন তোমাকে বিদেশী গুপ্তচর বলে সন্দেহ করবে।'

রানাকে একাধারে অবাক ও খুশি করে স্পষ্ট ও বিশুদ্ধ রুশ ভাষায় চন্দ্রা জবাব দিল, 'প্লীজ, একটু চেষ্টা করে দেখো না, ভাই, এরচেয়ে ছোট কোন মুখোশ পাও কিনা।'

চন্দ্রাকে রুশ ভাষায় জবাব দিতে শুনেও লোকটা সন্দেহমুক্ত হয়েছে বলে মনে হলো না, চোরা চোখে বারবার তার দিকে তাকাচ্ছে। চন্দ্রার দিকে আর যারা তাকিয়ে ছিল তাদের মধ্যে থেকে একজন হেসে উঠে বলল, 'সব মুখোশই এক সাইজের, অনেকেই দেখছি তা জানে না!'

বিরতির পর আবার শুরু করল নাদিরা। 'এবার বিদেশী গুপ্তচরদের উদ্দেশ্যে দু'একটা কথা বলতে চাই। ভারত সরকার যতই গোপনীয়তা রক্ষার চেষ্টা করুক না কেন, তাদের প্ল্যান ও তৎপরতা সম্পর্কে সমস্ত খবরই আমরা আগেভাগে পেয়ে যাই। আরও পরিষ্কার করে বলি—গুলশানে, মিস্টার রাহাত খানের বাড়িতে, আমাদের নিজস্ব একজোড়া কান ছিল, ফলে তিন ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস বিসিআই, আইএসএস আর আইএসআই যে হাতে হাত মিলিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশনে নেমেছে, এ আমরা প্রথম থেকেই জানি।

'আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘ করব না। পাকিস্তানী এজেন্ট সাঈদ

শাকির আমাদের হাতে ধরা পড়েছে। মাসুদ রানা, আগে হোক বা পরে, তুমিও ধরা পড়বে। তবে তোমার ব্যাপারে আমরা খানিকটা নরম মনোভাব পোষণ করতে চাই। এর কারণ, এসপিওনাজ জগতের উজ্জ্বল একটা নক্ষত্র তুমি, দুর্লভ এক প্রতিভা, তাই আমরা কেউ চাই না ভুল বোঝাবুঝির কারণে তুমি অকালে প্রাণ হারাও।

'তো, রানা, আমরা জানি এই সমাবেশে ছদ্মবেশ নিয়ে উপস্থিত হয়েছ তুমি। তোমার সঙ্গে ভারতীয় এজেন্ট চন্দ্রা দেবযানিও আছে। তার থাকা না থাকাটা আমাদের কাছে কোন গুরুত্ব বহন করে না। তবে তোমার প্রতি আমাদের আহ্বান, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অস্ত্র ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করো। কথা দিচ্ছি, তোমার কোন ক্ষতি করা হবে না। সত্যি কথা বলতে কি, তোমার বিবেচনার জন্যে কয়েকটা লোভনীয় প্রস্তাবও রয়েছে আমাদের কাছে।

'তবে সেই সঙ্গে তোমাকে সাবধান করে দেয়ারও প্রয়োজন বোধ করছি। আমরা জানি তুমি অত্যন্ত বিপজ্জনক চরিত্র, লোকে বলে তোমার জন্যে অসম্ভব বলে কোন কাজ নেই—তাই, আমরা কোন রকম ঝুঁকি নিতে পারি না তুমি যদি স্বেচ্ছায় ধরা না দাও, আমাদের লোকেরা তোমার খোঁজে চারদিকে তল্লাশী চালাবে। তোমার ধরা পড়াটা তখন হবে স্রেফ সময়ের ব্যাপার মাত্র আর যদি পালাতে চেষ্টা করো বা বাধা দাও, কয়েক হাজার শয়তান উপাসক তোমাকে ধাওয়া করবে। তুমি বুদ্ধিমান, আশা করি নিজের বিপদটা বুঝতে পারছ। এ-প্রসঙ্গে আর কিছু বলা বাহুল্য মনে করছি

'উপস্থিত সুধীবৃন্দ, মহান শয়তানের প্রিয় বন্ধু শাঁহ আল কাদরি আল বকশীর নামে আপনারা জয়ধ্বনি করুন—এখন তিনি আপনাদের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন।'

রানা লক্ষ করল, নাদিরার কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্দেশ

না পেলেও অতি উৎসাহী কয়েকজন শয়তান উপাসক এরই মধ্যে তল্লাশী চালাতে শুরু করেছে।

মাউথপীস সহ মাইক্রোফোনটা রাখা হয়েছে বুলেটপ্রুফ কাঁচের ছোট্ট ঘরে, আসন ত্যাগ করে তার ভেতর ঢুকল শাহ বকশী। কাঁচের ভেতর দর্শকরা শুধু তার মাথা আর বুকের অংশ বিশেষ দেখতে পাচ্ছে। তাদের ওপর কড়া নজর রাখছে শাহ বকশীর ইরানী দেহরক্ষীরা।

ধবধবে সাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে ভাষণ শুরু করল শাহ বকশী। চন্দ্রাকে নিয়ে মঞ্চের ঠিক সামনেই বসেছে রানা, ফলে এখন কাছ থেকে দেখে উপলব্ধি করল, শাহ বকশীর হাবভাব, অঙ্গভঙ্গি ও চেহারা-সুরতে যথেষ্ট আভিজাত্য আছে। সে যে দাবিটা করে বলে শোনা যায়–তার পূর্ব-পুরুষদের দু'হাজার বছরের লিখিত ইতিহাস আছে, এবং সে-ই প্রথম বা একমাত্র প্রেরিত পুরুষ নয়–এটা পুরোপুরি মিথ্যে নাও হতে পারে। আরব জাহান ও মধ্যপ্রাচ্যে প্রায় প্রতি শতাব্দীতেই নিজেকে প্রেরিত পুরুষ বা পয়গম্বর বলে দাবি করেছে এমন লোকের সংখ্যা গুনে শেষ করা যাবে না।

'ভাই ও বোনেরা,' শাহ বকশী শুরু করল, তার ভরাট ও ভারি কণ্ঠস্বর কেল্লার চত্বর ছাড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত গমগম করে উঠল, 'আপনারা সবাই আমার শয়তানী শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। প্রথমেই বলে নিই, আজ আমার দিলে বড় একটা চোট লেগেছে, নিদারুণ হতাশায় আমি খুব কষ্ট পাচ্ছি। যদি জিজ্ঞেস করেন, কেন? তাহলে দুঃখের কথাটা খুলেই বলতে হয়। চরস দ্বীপে প্রায় বিশ হাজার পারসীর বসবাস, অথচ দীক্ষাদান ও নরবলির এই অনুষ্ঠান দেখার জন্যে আপনারা উপস্থিত হয়েছেন মাত্র সাত ভাগের এক ভাগ মানুষ। শুধু তাই নয়, আজ দীক্ষা নিয়ে আমার দাঁড়িপাল্লা ধর্ম যারা গ্রহণ করতে চেয়েছেন, তাঁদের সংখ্যা মাত্র তেইশজন।

'প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমাকে বলা হয়েছে, আজকের পবিত্র অনুষ্ঠানে লোক সমাগম কম হবার কারণ, এখানে আসার পথে ঝুলিয়ে রাখা লাশ দেখে তারা ভয় পেয়েছে। লাশ দেখে মানুষ ভয় পাবে, এ তো খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এ-ও ভেবে দেখতে হবে–ওগুলো কাদের লাশ, কি অপরাধে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে, হত্যা করার পর ওভাবে ঝুলিয়েই বা রাখা হলো কেন।

'আপনারা জানেন, মিসাইল ঘাঁটিসহ চরস দ্বীপ আমরা দখল করে নিয়েছি। ভারত সরকারকে সাতদিন সময় দেয়া হয়েছে, তারা আমাদের দাবি মেনে নিলে আমরা অগ্নিউপাসকরা ভারতের বুকে স্বাধীন-সার্বভৌম একটা রাষ্ট্রের মালিক হব। আমাদের সেই স্বাধীন রাষ্ট্রের সীমানা হবে–উত্তরে উদয়পুর, দক্ষিণে রাজকোট, পুবে ভূপাল ও পশ্চিমে পাকিস্তান সীমান্ত। সারা ভারতে পারসীদের সংখ্যা যাই হোক, নতুন রাষ্ট্রের লোকসংখ্যা আন্দাজ করা হয়েছে বিশ লাখ। সার্কভুক্ত সাতটা দেশকে বলা হয়েছে, তারা যেন এই নতুন রাষ্ট্রকে সাত হাজার কোটি রুপি অর্থ-সাহায্য দেয়–দান বা চাঁদা হিসেবে। ভেবে দেখুন, বিশ লাখ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে সাত হাজার কোটি রুপি কি বিরাট অবদান রাখবে। আপনাদেরকে আর হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে রোজগার করতে হবে না। আমাদের নতুন রাষ্ট্রে সবাই হবে সচ্ছল ও সুখী। আপনাদের ছেলেমেয়েরা ভাল স্কুলে পড়বে। পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে তাকে দেয়া হবে বিনা খরচে অত্যাধুনিক চিকিৎসা। আমি আপনাদেরকে কথা দিচ্ছি, সম্ভাব্য সব রকম সুযোগ-সুবিধেই পাবেন আপনারা। এবার আমাকে নিজেদের সিদ্ধান্ত জানান–আপনারা অগ্নি তথা শয়তান উপাসকদের জন্যে আলাদা একটা স্বাধীন রাষ্ট্র চান কিনা। যদি চান, তাহলে মাথার ওপর হাত তুলুন।'

সরল গ্রামবাসীদের প্রথম দিকে ইতস্তত করতে দেখা গেল। তবে শাহ বকশীর স্থানীয় শিষ্যরা সবাই মাথার ওপর দু'হাত তুলে ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করেছে। টহলরত আরেক দল শিষ্য

খোলা তলোয়ার উঁচিয়ে হুমকি-ধামকি দেয়ায় গ্রামবাসীরাও এবার মাথার ওপর হাত তুলল।

'ধন্যবাদ,' আবার শুরু করল শাহ্ বকশী। 'এবার প্রথমেই আমি সতর্ক করে দিয়ে বলতে চাই যে এই মিসাইল ঘাঁটি যত সহজে দখল করা সম্ভব হয়েছে তত সহজে দখলদারিত্ব টিকিয়ে রাখা যাবে না। ভারতীয় সামরিক বাহিনী সম্ভাব্য সবরকম উপায়ে এই দ্বীপ পুনর্দখলের চেষ্টা করছে। তবে প্রকাশ্যে যত যাই করুক, আমরা এমনভাবে প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছি যে তারা সহজে আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তবে চুপিসারে, অর্থাৎ গোপনে যদি কিছু করে, সেটা ঠেকানো সত্যি খুব কঠিন। গোপনে তারা কি করতে পারে? এই দ্বীপে, আমাদের মধ্যে, অনেক লোভী ও বেঈমান মানুষ আছে, ভারতীয়রা তাদের সাহায্য নিয়ে আমাদের সমস্ত তথ্য জানার চেষ্টা করতে পারে, এমনকি তাদেরকে দিয়ে মিসাইল ঘাঁটিতে স্যাবটাজও চালাতে পারে। আপনারা শুনে বিস্মিত হবেন, অন্তত বারো থেকে পনেরোজন চরসবাসী মেইনল্যান্ডে পালাবার সময় ধরা পড়েছে, এবং জেরার মুখে স্বীকার করেছে গোপন তথ্য পাচার করে মোটা পুরস্কার পাওয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। সংক্ষিপ্ত আদালতে তাদের বিচারের আয়োজন করা হয়েছিল। জুরিরা সবাই একমত হয়ে মৃত্যুদণ্ডের সুপারিশ করে, আমি সেই দণ্ড অনুমোদন করি। এবার বলুন, অগ্নি তথা শয়তান উপাসকদের নিজস্ব স্বাধীন আবাসভূমির বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্র করেছে, তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়াটা কি আমার অন্যায় হয়েছে?'

শিষ্য ও ভক্তরা একযোগে গর্জে উঠল: 'না! না! না!'

মিনমিনে সুরে গ্রামবাসীরাও তাতে সুর মেলাল, যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও।

খানিকটা স্বস্তির সঙ্গে রানা ও চন্দ্রা লক্ষ করছে অতি উৎসাহী শয়তান উপাসকরা ফোল্ডিং চেয়ারে বসা, মুখোশ পরা

রাশিয়ানদের দিকে তল্লাশী চালাতে আসছে না। দু'দলে ভাগ হয়ে গেছে তারা, একদল গ্রামবাসীদের ওপর কড়া নজর বুলাচ্ছে, আরেক দল শামিয়ানার বাইরে টহল জোরদার করতে ব্যস্ত।

'এবার প্রথম শর্ত। ছেলে-মেয়ে, তরুণ-তরুণী, বুড়ো-বুড়ি—চরস দ্বীপের প্রতিটি মানুষ, যারা নিজেদের জন্য স্বাধীন আবাসভূমি চান, তাদের প্রত্যেককে অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করতে হবে। মনে রাখবেন, শত্রু আপনার আশপাশেই রয়েছে। একটু সতর্ক হলেই আপনি তাকে হাতে-নাতে ধরতে পারবেন। প্রশ্ন হলো, শত্রু কারা? যে-লোক দ্বীপ থেকে পালিয়ে মেইনল্যান্ডে চলে যেতে চাইছে, যে-লোক মোবাইল বা লুকানো ওয়্যারলেসের সাহায্যে দ্বীপের বাইরে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করছে, যে-লোক আমাদের তৎপরতা ও প্রস্তুতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছে, যে-লোক ক্ষতিকর গুজব ছড়াচ্ছে, অবৈধ অস্ত্র বা বিস্ফোরক বহন করছে, সেই আমাদের পরম শত্রু। এদেরকে দেখামাত্র সাদা-কালো ড্রেস ও দাঁড়িপাল্লা মার্কা টুপি পরা শয়তান উপাসকদের হাতে ধরিয়ে দিন। ভাল কথা, বিনিময়ে মোটা টাকার পুরস্কার চেয়ে নিতে ভুলবেন না।

'এবার আমি আমার মূল বক্তব্য শুরু করতে যাচ্ছি। ছোট্ট একটা ভূমিকা করতেই হয়, তা না হলে দ্বিতীয় শর্তটা পূরণ করতে আপনারা অনুপ্রাণিত হবেন না।

'প্রথম কথা, মহান শয়তানের অস্তিত্ব সম্পর্কে কারও মনে কোন সংশয় বা অবিশ্বাস থাকা উচিত নয়। পৃথিবীর সমস্ত ধর্মগ্রন্থে শয়তানের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। শয়তান যে মহাশক্তিশালী, তাঁর ক্ষমতা যে ঈশ্বরের চেয়ে কম নয়, এর প্রমাণ—তিনি প্রতিনিয়ত মানুষকে দিয়ে যাবতীয় মন্দ ও অন্যায় কাজ করিয়ে নিতে পারছেন। প্রশ্ন করি, এটা কিভাবে সম্ভব হচ্ছে? দুনিয়ার লোকসংখ্যা প্রায় ছয়শো কোটি, একই সময়ে অর্থাৎ একযোগে প্রায় সবাইকে দিয়ে মন্দ কাজ তিনি কিভাবে করাতে

পারছেন? এর উত্তর হলো, মহান শয়তানের এমনই মহিমা যে তিনি প্রতিমুহূর্তে প্রতিটি মানুষের অন্তরে অবস্থান করতে পারেন, কাজেই যে-কোন মানুষকে যখন খুশি মন্দ কাজের জন্যে প্ররোচিত করা তাঁর জন্যে পানির মত সহজ। প্রসঙ্গত, ঈশ্বরও প্রতিটি মানুষের অন্তরে অবস্থান করেন, এবং মানুষকে ভাল কাজ করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করেন ও উৎসাহ দেন—তবে কতটুকু যে তিনি সফল হন, সেটা কমবেশি সবাই আমরা জানি। ঈশ্বর ব্যর্থ—দুনিয়ার বেহাল অবস্থা দেখে এ-কথা না বলে কি সত্যি কোন উপায় আছে?

'এখন প্রশ্ন হলো, ঈশ্বর যদি ব্যর্থ হন, মানুষ তাহলে কার কাছে আশ্রয় চাইবে? কে তাকে রক্ষা করবে, কে-ই বা তাকে উদ্ধার করবে? শয়তান?

'প্রচলিত একটা ধারণা হলো এই যে শয়তান হলেন সমস্ত অকাজ-কুকাজ, যাবতীয় অশুভ কর্মকাণ্ড, সর্ববিধ অনিষ্ট, ষড়যন্ত্র, পাপ ও অপরাধের জনক। সবাই জানে, শয়তান প্ররোচিত করেন বলেই মানুষ অন্যায় করে। তাহলে প্রশ্ন উঠবে, শয়তান যদি সত্যি অশুভ একটা শক্তি হন, তাহলে তিনি আমাদের রক্ষা বা উদ্ধার করবেন কিভাবে? আমরাই বা কেন তাঁর উপাসনা করতে যাব?

'এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েই মহান শয়তান আমাকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে দুনিয়ার বুকে পাঠিয়েছেন। আমি আমার চোদ্দপুরুষের কসম খেয়ে সাক্ষী দিচ্ছি, মহান শয়তান অশুভ শক্তি নন, তিনি ঈশ্বরের মতই মহৎ ও পরম করুণাময়। তবে তিনি প্রতিশোধপরায়ণ।

'আমি আপনাদেরকে প্রশ্ন করি, মহান শয়তান মানুষকে মন্দ কাজ করার প্ররোচনা দেবেন না কেন? যিনি ঈশ্বরের সমতুল্য শক্তিশালী, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তৈরিতে যাঁর অবদান ঈশ্বরের সমান, যাঁর ওপর নির্ভর করছে প্রতিটি মানুষের নিয়তি ও ভবিষ্যৎ, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বদলে মানুষ কি করছে? মানুষ তাঁকে

সারাক্ষণ ব্যাটা শয়তান শালা শয়তান বলে গালমন্দ করছে, তাঁকে নিয়ে উপহাস করছে। এখন আপনারাই বলুন, তিনি মানুষকে দিয়ে খারাপ কাজ করাবেন না তো কি ভাল কাজ করাবেন?

'আজ আমাদের হাতে অনেক কাজ—দীক্ষাদান, নরবলি, সারারাত ধরে শয়তানের উপাসনা—কাজেই বক্তব্য সংক্ষিপ্ত না করে উপায় নেই। দ্বিতীয় শর্তটা হলো, মন-প্রাণ ঢেলে শয়তানের গুণকীর্তন করুন সবাই, তিনি যাতে সদয় হয়ে আমাদেরকে দিয়ে ভাল কাজ করান। ভেবে দেখুন, শয়তানের কৃপাদৃষ্টি ও করুণা আদায় করতে পারলে কতটা লাভবান হব আমরা। ঈশ্বরের ভালবাসা আর ক্ষমা তো আমরা না চাইতেই পাচ্ছি ও পাব, এবার তার সঙ্গে যোগ হবে ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী মহান শয়তানের আশীর্বাদ। দু'ভাবে লাভবান হবার সুযোগ এতদিন আমরা কাজে লাগাইনি। সারা দুনিয়া জুড়ে এত অশান্তি আর বিপদের সেটাই মূল কারণ। আমার ধর্ম দাঁড়িপাল্লাই এখন শেষ ভরসা। ঈশ্বর ও শয়তানকে সমান চোখে দেখি আসুন। দুই শক্তিরই প্রশংসা ও এবাদত করি। শুধু তাহলেই দুনিয়ার বুকে মানুষ শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। আজ এখানেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। তবে শেষ করার আগে নরবলি দেয়ার প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করার জন্য একটু সময় দিন আমাকে...'

চন্দ্রা ও রানা দুজনেই বুঝতে পারছে, শয়তান উপাসকরা তল্লাশী শুরু করার আগেই ধরা পড়ে যাবে ওরা। কারণ চন্দ্রার বাম পাশের চেয়ারে বসা সেই রাশিয়ান লোকটা এখন শুধু একা চন্দ্রার দিকে নয়, পালা করে রানার দিকেও ঘন ঘন তাকাচ্ছে, দৃষ্টিতে তীব্র সন্দেহ ও চ্যালেঞ্জ। তারই ফাঁকে, মাঝে-মধ্যে আশপাশের রাশিয়ানদের সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আলাপও করছে।

আত্মরক্ষার জন্য কি করা যায় চিন্তা করছে রানা। নাদিরা যতই প্রলোভন দেখাক, শয়তান উপাসকদের হাতে ধরা দেয়ার

কোন ইচ্ছা ওর নেই। তবে গা বাঁচানোর সহজ কোন উপায়ও দেখতে পাচ্ছে না। শক্রদের ঠিক মাঝখানে বসে আছে ওরা, এখন যদি নড়াচড়া করার বা এখান থেকে সরে যাবার চেষ্টা করে, সঙ্গে সঙ্গে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে।

একটা ব্যাপারে রানা এখন নিশ্চিত—নাদিরা অবশ্যই পাকিস্তানী এজেন্ট। 'গুলশানে, মিস্টার রাহাত খানের বাড়িতে আমাদের নিজস্ব একজোড়া কান ছিল...', এই কথা বলে নাদিরা নিঃসন্দেহে আইএসআই চীফ ইউসুফ হায়দারের কথাই বোঝাতে চেয়েছে কারণ রাহাত খানের সঙ্গে গোপন বৈঠকে ওখানে আর মাত্র একজনই উপস্থিত ছিলেন—কৈলাস জাঠোর, ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স আইএসএস-এর চীফ।

চন্দ্রার ওপাশে বসা রাশিয়ান লোকটার ওপর চোখ পড়তে রানার বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল। জ্যাকেটের বোতাম খুলে ফেলেছে, ভেতরে দেখা যাচ্ছে বেল্টে গোঁজা টুকারেভ পিস্তল—বাঁটে হাত বুলাচ্ছে সে, চোখ দুটো চন্দ্রার ওপর স্থির।

বিপদ ঘনিয়ে এসেছে, বুঝতে পেরে অকস্মাৎ নাটকীয় এক কাণ্ড ঘটিয়ে বসল চন্দ্রা। নিজের বুকে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ঠেকিয়ে লোকটাকে বলল, 'আমি ওলগা।' সেই হাতেরই তর্জনী লোকটার বুকে পিস্তলের মত করে ঠেকিয়ে হিসহিস করে আবার বলল, 'তুমি বিদেশী গুপ্তচর, মাসুদ রানা—ঠিক কিনা?'

প্রথমে একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল লোকটা। তবে তার আশপাশ থেকে চাপা স্বরে অনেকেই হেসে উঠল ওলগা তথা চন্দ্রার অভিযোগ শুনে—সবাই ব্যাপারটাকে কৌতুক বলেই মনে করছে। দেখাদেখি এবার লোকটাও হাসল। বলল, 'হাই, ওলগা। সত্যি দুঃখিত—তোমার গলার আওয়াজটা কেমন যেন লাগছিল, তাই...'

'কথাটা আমিও ওকে বলেছি,' চন্দ্রার ডান পাশ থেকে লোকটাকে বলল রানা। 'একটু যেন বেশি মিষ্টি শোনাচ্ছে, তাই

না? ভাল কথা, আমি মিখাইল...'

ওদিকে স্বঘোষিত 'পয়গম্বর' শাহ বকশী খোঁড়া ও হাস্যকর যুক্তি দেখিয়ে বলে চলেছে, '...মহান শয়তান প্রায়শ্চিত্ত পছন্দ করেন। হাজার হাজার বছর ধরে মানবজাতি এবং জন্মের পর থেকে আপনারা তাঁকে গালমন্দ আর অভিশাপ দিয়েছেন। স্বভাবতই আপনাদের ওপর তিনি ভয়ানক খেপে আছেন। তাঁর সেই রাগ দূর করার জন্যেই আমাদেরকে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। সবচেয়ে বড় ত্যাগ নিজেদের মধ্যে থেকে প্রিয় একজনকে বলি দেয়া। আমার তৃতীয় বেগম সেই রকম একজনকে বাছাই করে রেখেছেন। দীক্ষাদান পর্ব শেষ হলেই তাকে বলি দেয়া হবে। আমরা অগ্নি উপাসক, তাই আগুনে পুড়িয়েই নির্বাচিত ব্যক্তিকে মহান শয়তানের নামে উৎসর্গ করব আমরা। ধন্যবাদ।'

কাঁচ ঘেরা ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে সিংহাসনে বসল শাহ বকশী। মাইকের সামনে আবার এসে দাঁড়াল তার তৃতীয় বেগম নাদিরা বুলবুলি। তার পিছু নিয়ে সুট পরা সেই কাফ্রীও এলো।

'এবার দীক্ষাদান শুরু হবে,' বলল সে। 'আপনারা যারা স্বেচ্ছায় নতুন ধর্ম দাঁড়িপাল্লা গ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করেছেন তাদেরকে মহামান্য শাহ বকশীর তরফ থেকে অভিনন্দন। ইতিমধ্যে আপনাদেরকে সিরিয়াল নম্বর দেয়া হয়েছে, সেই নম্বর ধরে একজন একজন করে মঞ্চে উঠে আসুন। মঞ্চে ওঠার পর দেহরক্ষীরা দেহ-তল্লাশী করবে। তল্লাশী শেষ হলে মহামান্য শাহ বকশীর পায়ের সামনে হাঁটু মুড়ে বসবেন আপনারা। তিনি আপনাদের মাথায় হাত রেখে মহান শয়তানের প্রশংসাসূচক গীত ও পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করবেন। এরপর তিনি আপনাদেরকে উপহারসামগ্রী তুলে দেবেন নিজ হাতে।

'দীক্ষাদান পর্ব শেষ হওয়া মাত্র শুরু হবে নরবলি অনুষ্ঠান। তারপর সারারাত ধরে চলবে শয়তানের পুজো ও আরাধনা।

'এবার অন্য একটা প্রসঙ্গ। পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত

শামিয়ানার ভেতর আপনারা যে-যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন, কোন অবস্থাতেই নিজের জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও সরে যাবার চেষ্টা করবেন না। কেউ যদি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে চান, সাদা-কালো উর্দি পরা উপাসকদের সাহায্য নিন। তারা আপনাকে পরীক্ষা করে যদি নিশ্চিত হন যে আপনি স্পাই নন, তাহলে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু অনুমতি না নিয়ে কেউ যদি নিজের জায়গা ছেড়ে কোথাও যাবার চেষ্টা করেন, আপনাকে স্পাই বলে সন্দেহ করা হবে।

'মাসুদ রানা ও চন্দ্রা দেবযানি, তোমাদের এই শেষবার বলছি, নরবলি শেষ না হওয়া পর্যন্ত সময় দেয়া হলো। তারপরই কয়েক হাজার লোক তোমাদের খোঁজে তল্লাশী শুরু করবে–ওদের প্রত্যেকের হাতে থাকবে খোলা তলোয়ার। প্রয়োজনে প্রেরিত পুরুষ মহামান্য শাহ বকশীর ইরানী দেহরক্ষী ভাইরাও তল্লাশীতে অংশগ্রহণ করবে, তবে তার প্রয়োজন হবে বলে মনে করি না...'

রানার দিকে সামান্য একটু ঝুঁকে চন্দ্রা ফিসফিস করে বলল, 'এখন উপায়?'

'উপস্থিত বুদ্ধি আর প্রচণ্ড সাহসই এখন শুধু বাঁচাতে পারে আমাদের,' নিচু গলায় বলল রানা। 'সুযোগের অপেক্ষায় থাকব–দর্শকরা একটা হৈ-চৈ বাধালে ভাল হয়, তা না হলে আমাদেরকেই একটা ডাইভারশন তৈরি করতে হবে...'

'ঠিক আছে,' বলল চন্দ্রা। 'রানা, একটা ব্যাপার বুঝছি না–ওই ইরানীগুলো ইন্ডিয়ান আর্মির ইউনিফর্ম পরে আছে কেন?'

'আমিও কথাটা ভাবছিলাম,' বলল রানা। 'ইউনিফর্মগুলো ওরা কোত্থেকে পেয়েছে, এটা বলে দেয়া যায়। ভারতীয় সৈন্যদের খুন করার পর তাদের সমস্ত জিনিস দখল করে নিয়েছে ওরা। আমার ধারণা, শাহ বকশীর নির্দেশেই ওই ইউনিফর্ম পরতে হয়েছে ওদেরকে। ভারতীয় সৈন্যরা আবার যদি চরস দখল করে নেয়, তাদেরকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলাটাই সম্ভবত উদ্দেশ্য।'

ছয়

জায়গা ছেড়ে নড়া নিষেধ, এই নির্দেশ সহজ-সরল দ্বীপবাসীদের মধ্যে অদ্ভুত একটা আড়ষ্ট ভাব এনে দিয়েছে। সবাই অসন্তুষ্ট, খানিকটা সন্ত্রস্তও বটে, নিজেদের মধ্যে চাপা স্বরে ফিসফাস করছে, তবে ভুলেও কেউ জায়গা ছেড়ে নড়ছে না।

যতটা সময় লাগার কথা, দীক্ষাদান অনুষ্ঠান তারচেয়ে অনেক আগেই শেষ হলো—সময়ের অভাবে শাহ বকশী কয়েকজনকে একসঙ্গে মন্ত্রপাঠ করাল।

হঠাৎ, একেবারে আচমকা, রাতের নিস্তব্ধতাকে ভেঙে খান-খান করে দিয়ে প্রাচীন পাথুরে কেল্লা থেকে ভেসে এলো একদল নারীকণ্ঠের বিরতিহীন উলু ধ্বনি। শামিয়ানার বাইরে জ্বলন্ত মশাল দিয়ে বৃত্ত তৈরি করা হয়েছে, সেই বৃত্তের আলো কেল্লা পর্যন্ত পৌঁছায়নি। নারীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ উলুধ্বনি খানিকটা ভৌতিক ও রোমাঞ্চকর একটা আবহ তৈরি করল। এক কি দেড় মিনিট পর রোমহর্ষক সেই শব্দকে চাপা দিয়ে বেজে উঠল খোল, করতাল আর ঢাক পেটানোর কান ঝালাপালা করা আওয়াজ—সে-ও ওই কেল্লার দিক থেকেই দ্রুত এগিয়ে আসছে মঞ্চের দিকে।

পুরোদস্তুর একটা মিছিলই বলতে হবে, সামনে রয়েছে সাদা রঙে খুলি প্রিন্ট করা কালো শাড়ি পরা একদল তরুণী। অন্ধকার থেকে ধীরে ধীরে আলোয় বেরিয়ে আসছে তারা। তাদের দীর্ঘ ঘোমটার ভেতর থেকে এখনও উলুধ্বনি ভেসে আসছে। ঠিক

পিছনে রয়েছে মন্দিরা, মৃদঙ্গ ও ঢাক নিয়ে একদল তরুণ, পরনে শয়তান উপাসকদের মার্কামারা উর্দি। মশালের আলোয় তারপর উদ্ভাসিত হলো সচল একটা কালো পাহাড়–প্রকাণ্ড হাতি, পিঠে হাওদা, হাওদার ভেতর আট-দশটা বালিশ দিয়ে একটা ঘের তৈরি করা হয়েছে, তার ভেতর হেলান দিয়ে বসে রয়েছে ধবধবে সাদা কাপড়ে আপাদমস্তক ঢাকা এক লোক। লোকটার ধড়ের ওপর মুণ্ডুটা এমনভাবে বসানো, নড়বড় নড়বড় করছে–সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক, জীবিত নাকি মৃত।

হাতি আসলে দুটো; পিছনের হাতিটা বয়ে আনছে চেরা কাঠ, ঘি ভর্তি বয়াম, তেল মাখানো হাত সাতেক লম্বা পাঁচ-ছয়টা বাঁশ ইত্যাদি। মিছিলের শেষ দিকে দেখা গেল এক পাল শুয়োরকে।

মঞ্চের ডান দিকে থামল মিছিলটা। এদিকটা ফাঁকাই বলা চলে, শুধু মাঝখানে দশ গজ ব্যবধান রেখে একজোড়া মোটা ও অস্বাভাবিক লম্বা কাঠের পোস্ট খাড়া করা হয়েছে; একটা পোস্টের দু'দিকে শয়তানের প্রতীক হিসেবে কুচকুচে কালো হুবহু একই আকৃতির দুটো পাথরের মূর্তি দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে–কুৎসিত, বেঢপ, কিম্ভূতকিমাকার–মুখ, কান, চোখ ও নাক দিয়ে ধোঁয়া ও আগুন বেরুচ্ছে।

দ্বিতীয় পোস্টটা খালি।

মিছিল স্থির হতে তরুণীদের উলুধ্বনি থেমে গেল, একই সঙ্গে থেমে গেল খোল-করতাল-ঢাকের আওয়াজ। দ্বিতীয় হাতির পিঠ থেকে নেমে এসে একদল লোক খাড়া করা খালি পোস্টটার চারদিকে চেরা কাঠগুলো পিরামিডের আদলে সাজাল, তারপর দ্বিতীয় হাতির পিঠ থেকে সাদা কাপড়ে মোড়া লোকটাকে নামিয়ে এনে পোস্টের গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড় করাল। মারা যদি না-ও গিয়ে থাকে, রানা বাজি ধরতে রাজি আছে যে লোকটার জ্ঞান নেই। কয়েকজোড়া হাত তাকে ধরে আছে, তা না হলে নির্ঘাত ঢলে পড়ত, এমনই নড়বড় করছে হাঁটু আর ঘাড়। পিরামিডের

মাথায় পোস্টটা এখনও অনেক লম্বা, সেটার সঙ্গে লোকটার হাঁটুর নিচে, হাঁটুর ওপর উরুতে, দুই হাত বাদ দিয়ে কোমরে ও বুকে রশি পেঁচানো হলো। ঘি ভর্তি কয়েকটা বয়াম উপুড় করা হলো পিরামিডের গায়ে, তবে বাতাসে পেট্রলেরও গন্ধ পেল রানা।

নরবলির আয়োজন শুরু হবার পর থেকে শামিয়ানার নিচে স্থির পাথরের মূর্তি হয়ে আছে প্রতিটি মানুষ, নড়াচড়া তো দূরের কথা, যেন নিঃশ্বাস ফেলতেও ভুলে গেছে সবাই। রানা ও চন্দ্রাকে যারা খুঁজছিল তারাও প্রায় সম্মোহিত হয়ে পড়েছে, পিরামিড ও লোকটার দিক থেকে চোখ সরাতে পারছে না।

ব্যতিক্রম শুধু মশাল হাতে শয়তান উপাসকরা, শামিয়ানার বাইরে পরস্পরের আরও কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে তারা, যাতে ফাঁক গলে কেউ বেরিয়ে যেতে না পারে।

জমাট নিস্তব্ধতার মাঝখানে হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে মঞ্চ থেকে ভরাট কণ্ঠে মন্ত্র পাঠ শুরু করল শাহ বকশী। সিংহাসন ত্যাগ করে আবার কাঁচ ঘেরা ঘরের ভেতর ঢুকেছে সে। মন্ত্রপাঠ শেষ করে বলল, 'মহান ঈশ্বর ও মহান শয়তানের কি অসীম দয়া, তাঁরা পুরুষ জাতিকে নারী উপহার দিয়েছেন। ঈশ্বরের বিধান হলো, পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে নির্দিষ্ট কিছু অংশ পাঠ করে যে-কোন নারীকে তুমি তোমার আইনসম্মত স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারো; আর মহান শয়তানের বিধান হলো, জবাই করা শুয়োরের রক্ত পান এবং ওই একই রক্ত দিয়ে স্নান করিয়ে যে-কোন নারীকে তুমি বৈধ স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারো।' হাত তুলে সাদা-কালো শাড়ি পরা তরুণীদের দেখাল সে। 'ওরা স্বেচ্ছায় আমার ব্যক্তিগত হারেমের শোভা বর্ধন করতে রাজি হয়েছে, তাই ওদেরকে এখন শুয়োরের রক্ত পান এবং ওই একই রক্ত দিয়ে স্নান করানো হবে। ভাইসব, বলাই বাহুল্য যে মহান শয়তানের এই বিধান আপনাদের জন্যেও, অর্থাৎ প্রতিটি শয়তান-প্রেমীর জন্যেই প্রযোজ্য। ইচ্ছা করলে আপনারাও শুয়োরের রক্ত পান

করিয়ে যে-ক'জনকে চান সে-ক'জন নারীকে বিয়ে করে ঘরে তুলতে পারেন। ধন্যবাদ।'

শাহ বকশী থামতেই তীক্ষ্ণ শব্দে উলুধ্বনি দিতে দিতে মঞ্চ থেকে নেমে এলো নাদিরা বুলবুলি, ইরানী দেহরক্ষীরা সসম্ভ্রমে সরে গিয়ে তাকে আর তার কাফ্রী বডিগার্ডকে পথ করে দিল।

ওদিকে ধারাল ছোরার জোরাল কোপে এক এক করে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে নধর শুয়োরগুলোর ধড় ও মাথা, ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসা রক্ত চীনামাটির গামলায় ধরা হচ্ছে। হাত বদল হয়ে গামলাগুলো পৌঁছে যাচ্ছে সুন্দরী তরুণীদের কাছে। গামলার কিনারায় ঠোঁট ঠেকিয়ে দু'এক ঢোক রক্ত পান করছে তারা, তারপর গামলার বাকি রক্ত যে-যার মাথার ওপর হড়হড় করে ঢালছে।

এ-ও মহান শয়তানের কোন বিধান কি না একমাত্র শাহ বকশীই তা ভাল বলতে পারবে–যেদিনই নরবলি দেয়া হয় সেদিনই কিছু তরুণীকে বিয়ে করে সে। এই বিয়ের পরিকল্পনা ও আয়োজন অনেক আগেই সম্পন্ন করা হয়–সুন্দরী দেখে মেয়েগুলোকে আনা হয় ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে। এই কাজটা করে একদল দালাল, তারা নানা রকম প্রলোভন দেখিয়ে মেয়েদের মা-বাবাকে শাহ বকশীকে জামাই করতে রাজি করায়।

তরুণীদের রক্ত-স্নান তখনও শেষ হয়নি, মঞ্চ থেকে নেমে এসে পিরামিড আকৃতির সাজানো কাঠে অগ্নিসংযোগ করল শাহ বকশীর তৃতীয় পক্ষ নাদিরা বুলবুলি। অকস্মাৎ দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল কমলা রঙের আগুন, সেই সঙ্গে অনেক দূর পর্যন্ত বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল চন্দন কাঠের মিষ্টি গন্ধ। তবে পেট্রল পোড়ার কটু গন্ধটাও লাগছে নাকে। দেখতে দেখতে পিরামিডটা আগুনে ঢাকা পড়ে গেল।

শামিয়ানার ভেতর পিন-পতন নিরবতা। কেউ এক চুল নড়ছে না। মঞ্চে কোন শব্দ না করে মন্ত্রপাঠ করছে শাহ বকশী–চোখ বন্ধ, শুধু ঠোঁট জোড়া নড়ছে।

দাউ-দাউ আগুনের সামনে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে নাদিরা, পোস্টে বাঁধা ও সাদা কাপড়ে আপাদমস্তক ঢাকা বলির শিকার লোকটার দিকে কি এক ব্যাকুল প্রত্যাশায় একদৃষ্টে তাকিয়ে।

আগুন এবার লোকটাকে ছুঁলো। সাদা কাপড় লাল শিখা হয়ে যাচ্ছে, সেই শিখা তার পা বেয়ে ধীরে ধীরে ওপরদিকে উঠছে। মাংস পোড়ার উৎকট গন্ধে ভারি হয়ে উঠল বাতাস।

সবাই ইতিমধ্যে যা ধারণা করেছে সেটাই বোধহয় সত্যি। ওটা একটা লাশ। নরবলি দেয়ার নাম করে আসলে মরা একটা মানুষকে পোড়ানো হচ্ছে। অনেকেরই মনে হলো, এ স্রেফ ঠকবাজি। কিন্তু তাদের ধারণা মিথ্যে প্রমাণিত করে সাদা কাপড়ের ভেতর নড়ে উঠল লোকটা ।

অসহায় আক্রোশে অস্তিত্বের প্রতিটি অণু ফুঁসছে, মনে হচ্ছে এই বর্বরতা মেনে নিয়ে চুপ করে থাকাটাও গুরুতর অপরাধ, কিন্তু মিশন এবং পৈত্রিক প্রাণের স্বার্থে বোকার মত ঝুঁকি নিতেও সায় দিচ্ছে না রানার মন।

লোকটা নড়ল, অমনি যেন একটা বোতামে চাপ পড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রায় একযোগে নড়ে উঠল উপস্থিত দর্শক–কেউ মুখ ঢাকল দু'হাতে, কেউ দাঁড়িয়ে পড়ল জ্যান্ত মানুষকে পোড়ানোর দৃশ্যটা আরও ভাল করে দেখার জন্যে।

মুখোশ পরা প্রায় সব রাশিয়ানই চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, তাদের সঙ্গে রানা ও চন্দ্রাকেও দাঁড়াতে হয়েছে। রানা লক্ষ করল, পোস্টে বাঁধা লোকটা মোচড় খাচ্ছে, মুক্ত হাত দুটো দিয়ে টানাটানি করছে গায়ের সাদা কাপড়টা, কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হলো তার কোন চিৎকার শোনা যাচ্ছে না।

নাদিরার আচরণও খুব অদ্ভুত লাগছে রানার। কাঠের পিরামিডে আগুন দেয়ার পর ওখানে তার আর কোন কাজ নেই, কাজেই মঞ্চে ফিরে যাবারই কথা, কিন্তু তা না গিয়ে আগুনের যতটা সম্ভব কাছে দাঁড়িয়ে বলির শিকার লোকটার দিকে নির্নিমেষ

দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে–যেন কিছু একটা ঘটার অপেক্ষায় আছে সে।

আগুনের শিখা এবার লোকটার হাঁটু স্পর্শ করল। প্রচণ্ড টান দিয়ে ফড়ফড় করে গায়ের কাপড় ছিঁড়ে ফেলল সে। লোকটার বুক উন্মুক্ত হলো, উন্মুক্ত হলো মুখ ও মাথা।

রানা কখনও তাকে দেখেনি। তবে চন্দ্রা দেখেছে।

সাত

প্রচণ্ড বিস্ময় হিতাহিত জ্ঞান কেড়ে নিল, মুখোশের ভেতর এত জোরে চিৎকার করে উঠল চন্দ্রা, 'হে ভগবান, এ তো সাঈদ শাকির!' আশপাশের রাশিয়ানরা তো বটেই, আরও দূরের শয়তান উপাসকরা, এমনকি জ্বলন্ত শাকি...ের সামনে দাঁড়ানো নাদিরা পর্যন্ত তার সেই চিৎকার শুনতে পেল–তা না হলে ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে চন্দ্রার দিকে সে তাকাবে কেন!

অকস্মাৎ হাত বাড়াল সেই সন্দেহপ্রবণ রাশিয়ান লোকটা, কিন্তু চন্দ্রা নিজের ভুল বুঝতে পেরে ততক্ষণে ছুটতে শুরু করেছে, একটুর জন্যে লোকটা তার নাগাল পেল না। কয়েকটা ফোল্ডিং চেয়ার উল্টে, কনুইয়ের ধাক্কায় লোকজনকে সরিয়ে যেদিকে ফাঁক পাচ্ছে সেদিকে ছুটছে চন্দ্রা, ভুলেও একবার পিছন ফিরে রানার দিকে তাকাচ্ছে না।

সেই মুহূর্তে রানা যদিও প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণায় কাতর, তাসত্ত্বেও চন্দ্রার এই আচরণ ওর দৃষ্টি এড়ায়নি; অনুভব করল,

মেয়েটার প্রতি সমীহ ও শ্রদ্ধায় অন্তরটা ভরে উঠছে। নিজের ভুল বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে রানার কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে চন্দ্রা, শত্রুপক্ষকে বুঝতে দিতে চায় না কার সঙ্গে ছিল সে, জানে তার বাঁচার কোন আশা নেই, তবে রানা যেন প্রাণ নিয়ে পালাতে পারে।

রানা যে-ধরনের মানুষ, আশা করা অন্যায় নয় যে এরকম একটা পরিস্থিতিতে মেয়েটাকে অবশ্যই বাঁচাবার চেষ্টা করবে ও, এমনকি প্রাণ হারাবার শতভাগ আশঙ্কা আছে জানা সত্ত্বেও ঝুঁকিটা নেবে। কিন্তু না, এই মুহূর্তে চন্দ্রা ওর কাছে প্রথম গুরুত্ব নয়। চোখের সামনে অচেনা একটা মানুষকে পুড়িয়ে মারতে দেখলে কোন অবস্থাতেই কারও তা মেনে নেয়া উচিত নয়, আর ওই লোকটা তো একজন বাংলাদেশী, বিসিআই-এর দুর্ধর্ষ এজেন্টদের একজন—বলা যায় আরেকজন মাসুদ রানা। কাজেই 'নিজেকে' বাঁচানোটাই ওর কাছে প্রথম গুরুত্ব পাবে।

ভিড় ঠেলে সামনে এগোল রানা। কিভাবে কি করবে, পরিষ্কার কোন ধারণা নেই ওর। শুধু জানে শাকিরকে সাহায্য করতে হবে।

শাকিরের চোখ দুটো বিস্ফারিত, সরাসরি নাদিরার দিকে তাকিয়ে আছে সে-ও—দৃষ্টিতে একাধারে বিস্ময়, অবিশ্বাস, আবার প্রত্যাশাও। চিৎকার করার জন্যে বারবার হাঁ করছে, কিন্তু কোন শব্দ বেরুচ্ছে না, বেরুচ্ছে তাজা রক্ত। রানার সন্দেহ হলো, শাকিরের জিভটা অনেক আগেই কেটে নেয়া হয়েছে। তার হাঁ করা মুখ থেকে বোধগম্য কোন শব্দ বের না হলেও, কি উচ্চারণ করতে চাইছে তা যেন হঠাৎ পরিষ্কারই উপলব্ধি করতে পারল রানা—বলতে গেলে বিদ্যুৎচমকের মত এক নিমেষে বুঝে ফেলল ও ঠিক কি ঘটছে এখানে।

নাদিরা ও শাকির, দু'জনেই পাকিস্তানী স্পাই, আইএসআই-এর এজেন্ট; পরস্পরকে তারা ভালভাবেই চেনে। নাদিরা এ-ও জানে যে শাকির আসলে বাংলাদেশী, বিসিআই এজেন্ট, আর

আইএসআই চীফ ইউসুফ হায়দার শাকিরকে অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে চরস দ্বীপে পাঠিয়েছেনও তার হাতে খুন হবার জন্যে।

রানা ধারণা করল, শাকির ধরা পড়ার পর প্রথম সুযোগেই নাদিরা তার জিভ কেটে নিয়েছে। কারণটাও পরিষ্কার। শাহ বকশী ও জেনারেল গোরস্কি, কেউই ওরা জানে না যে নাদিরা পাকিস্তানী স্পাই–স্বভাবতই এই তথ্যটা ফাঁস হবার ঝুঁকি নিতে চায়নি সে।

দুই পা ও উরুর অর্ধেক আগুনে ঢাকা পড়ে গেছে, নিঃশব্দে চিৎকার করে সাঈদ শাকির উচ্চারণ করতে চাইছে: 'নাদিরা, প্লীজ! নাদিরা, প্লীজ! আমাকে গুলি করো!'

চন্দ্রা যেন মুখোশ পরা ক্যাঙ্গারু, লোকজনের ভিড়ের ভেতর দিয়ে লাফ দিয়ে দিয়ে ছুটছে। রাবারের মুখোশ থাকায় শয়তান উপাসকদের অনেকেই বিমূঢ়, ইতিকর্তব্য স্থির করতে পারছে না। যাদের বিভ্রম দূর হয়েছে তারা চন্দ্রাকে ধাওয়া করে মুখোশটা কেড়ে নিতে পারলেও, হাতের তলোয়ার ব্যবহার করতে পারছে না–চন্দ্রা একা, তার চারপাশে নিজেদের মানুষ অসংখ্য, তলোয়ার চালালে সেমসাইড হবারই বেশি সম্ভাবনা।

তার ওপর মঞ্চ থেকে শাহ বকশীর নির্দেশ ও ঘোষণা সমস্যাটাকে আরও জটিল করে তুলল। সে বলল, 'হোয়াট! একটা মেয়েলোকের এত দুঃসাহস! ধরো ওকে, জ্যান্ত ধরো! আমার প্রভু শয়তান সীমা লঙ্ঘনকারিণীদের পছন্দ করেন না, তাদেরকে ধরে ধরে বলি দিলে খুশি হন। তবে ওকে শুধু বলি দেয়া হবে না, ওর তাজা রক্তে প্রথমে আমার তৃতীয় বেগম গোসল করবে।'

শয়তান উপাসকরা এরপর হাতের তলোয়ার খাপে গুঁজে নিয়ে ধাওয়া করল চন্দ্রাকে। ভুলটা করে বসার পর বিশ কি ত্রিশ সেকেন্ড পার হয়ে গেছে, হাজার হাজার লোকের মাঝখানে থাকা সত্ত্বেও এখনও চন্দ্রার ধরা না পড়াটা অবিশ্বাস্যই বলতে হবে। তবে এরপর বিশ্বাস্য ঘটনাটাও ঘটল। বিশ-পঁচিশ জন শয়তানের

চেলা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল ওকে, তাদের মধ্যে পাঁচ-সাতজন একযোগে লাফ দিয়ে ওর ঘাড়ে পড়ল। ছোট্ট ও নিরেট একটা স্তূপের মত লাগল দেখতে ভিড়টাকে, হঠাৎ একটা পিস্তলের ভোঁতা আওয়াজ হতে স্তূপটা ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেল—লোকগুলো ছিটকে পড়ল চারদিকে। সবাইকে গুলি না লাগলেও, ছিটকে পড়ার পর আতঙ্কে আর নড়তে পারছে না কেউ। স্তূপের মাঝখান থেকে একা শুধু চন্দ্রা তেজস্বিনী ঘোড়ার মত লাফ দিয়ে সিধে হয়ে আবার ছুটছে, হাতে উদ্যত পিস্তল। মঞ্চের কাছ থেকে শাহ বকশীর দেহরক্ষীরা এবার রাইফেল তুলে ফাঁকা আওয়াজ করল।

সেদিকে তাকিয়ে থাকায় কয়েকটা মহার্ঘ মুহূর্ত অপচয় হয়েছে রানার, তবে তার খেসারত দিতে হলো আরেকজনকে।

দীক্ষা নিতে আসা লোকদের আর রাশিয়ানদের বসার জায়গা আলাদা করা হয়েছে একটা মাত্র বাঁশ ফেলে। সেটা টপকাতে যাচ্ছে রানা, পিছন থেকে কে যেন টোকা দিল বাম কাঁধে। রানা ঘুরছে, ডান কাঁধটা যেন আপনা থেকেই ঝাঁকি খেলো। ঘোরার পর দেখল, এ সেই নাছোড়বান্দা রাশিয়ান লোকটা। বেল্টে গোঁজা রাশিয়ার তৈরি টুকারেভ পিস্তলটার বাঁটে বাম হাতের আঙুল নাচাতে নাচাতে বলল, 'তোমার সঙ্গিনী যদি ওলগা না হয়, তুমিও মিখাইল নও। সারেন্ডার করো, মিস্টার স্পাই!'

'কেন ভাই খামোকা ঝামেলা পাকাচ্ছ!' মিনতির সুরে বলল রানা, এক পা এগিয়ে পুরানো ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত আলিঙ্গন করল লোকটাকে। 'কেমন হবে, ছুরি দিয়ে পেটটা যদি চিরে দিই?'

বিস্ময়ে ও অবিশ্বাসে হাঁ হয়ে গেল লোকটা; রানা ছেড়ে দিতে পাথুরে চত্বরের মেঝেতে ঢলে পড়ছে। রানা প্রশ্নটা করেছে তার নাভি থেকে বুকের হাড় পর্যন্ত পেট চেরার পর, আগে নয়। পিছন থেকে বাম কাঁধে টোকা পড়ায় ডান কাঁধ ঝাঁকিয়ে বগলের তলায় আটকানো ছুরিটা হাতের তালুতে এনে লুকিয়ে রেখেছিল ও।

তার দিকে আঙুল তাক করে হাসল রানা, আশপাশের দর্শকদের শুনিয়ে বলল, 'হার্ট যাদের দুর্বল, তাদের নরবলি দেখতে আসা উচিত নয়। বন্ধু আমার অসুস্থ হয়ে পড়েছে।'

তাকে পিছনে ফেলে সদ্য দীক্ষা পাওয়া লোকগুলোর মাঝখান দিয়ে ছুটল রানা। পনেরো গজ সামনে পড়ল একাধিক বাঁশের আরেকটা বাধা। এই বাধা থেকে মাত্র বিশ গজ দূরে পোড়ানো হচ্ছে শাকিরকে। আগুনের শিখা ইতিমধ্যে তার কোমরকে ছাড়িয়ে বুক চাটতে শুরু করেছে। মাংস পোড়ার গন্ধে বহু লোক ছুটোছুটি ও বমি করছে। এমনকি নাদিরাও নাকে রুমাল চেপে ধরে এক ছুটে মঞ্চে ফিরে গেল।

ফাঁকা গুলিতে কোন কাজ হচ্ছে না। চন্দ্রা তীরবেগে ছুটছে। সামনে শয়তান উপাসকদের কেউ পড়লে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে ফেলে দিচ্ছে নির্দ্বিধায়। হ্যাঁ, মনে মনে স্বীকার করল রানা, মেয়ে বটে একটা! জানে কিছুক্ষণের মধ্যে হয় তাকে জবাই করে, পুড়িয়ে, কিংবা ছিঁড়ে টুকরো করে মারা হবে, তারপরও শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়তে চাইছে। আর মাত্র কয়েকটা সেকেন্ড টিকে থাকো, চন্দ্রা—মনে মনে বলল রানা—আমি আসছি।

সামনে বাঁশের আড়াআড়ি বাধা দেখেও থামল না রানা, এক লাফে সবচেয়ে ওপরের বাঁশটায় উঠে হেলান দিল মাটিতে পোঁতা অপর একটা খাড়া করা বাঁশে; আগেই হাতে বেরিয়ে এসেছে ওয়ালথারটা, লক্ষ্য স্থির করে একটা মাত্র গুলি করল।

চওড়া কপালে লাল একটা ফুটো ভব-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিল শাকিরকে।

শিকারীদের ভাষায় এই মুহূর্তে রানা 'সিটিং ডাক', শাহ বকশীর দক্ষ ইরানী দেহরক্ষীরা একে/ফরটিসেভেনের গুলিতে ওর খুলিটা অনায়াসেই উড়িয়ে দিতে পারে।

তবে তাদের মনোযোগ এখনও চন্দ্রার দিকে। অনবরত ফাঁকা গুলিও করছে, ফলে ওয়ালথারের সিঙ্গেল শট কেউ শুনতেই

পায়নি। যদিও মাইক্রোফোনে মন্ত্রপাঠরত শাহ বকশীর শ্যেনদৃষ্টিতে দাঁড়-এর ওপর দাঁড়ানো রানা ধরা পড়ে গেল।

বুলেটপ্রুফ কাঁচের ভেতর থেকে শাহ বকশী দেখল ডান হাত দিয়ে একটা ঢিল ছুঁড়ল রানা, প্রায় একই সঙ্গে বাম হাতে গর্জে উঠল পিস্তল। ঢিলটা উড়ে আসছে, শাহ বকশীর দৃষ্টি সেটাকে অনুসরণ করছে–ভুলটা তখনই ভাঙল। ঢিল নয়, গ্রেনেড।

গ্রেনেড নয়, বুলেটপ্রুফ কাঁচে প্রথমে লাগল ওয়ালথারের গুলি। কাঁচ ভাঙল না, তবে ফেটে ঝাপসা হয়ে গেল। গ্রেনেডটা ফাটল দু'সেকেন্ড পর মঞ্চের মাঝখানে। বিস্ফোরণের বিকট শব্দ থামতে না থামতে নরক গুলজার হয়ে উঠল। কেল্লার সামনের গোটা চত্বর জুড়ে চিৎকার, কান্না, ছুটোছুটি, গোলাগুলি, ধাক্কাধাক্কি–কি না ঘটছে। মঞ্চের তিনটে সিংহাসনই এই মুহূর্তে খালি। মুখোশ পরা প্রকাণ্ডদেহী লোকটা, জেনারেল সের্গেই গোরস্কি, মঞ্চ থেকে কখন নেমে গেছে রানা খেয়াল করেনি। আর মঞ্চে ফেরার পর কাঁচের ঘরে ঢুকে স্বামীর পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল নাদিরা, ছায়ার মত বডিগার্ডও ছিল পিছনে। এই মুহূর্তে বসে পড়ায় তিনজনের কাউকেই সেখানে দেখা যাচ্ছে না।

রানার দ্বিতীয় গ্রেনেডটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। কাঁচের ঘর মঞ্চের মেঝের সঙ্গে প্রায় মিশে গেল। অথচ, কি আশ্চর্য, ওখানে শাহ বকশী ও নাদিরা নেই। রক্তের লাল রঙ অথবা ছিন্নভিন্ন মাংস, কিছুই রানার চোখে পড়ল না।

ভুয়া পয়গম্বর শাহ বকশী আর আইএসআই এজেন্ট নাদিরা যেভাবেই হোক পালিয়েছে, কাজেই রানা এবার নিজেদের গা বাঁচানোর কাজে মনোযোগী হলো।

'দাঁড়' থেকে নিচে নামার আগে চন্দ্রাকে আরেকবার দেখতে পেল রানা। আগের মতই ছুটছে সে, হাতে উদ্যত পিস্তল।

ফাঁকা গুলিতে কাজ হচ্ছে না দেখে তিনজন ইরানী দেহরক্ষী চন্দ্রাকে লক্ষ্য করে ব্রাশ ফায়ার করল। সেই মুহূর্তে একজন

শয়তান উপাসক ল্যাং মারায় ছিটকে পাথুরে চত্বরে পড়ল চন্দ্রা, ব্রাশ ফায়ারের গুলিতে পটল তুলল তিন থেকে পাঁচজন শয়তান উপাসক।

তবে চন্দ্রা আর সিধে হতে পারল না। আশপাশ থেকে অন্তত পঞ্চাশজন ছুটে এলো, প্রত্যেকের হাতে খোলা তলোয়ার। কম করেও বিশটা তরোয়ালের ছুঁচালো ডগা চন্দ্রার নিতম্ব, পিঠ ও ঘাড়ে ঠেকে আছে। শরীরটা ক্ষত-বিক্ষতই হতে যাচ্ছিল, ইরানী দেহরক্ষীদের লীডার দূর থেকে গর্জে উঠল, 'খবরদার, কেউ ওর গায়ে হাত দেবে না! মহামান্য পয়গম্বর ওকে অক্ষত অবস্থায় ধরতে বলেছেন।' পায়ের পাতায় ভর দিয়ে উঁচু হলো সে, ছুটন্ত রানাকে দেখার চেষ্টা করছে। 'তবে ওই শালা মুখোশ পরা স্পাইকে কোনমতে ছাড়বে না। জ্যান্ত হোক মরা হোক, ধরে হুজুরের সামনে হাজির করো। এই কাজের জন্যে তোমরা অবশ্যই মূল্যবান পুরস্কার পাবে।'

রানা চন্দ্রার দিকেই ছুটছে, কিন্তু চন্দ্রা প্রতি মুহূর্তে আরও দূরে সরে যাচ্ছে ওর কাছ থেকে—পাঁচ-সাতজন শয়তান উপাসক চ্যাংদোলা করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাকে, ওদের পিছু পিছু ছুটছে কয়েকশো লোক।

রানার একহাতে ছুরি, আরেকহাতে পিস্তল দেখে ছুটন্ত মিছিলের পিছনটা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। তবে তাদেরই একজন পুরস্কার পাবার লোভ সামলাতে না পেরে তলোয়ার উঁচিয়ে লাফ দিয়ে পড়ল ওর ঠিক সামনে। বিনা দ্বিধায় ওয়ালথারের ট্রিগার টিপে দিয়ে শরীরটা মুচড়ে এক পাক ঘুরল রানা, তা না হলে লাশটা ওর ঘাড়ে এসে পড়ত।

ইতিমধ্যে মঞ্চের আগুন চার-পাঁচ জায়গায় শামিয়ানাকে ধরে ফেলেছে, লালচে আভায় ভেসে যাচ্ছে চারদিক। মিছিলটার পিছু নিয়ে মঞ্চের পিছনে, ফাঁকা চত্বরে চলে এলো রানা। প্রায় শ'খানেক হিংস্র লোক তিন দিক থেকে ধাওয়া করছে ওকে,

তাদের রণহুংকারে গায়ের পশম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। গুলি করে দু'তিনজনকে ফেলে দিল ও, কিন্তু ফল হলো উল্টো। সঙ্গীদের মৃত্যু বাকি লোকগুলোর মধ্যে ভীতি নয়, বরং প্রতিশোধের স্পৃহাই বাড়িয়ে তুলল। মরিয়া হয়ে রানার ওপর লাফ দেয়ার জন্যে ছুটে আসছে তারা।

পিস্তলের চেম্বার খালি হয়ে গেল। রিলোড করতে হবে, কিন্তু সময় নেই। এলোপাতাড়ি ছুরি চালিয়ে কয়েকজনকে ঠেকাল রানা, বেল্টে আটকানো পাউচ থেকে একটা গ্রেনেড নিল হাতে।

ভোজবাজির মত রানার চারপাশ ফাঁকা হয়ে গেল। গ্রেনেডটা চিনতে পেরেছে ওরা, তাই দূরে সরে গেছে। কিন্তু মাত্র কয়েক সেকেন্ড পরই আবার ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে দেখা গেল তাদেরকে, প্রত্যেকে নিজ নিজ তলোয়ার মাথার ওপর তুলে রেখেছে।

ঘুরেই ছুটল রানা, এবং হতভম্ব হয়ে দেখল চন্দ্রাকে নিয়ে মিছিলের মূল অংশটা চত্বরের কোথাও নেই। জায়গাটা বিশাল, একেবারে ফাঁকা পড়ে আছে।

বিস্ময়ে থমকে দাঁড়ানোরও সময় নেই রানার, মারমার-কাটকাট গর্জন তুলে বাকি তিন দিক থেকে ধেয়ে আসছে হিংস্র জনস্রোত, নাগালের মধ্যে পেলে স্রেফ টেনে-হিঁচড়েই ছিঁড়ে ফেলবে।

প্রাণপণে ছুটল রানা। পিস্তলটা রিলোড করছে। একটু পরই চত্বরের মেঝেতে লোহার একটা ঢাকনি দেখতে পেল। চন্দ্রার গায়েব হবার রহস্য বোঝা যাচ্ছে। চত্বরের নিচে টানেল আছে, নিশ্চয়ই কেল্লায় পৌঁছানো যায়, লোহার ঢাকনি সেই টানেলে নামার পথ। ঢাকনিটা বেশ বড়, ধরার জন্যে হাতলও আছে। কিন্তু দু'হাতে ধরে টেনেও নড়ানো গেল না। বোঝাই যায়, ভেতর থেকে কোনভাবে আটকানো আছে।

মুখোশের ভেতর দরদর করে ঘামছে রানা। নিঃশ্বাস ফেলছে

ফোঁস ফোঁস করে। হাতল ছেড়ে দিয়ে ধাবমান শত্রুদের দিকে তাকাল ও। হাত উঁচু করে গ্রেনেডটা দেখাল তাদের। একটু থমকাল তিন পাশের ভিড়, কিন্তু তা মাত্র এক সেকেন্ডের জন্যে, পরমুহূর্তে আরও দ্রুত হলো ছোটার গতি।

আবার ছুটতে যাবে, ঢাকনির একটা খাঁজে পা বেধে যাওয়ায় দড়াম করে আছাড় খেলো রানা। উপুড় হয়ে পড়েছে, বাঁ হাতের মুঠোয় ভরা গ্রেনেডটা চাপা পড়েছে শরীরের নিচে; ডান হাত থেকে ছিটকে পড়েছে ওয়ালথার, হাত বাড়ালেও সেটার নাগাল পাবে কি না সন্দেহ। পাকা চত্বরে কপালটা বাড়ি খাওয়ায় তীব্র যন্ত্রণায় জ্ঞান হারাবার অবস্থা হয়েছে ওর, চোখে ঝাপসা দেখছে।

এই এক মোক্ষম সুযোগ তলোয়ারের এক কোপে রানার মাথাটা শরীর থেকে আলাদা করার। কিন্তু শয়তান পূজারীরা হঠাৎ করে এভাবে ওর আছাড় খেয়ে পড়াটাকে সন্দেহের চোখে দেখছে, তিনদিকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সবাই।

রানা হাত বাড়িয়ে পিস্তলটা ছুঁতে গিয়ে পারল না। চত্বরের পাকা মেঝেতে মুখের একটা পাশ ঠেকে আছে ওর। বুঝতে পারছে, ভাগ্য গুণে মূল্যবান কয়েকটা সেকেন্ড পাওয়া গেছে, কাজে লাগাতে না পারলে আজরাইলকে আজ ফেরত পাঠানো সম্ভব নয়। চিৎ হতে চাইছে ও, তাতে শরীরের নিচে থেকে গ্রেনেড ধরা বাম হাতটা মুক্ত হবে।

এই সময় উড়ে এলো প্রথম তলোয়ারটা। ঠন্ করে শব্দ হলো, চত্বরের পাথুরে মেঝেতে ডগা দিয়ে পড়েছে, পড়ার পর পরপর কয়েকটা ডিগবাজি খেয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে থাকল পাঁচ হাত দূরে। একটুর জন্যে রানার গায়ে গাঁথেনি, লক্ষ করে মজা পেয়ে গেল শয়তানের চেলারা, দেখাদেখি অনেকেই যে-যার তলোয়ার রানাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারছে।

এ এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। এক সঙ্গে কয়েকটা করে ধারাল তলোয়ার শূন্যে পাক খেতে খেতে ছুটে আসছে। সময় মত চিৎ

হতে পারায় অন্তত দুটো তলোয়ারকে এড়াতে পারল রানা। পাথরের সঙ্গে ইস্পাতের সংঘর্ষ ও ঘষা খাওয়ার কর্কশ শব্দ অসুস্থ করে তুলল ওকে। রানার দু'পাশে এসে পড়ছে ওগুলো, যে-কোনটা গভীরভাবে গেঁথে যেতে পারে শরীরে। গড়ান দিয়ে দূরে সরে যাবার চেষ্টা করছে ও। হাতে পিস্তলটা চলে আসায় পর পর দুটো গুলিও করল।

গুলি খেয়ে কয়েকজন আহত হতে হিংস্র খুনীরা আরও মরিয়া হয়ে উঠল। হঠাৎ করেই যেন মৃত্যুকেও আর ভয় পাচ্ছে না তারা, ঝড় তুলে ছুটে আসছে।

পিন খুলে হাতের গ্রেনেডটা ছুঁড়ল রানা, পাউচ থেকে বাকি দুটোও বের করল। বিস্ফোরণের পর সেদিকে তাকাল না, লাফ দিয়ে সিধে হয়েই ছুটল আবার। তখনই প্রাণ বাঁচানোর উজ্জ্বল সম্ভাবনাটা চোখের সামনে ঝুলতে দেখল ও।

পাকা চত্বরের পর ঝোপ-ঝাড় দেখা যাচ্ছে। তারপরই উঁচু একটা ছোট মাঠ। সেই মাঠের এক পাশে পার্ক করা রয়েছে একজোড়া ভ্যান। রোলসরয়েস, মার্সিডিজ ও টয়োটাগুলোর একটাকেও কোথাও দেখছে না রানা। ওর মনে পড়ল, এই ভ্যানে চড়েই শাহ বকশীর ইরানী দেহরক্ষীরা নরবলি অনুষ্ঠানে এসেছিল।

হাতের গ্রেনেড দুটো ছোঁড়ার জন্যে আরও দু'বার পিছন দিকে তাকাল রানা। প্রথম বিস্ফোরণে অন্তত বিশ-পঁচিশজন হতাহত হয়েছে। কিন্তু নতুন লোকজন এসে দলটাকে প্রতি মুহূর্তে আরও বড় করছে। তবে রানাকে আবার গ্রেনেড ছুঁড়তে দেখে এবার অনেকেই খিঁচে উল্টো দিকে দৌড় দিল।

ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর ঢুকে পড়ল রানা। ওলগা আর মিখাইলকে লাফ দিয়ে টপকাল—দু'জনেরই জ্ঞান ফিরে আসছে, ফলে নড়ছে একটু একটু।

হাঁপাতে হাঁপাতে উঁচু মাঠে এসে উঠল রানা। শাহ বকশীর

ইরানী দেহরক্ষীরা এখনও সবাই মঞ্চের ওদিকে, এদিকে এমনকি তারা কোন পাহারাও বসায়নি।

প্রথম ভ্যানটায় চড়ে ইগনিশনেই চাবি পেল রানা। স্টার্ট দিয়ে ছেড়ে দিল গাড়ি। আশ্চর্য, কত সহজে পালাতে পারছে ও! শয়তানের চেলাগুলো, যারা ওকে ধাওয়া করছিল, গ্রেনেড হামলার ভয়ে অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে।

ইঁট বিছানো চওড়া রাস্তা ধরে ছুটছে ভ্যান। যত দূর দেখা যাচ্ছে, সোজা পশ্চিম দিকে চলে গেছে। এই রাস্তাই যে ওকে মিসাইল ঘাঁটিতে পৌঁছে দেবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আন্দাজ করল আট থেকে বারো মাইল দূরে হবে সেটা।

মিসাইল ঘাঁটিতে প্রহরার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই খুব কড়া, বিশেষ করে ওখানে যখন নিউক্লিয়ার ওঅরহেড আছে। নিশ্ছিদ্র সিকিউরিটি সিস্টেমকে ফাঁকি দিয়ে একা হয়তো রানা কিছুই করতে পারবে না, তবু ভাগ্য পরীক্ষার একটা সুযোগ যখন পেয়েছে, সেটা কাজে লাগিয়ে দেখতে চায়। এমনও তো হতে পারে যে শাহ বকশীর আয়োজিত নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোথাও ছোট্ট একটা ত্রুটি আছে, সেই ফাঁক গলে আন্ডারগ্রাউন্ড সাইলোয় রানার পক্ষে ঢোকা সম্ভব।

পাঁচ মাইল পেরুবার পর রাস্তার ডান দিকে, অনেকটা দূরে, বৈদ্যুতিক আলো দেখা গেল। রাস্তাও এখানে দু'ভাগ হয়ে গেছে। ভ্যান ঘুরিয়ে সেদিকে যেতে ইচ্ছে করল রানার, কারণ তারা জ্বলা আকাশের গায়ে কালো ও লম্বা যে কাঠামোটা দেখতে পাচ্ছে সেটাকে এয়ারপোর্ট হ্যাঙ্গার বলে মনে হচ্ছে। তবে ইচ্ছেটাকে রানা প্রশ্রয় দিল না। আগে দেখা দরকার মিসাইল ঘাঁটিতে ঢোকা যায় কিনা।

এরপর এক মিনিটও পার হয়নি, নাক বরাবর সামনে দীর্ঘ একটা কনভয় দেখতে পেল রানা। পাঁচ-ছ'টা বড় ভ্যান ও আট-দশটা জীপ, হেডলাইট জ্বেলে দ্রুতবেগে ছুটে আসছে। কি ঘটেছে

আন্দাজ করতে অসুবিধে হলো না। টু-ওয়ে রেডিও বা মোবাইল ফোন ব্যবহার করে মিসাইল ঘাঁটিতে কেউ খবর পাঠিয়েছে যে শাহ্ বকশীকে হত্যা করার চেষ্টা হয়েছে, তার নিরাপত্তা এখনও হুমকির মুখে। ব্যস, এই খবর শোনামাত্র শাহ্ বকশীর ব্যক্তিগত বাহিনী কনভয় নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। রানা সিদ্ধান্ত নিল, এদের সামনে পড়াটা নেহাতই বোকামি হবে। প্রাণে বেঁচে থাকলে মিসাইল ঘাঁটি ধ্বংস করার সুযোগ পরেও পাওয়া যাবে। ভ্যান ঘুরিয়ে নিল ও, বাঁক ঘুরে আকাশের গায়ে ঝুলে থাকা হ্যাঙ্গারের দিকে ছুটল।

রাস্তার শেষ মাথায় ঠিকই একটা এয়ারস্ট্রিপ পেয়ে গেল রানা। হ্যাঙ্গারের সামনে পাশাপাশি তিনটে হেলিকপ্টার দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছোট আকারের আট-দশটা ফাইটার জেটও দেখা গেল, হ্যাঙ্গারের ডান পাশে এক লাইনে পার্ক করা।

সরাসরি হেলিকপ্টারগুলোর সামনে ভ্যান থামাল রানা।

হ্যাঙ্গার থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো দু'জন গার্ড, পরনে শয়তান উপাসকদের সেই সাদা-কালো কাপড়, হাতে একটা করে সাব-মেশিনগান। ভ্যান থেকে কেউ নামছে না দেখে সতর্ক হয়ে গেল তারা, অস্ত্র বাগিয়ে ধরে এক পা এক পা করে এগোচ্ছে।

ভ্যান থেকে আগেই নেমে পড়েছে রানা, লোকগুলোর পিছনে বেরিয়ে এলো একটা হেলিকপ্টারের আড়াল থেকে, হাতে ওয়ালথার।

আত্মসমর্পণের নির্দেশ গ্রাহ্য করল না, ফলে শয়তানের দুই চেলাকে বেঘোরে প্রাণ হারাতে হলো। গুলির শব্দ শুনেও আর কেউ আসছে না, তাড়াতাড়ি একটা কপ্টারে চড়ে প্রথমেই ফুয়েল গজ চেক করল রানা। ট্যাংক পুরোপুরি ভরা নয়, তবে যা আছে তাতে আশা করা যায় ভারতীয় মেইনল্যান্ডে পৌঁছতে সমস্যা হবে না। মুখোশটা খুলে ফেলে দিল ও, দ্রুত হাতে পরে নিল হেডসেট।

জোড়া হেডলাইট জ্বেলে দ্বিতীয় ভ্যানটা এয়ারস্ট্রিপে ঢুকছে, এই সময় কপ্টার নিয়ে আকাশে উঠল রানা। দ্বীপটাকে একবার চক্কর দেয়ার সময় কেল্লা ও কেল্লার সামনের চত্বরের ওপর দিয়ে উড়ে এলো, দেখল শামিয়ানার আগুন এখনও নেভেনি।

কপ্টারের মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে পুব দিকে রওনা হলো রানা, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেইনল্যান্ডে ফিরতে হবে ওকে।

শান্ত হবার সুযোগ পেয়ে প্রথমেই রানা ভাবল, ও কি তাহলে চন্দ্রা দেবযানিকে ফেলে পালাচ্ছে?

হ্যাঁ-পালাবার সময় ব্যর্থ মিশনের দায়ভারও জগদ্দল পাথরের মত বুকে চেপে বসে আছে। তবে হার মানা বা হাল ছাড়ার কথা ভুলেও ভাবছে না রানা। জানে আবার ওকে চরসে ফিরতে হবে-চন্দ্রাকে উদ্ধার করার জন্যে, সাঈদ শাকিরের ওপর নির্যাতনের বদলা নিতে, ধর্ম-ব্যবসায়ী শাহ বকশীকে মেরে তাড়াবার জন্যে আর ভারতীয় সমরবিদরা খেয়ালবশত যদি কোন বিপজ্জনক নিউক্লিয়ার ওঅরহেড বাংলাদেশের দিকে তাক করিয়ে রাখে সেটাকে অকেজো করার জন্যে।

রাডারকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে রানার কপ্টার ভারত মহাসাগর থেকে মাত্র কয়েক গজ ওপর দিয়ে ছুটছে। এখন যদি চরসের জেট ফাইটারগুলো ধাওয়া করে, কিংবা শাহ বকশীর গানবোট থেকে মিসাইল ছোঁড়া হয়, ওর প্রাণ নিয়ে পালানোর সম্ভাবনা শূন্য।

তবে সে-ধরনের কিছুই ঘটল না। প্রায় তিনশো কিলোমিটার নির্বিঘ্নে পার হয়ে এলো রানা। ঘড়িতে বারোটা বেজে বিশ মিনিট। সমস্যা দেখা দিল অন্য দিক থেকে। ট্যাংকে খুব অল্প ফুয়েল আছে, খুব বেশি হলে আর বিশ থেকে ত্রিশ কিলোমিটার যাওয়া যাবে। কিন্তু ভারতীয় মেইনল্যান্ড এখনও একশো কিলোমিটার দূরে।

এটা একটা টু-সিটার কপ্টার। সার্চ করে হতাশ হলো

রানা–ক্যান ভর্তি অতিরিক্ত ফুয়েল নেই, নেই ইমার্জেন্সী প্যাক বা রাবারের কোন ভেলা।

কপ্টার নিয়ে বেশ খানিক ওপরে উঠল রানা। এখন ওকে বাঁচাতে পারে গভীর সাগরে মাছ ধরতে আসা জেলেরা। তবে তাদের সাহায্য পেতে হলে প্রথমে তাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে।

জেলেদের নৌকা সাধারণত ঝাঁক বেঁধে মাছ ধরে। প্রতিটি নৌকায় হ্যাজাক বাতি বা মশাল থাকে।

মিনিট দশেকের মধ্যে এরকম একদল জেলেকে দেখতে পেল রানা। অদ্ভুত ব্যাপারই বলতে হবে. অন্তত রানার তাই মনে হলো, হেলিকপ্টারটাকে আকাশে দেখামাত্র মাছ ধরার নৌকাগুলো এমন আরচণ শুরু করল, জেলেরা যেন জানে ওদের কাছাকাছি ডোবার জন্যেই ছুটে আসছে ওটা। তা না হলে বিশাল একটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা প্রায় একশো নৌকা দ্রুত একধারে জড়ো হতে চেষ্টা করবে কেন? রানা অবশ্য এর কারণ আন্দাজ করল–এঞ্জিনের আওয়াজ শুনে জেলেরা ধরে ফেলেছে ফুয়েল নেই. পাইলট ইজেক্ট করতে বাধ্য হবে।

আসলেও বাধ্য হলো রানা। প্যারাশুট নিয়ে ও পানিতে পড়ার দশ সেকেন্ড পর কপ্টারটা গোত্তা খেয়ে পানিতে পড়েই ডুবে গেল, কিছু বুদ্বুদ ছাড়া আর কিছু দেখার থাকল না।

রানা ভেবেছিল ওকে পানি থেকে উদ্ধার করার জন্যে জেলেদের মধ্যে তুমুল একটা প্রতিযোগিতা শুরু হবে। কিন্তু হতাশ হতে হলো ওকে। অতগুলো নৌকা, অথচ এঞ্জিনের ভট ভট আওয়াজ তুলে দ্রুত এগিয়ে এলো মাত্র একটা। তাতে প্রকাণ্ডদেহী দু'জন মাত্র জেলে। বাপ-বেটা বলে পরিচয় দিল। নৌকায় তোলার পর শুকনো ধুতি আর ফতুয়া পরতে দিল। ভাষাটা হিন্দী। ছেলে জানাল, জেলে নৌকার এই ঝাঁকটার নেতৃত্ব দিচ্ছে তার বাবা–উদ্ধার কাজে তাই কেউ নাক গলাতে আসেনি।

ছেলে থামতে বাপ জানতে চাইল, রানা কি চরস দ্বীপ থেকে আসছে? ওর কি খুব বিপদ? ওর পিছু নিয়ে কেউ আসছে না তো? ওই দ্বীপ সম্পর্কে এত সব গুজব শুনছে তারা…।

সত্যি কথাই বলল রানা। গোপন একটা কাজে ভারত সরকারকে সাহায্য করছে ও। একদল দুস্কৃতকারী চরস দ্বীপ দখল করে নিয়েছে। হ্যাঁ, ওই দ্বীপ থেকেই পালিয়ে আসছে ও। ওর কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে, যে-সব তথ্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে। কাজেই জেলে সর্দার এখন যদি ওকে এমন কোথাও পৌঁছে দেয় যেখানে টেলিফোন আছে…।

রানাকে থামিয়ে দিয়ে জেলে সর্দার বলল, 'আমার ধারণা আপনি কোন শহরে উঠতে চান না। কারণ শহরে দুস্কৃতকারীদের চর আপনাকে খুঁজবে।'

বিস্মিত হয়ে রানা বলল, 'আপনি দারুণ ইন্টেলিজেন্ট, সর্দারজী। ঠিক ধরেছেন।'

'সমুদ্দুর আপনাকে রেহাই দিল—আপনি বহুদিন বাঁচবেন, বাবুজী,' খুশি হয়ে বলল জেলে সর্দার। 'কোন চিন্তা করবেন না। আপনাকে আমি সুরাট আর বরোদার মাঝখানে গভীর জঙ্গলে নামিয়ে দেব, নর্মদা নদীর তীরে। আমার বেটা পথ দেখিয়ে দেবে। কাঠ-চোরাদের একটা লরিও পেয়ে যেতে পারেন। ছয় মাইল দূরে অ্যাসিস্ট্যান্ট ফরেস্টারের বাংলো। ওদিকের জঙ্গলে বলতে গেলে ওই একটাই বাড়ি। পুলিস স্টেশন, রেল স্টেশন, জেলখানা ইত্যাদি আছে বটে, কিন্তু সে-সব আরও অনেক দূরে। ওই বাংলোয় আপনি টেলিফোন পাবেন, বাবুজী।'

আট

শয়তানের দালাল শাহ বকশী তার তৃতীয় বেগম নাদিরাকে নিয়ে মঞ্চ থেকে গায়েব হয়ে গেল কিভাবে? আসলে ব্যাপারটা কিছুই নয়, কেল্লার সামনের ওই বিশাল চত্বরের নিচে টানেল বা সুড়ঙ্গ আছে, সেই টানেলের অসংখ্য মুখের একটার ওপর তৈরি করা হয়েছে মঞ্চটা। গ্রেনেড হামলা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে কাঠের ধাপ বেয়ে চত্বরের মেঝেতে পৌঁছাল তারা, তারপর লোহার ঢাকনি তুলে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো টানেলে, পথ দেখাচ্ছে শাহ বকশীর বিশ্বস্ত ও অনুগত একদল ইরানী দেহরক্ষী। আর নাদিরার পিছনে সেই কাফ্রী লোকটা তো আছেই।

টানেল ধরে কেল্লায় পৌঁছানোর পথে কাফ্রী লোকটার সামনেই স্ত্রীকে তিরস্কার করতে ছাড়ল না শাহ বকশী।

বিদেশী স্পাইরা চরসে আসছে জেনেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করাটা বোকামি ও অন্যায় হয়েছে নাদিরার, অভিযোগ করল শাহ বকশী। শত্রুকে কখনও ছোট করে দেখতে নেই—আজ অল্পের জন্যে প্রাণে রক্ষা পেয়ে বারবার এই কথাটাই ফিরে আসছে তার মনে। খেদ প্রকাশ করে আরও বলল—অতি বিশ্বস্ত ডানহাত খিজির পাশা উপস্থিত থাকলে আজ তার প্রাণের ওপর হামলাই হতে পারত না।

স্বামীর তিরস্কার শুনে নাদিরার কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। সে শুধু একবার বলল, 'আমি ভাল মত চিন্তা-ভাবনা না করে কোন

কাজ করি না, শাহ সাহেব। কেন কি করেছি, সে-সব আপনাকে পরে বুঝিয়ে বলা যাবে। এই মুহূর্তে আপনার সেবা ও বিশ্রাম দরকার।'

কেল্লার তৃতীয়তলায় পৌঁছে হাততালি দিয়ে কয়েকজন দাসী আর হারেমে খবর পাঠিয়ে শাহ বকশীর কয়েকজন উপপত্নীকে ডেকে নিল নাদিরা। তাদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে নিজের খাস কামরায় ঢুকল সে। দরজা বন্ধ করে ব্যাগ থেকে মোবাইল ফোন বের করল। মঞ্চ থেকে নেমে কেল্লায় পৌঁছাতে পঁচিশ মিনিট লেগেছে তাদের। এতক্ষণে নিশ্চয়ই চন্দ্রা আর রানা ধরা পড়েছে। নিশ্চিত হবার জন্যেই নিজের বিশ্বস্ত এক লোককে ফোন করল সে।

এরপর দ্রুত শাওয়ার সারল নাদিরা। হাতব্যাগটা নিয়ে ফিরে এলো শাহ বকশীর খাস কামরায়। দাসী ও উপপত্নীরা কেউ তার পা টিপছে, কেউ চুলে বিলি কাটছে, আবার কেউ বা পেটে হাত বুলাচ্ছে। আধ বোজা চোখে আরাম করছে শয়তানের স্বঘোষিত দালাল। নাদিরার আগমন টের পেয়ে চোখ দুটো পুরোপুরি মেলল সে। বলল, 'বেগম, বড় হতাশ ও ক্লান্ত বোধ করছি।' উঁচু পালঙ্কের ওপর বিছানাটা টকটকে লাল মখমলে ঢাকা, তার ওপর হাত ও পা যতটা সম্ভব ছড়িয়ে দিল। 'তোমার নিজ হাতে বাটা সিদ্ধি পাতার এক গ্লাস শরবত খেয়ে এখন আমি ঘুমাতে চাই। তোমার যদি ইচ্ছা হয়, ওই শরবতে খানিকটা জহর ঢেলে দিয়ো, সেই ঘুম আর যাতে না ভাঙে।' শয়তানের প্রতিনিধি মিটিমিটি হাসছে।

খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে দূরে তাকিয়ে রয়েছে নাদিরা, চোখে একজোড়া নাইটগ্লাস। চত্বর জোড়া বিশাল শামিয়ানায় দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে দেখল সে। ফোকাস অ্যাডজাস্ট করার পর ছুটন্ত, আহত ও নিহত লোকজনকে আলাদাভাবে চিনতে পারছে। চন্দ্রা দেবযানি অনেক আগেই ধরা পড়েছে, শাহ

বকশীর শিষ্যরা কেল্লায় বন্দী করে রেখেছে তাকে, কিন্তু মাসুদ রানাকে কোথাও সে দেখতে পেল না।

মিষ্টি ঝঙ্কার তুলে হাসতে হাসতে জানালার সামনে থেকে পালঙ্কের পাশে এসে দাঁড়াল নাদিরা। 'একবার না বলেছি আপনাকে, এমন অলক্ষুণে কথা কখনও বলবেন না। এ আপনার কৌতুক, নাকি সত্যিকার অবিশ্বাস, বুঝি না। আপনার জন্যে কি না করছি, তারপরও কেন যে আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না, তা একমাত্র আপনার প্রভু শয়তানই বলতে পারবে। ভেবে দেখুন, ভারত সামরিক দিক থেকে কত বড় একটা শক্তি, অথচ চরস দ্বীপটা তারা পুনর্দখল করতে পারছে না। আপনিই বলুন, কৃতিত্বটা কার?

'গত কয়েক বছর ধরে একজন দু'জন করে যাদেরকে আপনার কাছে আমি ডেকে এনেছি, যাদেরকে আপনি আপনার নতুন ধর্ম দাঁড়িপাল্লায় দীক্ষা দিয়েছেন, তারাই তো ভারতীয় স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীকে প্রায় অকেজো করে রেখেছে...'

'বেগম, জানের জান—তোমার এত ক্ষমতা, এটাই তো আমার ভয়ের কারণ। গুজব শুনছি, ওরা নাকি বিদেশী কোন এক রাষ্ট্রের স্পাই, তোমার কথায় ওঠে আর বসে, কারণ তুমিই নাকি ওদের বস্। এখন, ভেবে দেখো, আমার চেয়ে তোমার ক্ষমতা যদি বেশি হয়ে যায়, আমার মত একজন বৃদ্ধকে তখন তোমার ভাল না-ও লাগতে পারে...'

হেসে উঠে শাহ বকশীকে থামিয়ে দিল নাদিরা। 'আপনি ভুল করছেন, প্রিয় স্বামী। আপনার চেয়ে আমার ক্ষমতা নতুন করে বেশি হবার প্রশ্ন ওঠে না, কারণ আগে থেকেই বেশি ছিল। আরেকটা ভুল হলো, আমি ওদের বস্ নই, ওরাও বিদেশী স্পাই নয়,' ডাহা মিথ্যে কথা বলছে সে। 'দ্বিতীয়বার আপনি আমাকে বিয়েই তো করলেন আমার ওই বন্ধুরা ভারতীয় হামলা ঠেকাতে আপনাকে সাহায্য করবে, এই শর্তে।'

'শর্ত তুমিও একটা দিয়েছিলে, আমাকে সেটা পূরণও করতে হয়েছে। যেখান থেকে যত চাঁদা পাচ্ছি, সব তুমি সামলে রাখছ। সুইস ব্যাংকে নতুন যে অ্যাকাউন্টটা করেছি, তাতে নমিনি হিসেবে তোমার নাম আছে। সার্ক যদি সাত হাজার কোটি টাকা চাঁদা দেয়, ওই অ্যাকাউন্টেই তা জমা হবে। আর আমি মারা গেলে বা খুন হলে ওই টাকা সব তোমার হয়ে যাবে। তোমার বয়স খুবই কম, অস্থিরতায় ভোগো, তাই ভয় পাই...'

'এ-সবই আপনার অমূলক ভয়, জনাব,' বলল নাদিরা, একজন দাসীর কাছ থেকে সিদ্ধির গ্লাস নিয়ে স্বামীর হাতে ধরিয়ে দিল। 'আপনার বিশ্বস্ত ইরানী দেহরক্ষীরা সারাক্ষণ যেভাবে পাহারা দিচ্ছে, দুনিয়ার কেউ আপনাকে ছুঁতে পারবে না। স্ত্রী হবার সুবাদে আপনাকে কতল করার সুযোগ আমার আছে বটে, কিন্তু তারপর? আপনার দেহরক্ষীরা এই কামরা থেকে আমাকে পালাতে দেবে?'

'শুনতে পাচ্ছি, আজকাল ওরাও নাকি আমার চেয়ে তোমাকেই বেশি পছন্দ করে।' শাহ্ বকশী একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল। 'এ-ও শুনছি যে আমার ইরানী ভক্তদের ভারতীয় আর্মির ইউনিফর্ম পরাটা তোমার নাকি খুবই অপছন্দ।'

'হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন,' বলল নাদিরা। 'ওরা নিজেরাই তো আলাদা একটা বাহিনী, অন্য আরেকটা বাহিনীর ইউনিফর্ম পরবে কোন্ দুঃখে? ওদের নিজস্ব পরিচয় থাকা চাই, সেজন্যে প্রথমেই দরকার আলাদা ড্রেস। আমি ওদের জন্যে অর্ডার দিয়ে জিনসের ট্রাউজার আর চামড়ার জ্যাকেট আনাচ্ছি।'

'কিন্তু তুমি বোধহয় ভুলে গেছ যে ওদেরকে ইন্ডিয়ান আর্মির ইউনিফর্ম পরাবার পিছনে আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল।' শাহ বকশী গম্ভীর ও অসন্তুষ্ট।

'না, ভুলিনি,' বলল নাদিরা। 'আসবে না, তবু আপনার ভয় হঠাৎ ভারতীয় বাহিনী চরসে আসতে পারে। যদি আসে, আর

তখন যদি ইরানীরা ইন্ডিয়ান আর্মির ইউনিফর্ম পরে থাকে, তাহলে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে, এই তো? জনাব শাহ বকশী, ইউনিফর্মগুলো খুলে যত্ন করে রেখে দিলেই হবে, প্রয়োজনের সময় যাতে আবার পরা যায়। কেল্লায় বহু খালি ঘর পড়ে আছে।'

'তোমার আসল মতলব যে কি, তা একমাত্র মহান শয়তানই বলতে পারবেন।'

এবার একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বলল নাদিরা, 'তা শয়তানকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিলেই তো পারেন, আপনি না তার প্রেরিত পুরুষ!'

'এ-প্রসঙ্গে আরেকটা দুঃখের কথা মনে পড়ে গেল,' দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলল শাহ বকশী। 'তুমি আমার বেগম হওয়া সত্ত্বেও শয়তানের কাছে আত্মসমর্পণ করোনি।'

'মুসলমানের ঘরে জন্ম হলেও আমি ইসলাম বা অন্য কোন ধর্ম মানি না। বিয়ের আগেই এ-কথা আপনাকে আমি জানিয়ে দিয়েছিলাম। শয়তান উপাসনার আয়োজন, নরবলি ইত্যাদি বিষয়ে অংশগ্রহণ করি আপনার ইমেজ বাড়াবার জন্যে, কারণ আপনার ইমেজকে পুঁজি করে বিরাট একটা স্বার্থ উদ্ধার করব আমরা।'

'এবার তোমার প্রিয় জেনারেল গোরস্কিকে নিয়ে দু'একটা কথা বলি,' প্রসঙ্গ বদলে বলল শাহ বকশী। 'খেয়াল করেছ, বিপদ আসছে টের পেয়ে স্টেজ থেকে কেমন নিজের গা বাঁচিয়ে পালিয়ে গেল?'

পালঙ্ক থেকে নেমে আবার খোলা জানালার সামনে এসে দাঁড়াল নাদিরা। হৈ-চৈ ও ছুটোছুটি ইতিমধ্যে প্রায় থেমে গেছে। আগুনও প্রায় নিভিয়ে ফেলা হয়েছে। মাসুদ রানা ধরা পড়েছে, নিহত হয়েছে, নাকি এখনও পালাচ্ছে, কিছুই বোঝা গেল না। নাইটগ্লাসে তার ছায়া পর্যন্ত ধরা পড়ছে না।

কেল্লার ওপর দিয়ে একটা হেলিকপ্টার উড়ে যাচ্ছে, এঞ্জিনের

আওয়াজ শুনে ভুরু কোঁচকাল নাদিরা। সন্দেহ নেই, ওদেরই একটা হেলিকপ্টার ওটা। আশ্চর্য, অনুমতি না নিয়ে কে চালাচ্ছে! রাশিয়ানদের নিষেধ করা আছে, তারা এ কাজ করতে সাহস পাবে না। তাহলে?

'কি, বেগম সাহেবা, চুপ করে আছ কেন?' একটু তীক্ষ্ণ হলো শাহ বকশীর গলা। 'গোরস্কির বিরুদ্ধে কিছু বললেই তোমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। প্রাণে বাঁচিয়েছ, এটাই কি যথেষ্ট নয়? তার সঙ্গে এত খাতির জমাবার কি দরকার? রাশিয়ানরা কিন্তু চিরকালই বেঈমান–ওদেরকে নিয়ে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাবার কথা ভেবে থাকলে ভুলে যাও। টেরও পাবে না কখন তোমার পিঠে ছুরি মেরে বসবে!'

জানালার সামনে থেকে আবার স্বামীর কাছে ফিরে এলো নাদিরা। এবার তাকে গম্ভীর দেখাচ্ছে। 'ষড়যন্ত্র সত্যি একটা পাকাতে চাই, জনাব বকশী, তবে সেটা আপনাকে নিয়ে জেনারেল গোরস্কির বিরুদ্ধে।'

'অ্যাঁ!' শাহ বকশীর বিস্ময় নির্ভেজাল। 'বলো কি!'

'ঠিকই বলছি।' নাদিরার মুখের চেহারা কঠিন হলো। 'আপনাকে একটা প্রশ্ন করি। গোরস্কি আর তার লোকজনকে বাঁচিয়ে রাখার দরকার ছিল মিসাইল অপারেটিং টেকনিক আর নিউক্লিয়ার ওঅরহেড অ্যাকটিভেট করার সিকোয়েন্স জেনে নেয়ার জন্যে, ঠিক?'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে মাথা ঝাঁকাল শাহ বকশী। 'তা ঠিক, কিন্তু আমার লোকজনকে কিছুই সে শেখাচ্ছে না...'

'কেন, আমি আপনার কেউ নই?' সহাস্যে কটাক্ষ হানল নাদিরা, পালঙ্কে উঠে স্বামীর সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হলো, কথা বলছে ইংরেজিতে, দাসী ও উপপত্নীরা যাতে বুঝতে না পারে। 'আপনার ইরানী ভক্তদের সন্দেহের চোখে দেখে জেনারেল গোরস্কি, বিশ্বাস করতে রাজি নয়। কিন্তু আমার জন্যে সে জান দিতেও প্রস্তুত। যা

বলি তাই শোনো।'

বিছানার ওপর ঝট করে উঠে বসল শাহ বকশী। 'সত্যি বলছ, বেগম? তুমি সব শিখে নিয়েছ?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল নাদিরা, মুখটা বাড়িয়ে শাহ বকশীর ঠোঁটে আলতো করে ঠোঁট ঠেকাল। 'জ্বী, জাঁহাপনা, সব আমি শিখে নিয়েছি।'

স্ত্রীর দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকাল শাহ-বকশী। 'এখন তাহলে কি করতে চাও তুমি?'

'গোরস্কির মতিগতি আমার বিশেষ ভাল ঠেকছে না,' বলল নাদিরা। 'স্টীলরুম থেকে রেডিও সেটটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে, এটা সে লক্ষ করেছে। শুধু তাই নয়—কে সরাল, কেন সরাল, কিভাবে সেটা ফিরে পাবে, এরকম হাজারটা প্রশ্ন করছে আমাকে।'

'মতিগতি ভাল নয় মানে?' জিজ্ঞেস করল শাহ বকশী। 'তার উদ্দেশ্যটা কি?'

'তা শুনলে আপনি চমকে উঠবেন,' বলল নাদিরা। 'গোরস্কির একমাত্র ছেলে আফগান যুদ্ধে মারা গেছে। ছেলের মৃত্যুর জন্যে পাকিস্তানকে দায়ী করে সে। তাই প্রতিশোধ নিতে চায়। কি প্রতিশোধ? পঞ্চাশ ও একশো মেগাটনের তিনটে বোমা করাচী, লাহোর আর ইসলামাবাদে ফেলবে।'

'হুম! টাকা না পেলে আমরাও বোমা ফেলব—পাকিস্তানে, ভারতে, বাংলাদেশে। তবে ব্যক্তিগত আক্রোশবশত মানুষ মারার পক্ষপাতী আমি নই।'

'আমরা হলাম সুযোগ-সন্ধানী ব্যবসায়ী, ধর্মকে পুঁজি করে কিছু মালপানি কামিয়ে কেটে পড়ব...'

'এটা তুমি ঠিক বললে না...' প্রতিবাদ করল শাহ বকশী। 'আমি ধর্মকে নিয়ে ব্যবসা করছি, একথা ঠিক নয়। আমার একটাই দাবি ছিল, শয়তান উপাসকদের জন্যে আলাদা ও স্বাধীন

সার্বভৌম রাষ্ট্র। সাত হাজার কোটি টাকা আদায়ের বুদ্ধিটা তোমার মাথা থেকে বেরিয়েছে। তবে এখন আমি অস্বীকার করি না যে টাকার লোভ আমাকেও পেয়ে বসেনি!'

'এ-সব নিয়ে নিজেদের মধ্যে তর্ক করাটা স্রেফ সময় ও শক্তির অপচয়,' বলল নাদিরা। 'ঠিক আছে, আমারই ভুল হয়েছে–ধর্মকে আমরা পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করছি না। যা বলছিলাম, আমরা পাইকারী হত্যাকাণ্ড সমর্থন করতে পারি না। কাজেই সময় থাকতে জেনারেল গোরস্কিকে সরিয়ে ফেলতে চাই আমি।'

শাহ বকশীকে চিন্তিত দেখাল। 'কাজটা সহজ হবে না, নাদিরা। একা গোরস্কিকে খুন করা যাবে না, করলে সত্তরজনের সব ক'টাকে করতে হবে। কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব?'

'কেন, আপনার ইরানী দেহরক্ষীরা সংখ্যায় দুশো সত্তরজন নয়?' বলল নাদিরা, বৃদ্ধ স্বামীর জরাগ্রস্ত আঙুলগুলো হাতে নিয়ে খেলছে। 'তাছাড়াও রয়েছে হাজার তিনেক স্থানীয় ভক্ত। এরাই তো আড়াইশো ভারতীয় সৈন্য আর টেকনিশিয়ানকে কতল করেছে। এখন রাশিয়ানদের জবাই করতে বললে পারবে না কেন?'

গভীর চিন্তায় শাহ বকশীর ধবধবে সাদা মাথা নুয়ে পড়ল। ঝাড়া প্রায় ষাট সেকেন্ড পর মুখ তুলে নাদিরার দিকে তাকাল সে। 'ঠিক জানি না, তবে আশা করি মিনতি করলে এই কাজটা করার অনুমতি মহান শয়তান দেবেন আমাকে। তবে আমার বিশ্বস্ত ডান হাত খিজির পাশা জেলে না থেকে আমার পাশে থাকলে আজ বড় ভরসা পেতাম, নাদিরা। তা কবে?'

'কবে কি?'

'ওই বিধর্মী রাশিয়ানদের কবে তুমি জবাই করতে চাও?'

'এত তাড়াহুড়োর কি আছে!' নাদিরা একটু বিরক্ত। 'প্রথমে তো লম্বা সময় নিয়ে বসে নিখুঁত একটা প্ল্যান তৈরি করতে হবে।

তাছাড়া, আরেকটা কথা ভেবে দেখেছেন? রাশিয়ানরা না থাকলে একটা গ্যাপ তৈরি হবে। আমি অল্প বয়েসী একটা মেয়ে, আর আপনি প্রায় অথর্ব এক বুড়ো। আপনার দেহরক্ষীদের মধ্যে একটা দল আছে–যেমন শিক্ষিত, তেমনি অ্যামবিশাস। রাশিয়ানরা থাকায় এই মুহূর্তে তারা হয়তো আপনাকে বা আমাকে সরাবার কথা ভাবছে না। কিন্তু যখনই দেখবে বাধা দেয়ার মত কেউ নেই, সঙ্গে সঙ্গে বাকি দেহরক্ষীদের দলে টেনে নিয়ে বিদ্রোহ করে বসলে সাত হাজার কোটি টাকা তো হারাবই, প্রাণেও বাঁচব না।'

কয়েকবার নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল শাহ বকশী। 'তোমার কথায় যুক্তি আছে, বেগম। ভাবছি, তুমি আমার পাশে না থাকলে এত সব আমি সামলাতাম কিভাবে! তাহলে উপায়?'

মুচকি হেসে নাদিরা জিজ্ঞেস করল, 'এরপর আবার কখন আমাকে সন্দেহ করবেন? উপায়? উপায় আছে, শাহ সাহেব। ভাল কথা, শুধু গ্যাপ পূরণ করার জন্যে নয়, আরও একটা কারণে রিপ্লেসমেন্ট দরকার। গোরস্কি আমাকে মিসাইল ও নিউক্লিয়ার ওঅরহেড ছুঁড়তে ও ফাটাতে শিখিয়েছে ঠিকই, কিন্তু ওগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে কিছুই আমি জানি না। এই কাজের জন্যে এক্সপার্ট লোকজন আছে তার। কাজেই রাশিয়ানদের সরাবার আগে ওদের কাজগুলো করতে পারবে এমন কিছু লোককে চরসে আনতে হবে।'

'তেমন লোকজন চাইলেই কি পাব আমরা?'

হেসে উঠল নাদিরা। 'না, এ-ধরনের এক্সপার্ট লোকজন চাইলেই পাওয়া যায় না। তবে একজনের কথা ভাবছি, তাকে যদি দলে টানতে পারি, আমাদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।'

'কে সে?' শাহ বকশীর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো।

ঢাউস হাতব্যাগটা টেনে নিয়ে খুলল নাদিরা, ভেতর থেকে একটা পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ বের করে বাড়িয়ে দিল শাহ বকশীর দিকে। এই ফটো কয়েক বছর ধরে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে

বেড়াচ্ছে সে।

'কে এই লোক?' আবার জানতে চাইল শাহ বকশী।

'সংক্ষেপে, জনাব, এ হলো জীবন্ত এক কিংবদন্তী,' বলল নাদিরা, তার কণ্ঠস্বর আবেগে বা উত্তেজনায় কেঁপে গেল। 'শুনুন তাহলে!' এরপর একটানা দশ মিনিট চরিত্রটির মাহাত্ম্য বর্ণনা করল সে।

সব শুনে শাহ বকশী হাত থেকে ফেলে দিল ছবিটা। 'না, নাদিরা, না। আমি তোমাকে সাবধান করছি। খাল কেটে কুমির এনো না। তুমি যা বললে তার সিকি ভাগও যদি সত্য হয়, আমি বলব এই লোক আর কেয়ামত সমার্থক। তাকে ডাকলে আমাদের সব কিছু তছনছ করে দেবে সে।' হঠাৎ ভুরু কোঁচকাল। 'নাদিরা, তুমি আমাকে তার নাম বলোনি!'

'হ্যাঁ, তার শত্রুরা তাকে কেয়ামত বা মহাপ্রলয় বলেই জানে,' ধীরে ধীরে বলল নাদিরা। 'কিন্তু আমি তাকে শত্রু হিসেবে নয়, বন্ধু হিসেবে পেতে চাইছি। তার বন্ধুত্ব অর্জন করাটা সহজ কাজ নয়, সেজন্যে আপনার সাহায্য দরকার হবে আমার।'

'নাদিরা, তুমি আগুন নিয়ে খেলতে চাইছ...'

'প্লীজ, আপনি আমাকে বাধা দেবেন না!' আবেগে অধীর হয়ে উঠল নাদিরা। 'তার বন্ধুত্ব অর্জন আমার জীবনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ তাকে দলে টানতে পারলে আমাদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। গোরস্কিদের ব্যবস্থাও সে-ই করবে। তার একটা ইন্টেলিজেন্স ফার্ম আছে, সেই ফার্মের সার্ভিস পাব আমরা। মিসাইল আর নিউক্লিয়ার ডিভাইস রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে এক্সপার্ট লোকজনও যোগাড় করে দেবে সে। প্রয়োজনে যত খুশি মার্সেনারিও জড়ো করতে পারবে চরসে। প্লীজ...'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শাহ বকশী বলল, 'তোমার সঙ্গে আমি আসলে পারব না। বেশ, যা খুশি করো তুমি। তবে লোকটার নাম

জানতে পারলে খুশি হতাম। তারপর বলো কি ধরনের সাহায্য আমার কাছ থেকে তুমি আশা করছ।'

নাদিরা নিচু গলায় উচ্চারণ করল, 'মাসুদ রানা।'

'হোয়াট! কি বললে?' প্রচণ্ড রাগে বিস্ফোরিত হলো শাহ বকশী। 'এই খানিক আগে যে লোক গ্রেনেড মেরে আমাকে খুন করতে চেয়েছে, তুমি তার বন্ধুত্ব অর্জনের জন্যে আমার সাহায্য চাইছ? সত্যি তোমার স্পর্ধা আছে বটে, নাদিরা!'

নাদিরা শান্ত। 'আপনার থট প্রসেসে খুঁত আছে, তাই উত্তেজিত হয়ে আবোলতাবোল বকছেন। আমি যেভাবে বলি, গোটা ব্যাপারটাকে সেভাবে দেখুন। আপনি যে তখন বললেন মাসুদ রানা আর কেয়ামত সমার্থক, কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্যি। এবার ভাবুন, এই কেয়ামত আমাদের ওপর নেমে আসছে। বাঁচার কোন উপায় আছে? নেই। কেন নেই? এই জন্যে নেই যে ওই কেয়ামত আমাদের শত্রু, চরসে এসেছে ও আমাদের সর্বনাশ করার জন্যে। এখন তাহলে বাঁচার উপায়?

'বাঁচার উপায় একটাই, জনাব শাহ সাহেব। ওই কেয়ামতের বন্ধুত্ব অর্জন করা। কি, এবার কি আমার যুক্তি গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে?'

'যুক্তিতে তোমার সঙ্গে পারা মুশকিল,' শাহ বকশী স্বীকার করল। 'হ্যাঁ, এ-কথা ঠিক যে মাসুদ রানা আমাদেরকে ধ্বংস করতেই এসেছে। কিন্তু একটা মেয়েকে নিয়ে একা কি-ই বা সে করতে পারবে, শুনি? দেখো গিয়ে, আমার দেহরক্ষীরা তাকে ঝাঁঝরা করে ফেলে রেখেছে...'

হেসে ফেলল নাদিরা, বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেয়ামতের অবমূল্যায়ন করা হয়ে যাচ্ছে না? শুনুন, ওর সঙ্গিনী চন্দ্রা দেবযানি ভারতীয় স্পাই; আমি জানি সে ধরা পড়েছে। কিন্তু আমার ধারণা, আপনার ভক্তরা রানাকে ধরতে বা মারতে পারেনি–পারলে সুখবরটা এতক্ষণে পৌঁছে যেত।'

'এখনও ধরা না পড়লেও, এক সময় ধরা পড়তে বাধ্য,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল শাহ বকশী। 'দ্বীপ ছেড়ে পালাবে কোথায়?'

'হেলিকপ্টারের আওয়াজ শুনেও আপনি ব্যাপারটা ধরতে পারলেন না?' নাদিরাকে বিস্মিত দেখাল। 'আপনার বা আমার অনুমতি ছাড়া এয়ারস্ট্রিপ থেকে কোন প্লেন বা কপ্টার উড়তে পারবে না, সবাইকে এটা বলে দেয়া হয়েছে, তাই না? আপনিই বলুন, কার এত সাহস যে অনুমতি না নিয়ে কপ্টার নিয়ে আকাশে উঠল?'

তিক্তকণ্ঠে শাহ বকশী বলল, 'তারমানে চিড়িয়া পালিয়েছে!'

'পালালেও, কিভাবে কোথায় কতদূর যাবে আমি তা আন্দাজ করতে পারছি,' বলল নাদিরা, সে যেন একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে, চোখের দৃষ্টি বহুদূরে নিবদ্ধ। 'চরস থেকে মেইনল্যান্ড চারশো কিলোমিটার। কিন্তু আমাদের তিনটে কপ্টারের ট্যাংকে ইচ্ছে করেই এমন মাপমত ফুয়েল ভরে রাখা হয়েছে, তিনশো কিলোমিটারের বেশি যাতে উড়তে না পারে। এটা করার উদ্দেশ্য ছিল, কেউ কপ্টার নিয়ে পালাতে চেষ্টা করলে সে যেন সাগরে ডুবে মারা যায়।

'কিন্তু আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি, ফুয়েলের অভাবে হেলিকপ্টার অচল হয়ে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে বোতাম টিপে ইজেক্ট করবে রানা এক ঝাঁক মাছ ধরা নৌকার কাছাকাছি। কপ্টারের আগমন ও পতন চাক্ষুষ করবে জেলেরা, তবে দেখেও খুব একটা বিস্মিত হবে না, কারণ আমার ইনফর্মাররা ওই এলাকার সমস্ত জেলে নৌকাকে আগে থেকেই সতর্ক করে রাখবে।

'যাই হোক, জেলেদের একজন সর্দার রানাকে উদ্ধার করবে। শুধু তাই নয়, তীর ঘেঁষা যে-কোন শহরে পৌঁছেও দিতে চাইবে। কিন্তু রানা রাজি হবে না। বেশি লোকজন নেই অথচ টেলিফোন সুবিধে পাওয়া যাবে, এরকম কোন জায়গায় যেতে চাইবে ও।

জেলে সর্দার তখন প্রস্তাব দেবে, রানাকে সে সুরাট ও বরোদার মাঝখানে গভীর বনভূমিতে নামিয়ে দেবে, নর্মদা নদীর তীরে। মাইল পাঁচেক হাঁটলে অ্যাসিস্ট্যান্ট ফরেস্টারের বাংলো পাওয়া যাবে, বাংলোয় ফোন আছে, এ-সব তথ্যও সর্দারের কাছ থেকে পাবে রানা।

'ওই বাংলো থেকে দিল্লিতে ফোন করবে সে। আমার ইনফর্মার আড়িপাতা যন্ত্রের সাহায্যে সবই শুনতে পাবে। আমার ধারণা, রাত ফুরোবার আগেই বাংলো থেকে যেভাবে হোক রেল স্টেশনে পৌঁছে যাবে সে। ওদিকে একটাই স্টেশন, লাইনের শেষ মাথায়। ওখানে একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকার কথা, তীর্থযাত্রীদের নিয়ে আজমির পর্যন্ত যাবে। ছাড়বে ভোর ছ'টায়।

'রাত শেষ হবার আগে ওই ট্রেনে আমরাও উঠতে পারি। আমরা বলতে আপনার দেহরক্ষী, আমার ইনফর্মার বা আমার নিজের কথা বোঝাতে চাইছি...'

'তোমার কল্পনাশক্তি যে যথেষ্ট উর্বর, তার প্রমাণ আগেও পেয়েছি। সে যাই হোক, এবার বলো আমার কি সাহায্য দরকার তোমার।'

'প্রথম কথা, রানাকে বন্ধু হিসেবে পাবার এই যে আমার প্ল্যান, এটাকে আপনি সমর্থন করুন।'

'বেশ, করলাম।' শাহ বকশী মনে মনে অভিশাপ দিচ্ছে নাদিরাকে।

'রানার বন্ধুত্ব পেতে হলে কোন রকম ছল-চাতুরী বা কূটকৌশল করা চলবে না,' শর্ত দিল নাদিরা। 'তাকে আমরা সমান অংশীদার হবার প্রস্তাব দেব। গ্রহণ করলে মনে করব আমাদের চোদ্দপুরুষের পুণ্যের ফল। সে কিন্তু তখন আমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে নানা ধরনের ইনফরমেশন জানতে চাইবে। যেমন—নিউক্লিয়ার ওঅরহেড অ্যাকটিভেট করার সিকোয়েন্স, মিসাইল অপারেট করার টেকনিক, কমপিউটর প্রোগ্রামে ঢোকার

পাসওয়ার্ড, আমাদের বিকল্প হেডকোয়ার্টার ও সেফ হাউসের ঠিকানা ইত্যাদি...'

'সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তাকে আমরা জানিয়ে দিলাম, সব জানার পর সে আমদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল—তখন কি হবে?'

'রানা নোংরা কৌশল পছন্দ করে না,' অত্যন্ত জোর দিয়ে বলল নাদিরা। 'তার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই ঠিক, তবে তার সম্পর্কে এমন কোন তথ্য নেই যা আমি জানি না। সে সত্যিকার অর্থে একজন ভদ্রলোক, যাকে বলে আ পারফেক্ট জেন্টলম্যান। প্রস্তাবটা তার ভাল না লাগলে পরিষ্কার বলে দেবে—দুঃখিত, না। তথ্য পাবার জন্যে রাজি হবার মিথ্যে অভিনয় অবশ্যই করবে না।'

শাহ বকশী বলল, 'সিদ্ধির শরবত খাবার পর আমার ঘুম পাচ্ছে, নাদিরা। কাগজ-কলম বের করো, আমি বলি তুমি লেখো।'

কাগজ-কলম নিয়ে তৈরি হলো নাদিরা। শাহ বকশী প্রথমে বিকল্প হেডকোয়ার্টার আর তিনটে সেফ হাউসের ঠিকানা বলল। লেখার সময় রাগে ও ঘৃণায় অসুস্থ বোধ করল নাদিরা। সবগুলো ঠিকানা ভুয়া দিচ্ছে শাহ বকশী। আসল ঠিকানাগুলো আইএসআই এজেন্টদের সাহায্যে আগেই সংগ্রহ করে রেখেছে সে।

এরপর কমপিউটরে ঢোকার পাসওয়ার্ড লিখতে বলল শাহ বকশী। লিখতে গিয়েও লিখল না নাদিরা, বলল, 'এই পাসওয়ার্ড তো আপনি যখন খুশি তখন বদলাতে পারেন, কাজেই অন্যতম পার্টনার হিসেবে রানা হয়তো চাইবে ইস্পাতের ঘরে তারও যেন অবাধ প্রবেশাধিকার থাকে...'

'তুমি তাকে যতই বিশ্বাস করো, ইস্পাতের ঘরে ঢুকতে দেয়াটা কি উচিত হবে?' শাহ বকশী অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রাখছে। 'ওই ঘরে ঢোকার পর কেউ যদি ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোয় অ্যাটম বোমা ফেলতে চায়, তা সে ফেলতে পারবে—যদি কমপিউটরে ঢোকার পাসওয়ার্ড তার জানা থাকে।'

'কিন্তু এ-ও ভেবে দেখুন যে রানাকে আমরা ইকুয়্যাল পার্টনার হবার প্রস্তাব দেব। সে তখন বলতে পারে, তিনজনই যখন সমান অংশীদার, তখন পাসওয়ার্ড বদল করার ক্ষমতা তোমাদের থাকবে, আমার কেন থাকবে না? এমনকি, রেডিও সেটটাও চোখের সামনে দেখতে চাইবে, তাই না?' শাহ বকশী কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু নাদিরা তাকে কথা বলার সুযোগই দিল না। 'এই সমস্যার সমাধান হলো,' দ্রুত বলল সে, 'ইস্পাতের ঘরে একা কেউ ঢুকতে পারবে না–ঢুকলে তিনজন একসঙ্গে ঢুকবে। সবাই তখন জানবে পাসওয়ার্ডটা কি। এবার রেডিও সেট প্রসঙ্গ–ওটা আপনি কোথায় রেখেছেন?'

'মাসুদ রানাকে আগে তুমি আমার সামনে নিয়ে এসো,' মৃদু হেসে বলল শাহ বকশী, 'রেডিও সেটটা কোথায় আছে তাকেই না হয় বলব। তবে, তাকে তুমি নিয়ে আসতে যেতে চাইলে, আমার একটা শর্ত অবশ্যই তোমাকে মানতে হবে।'

'শর্ত?' নাদিরা সকৌতুকে তাকাল।

'হ্যাঁ। তুমি একা যেতে পারবে না, নাদিরা,' ভারি গলায় বলল শাহ বকশী। 'তোমার নিরাপত্তার দিকটা দেখার জন্যে আমার পাঁচজন দেহরক্ষীও তোমার সঙ্গে যাবে। ঠিক আছে, বেগম?' ভাবছে, একজন মাসুদ রানার জন্যে পাঁচজন প্রফেশনাল ইরানী খুনী যথেষ্ট নয় কি?

মনে মনে নাদিরা বলল, 'ওরে ভণ্ড, দাঁড়া, আল্লাহ চাহে তো রানাকে দিয়েই তোর ব্যবস্থা করা হবে!' মুখে বলল, 'ভেরি গুড, মাই ডিয়ার হাজবেন্ড। আমিও তো ভাবছিলাম একা যাওয়া উচিত হবে কি না।'

নয়

রাত পৌনে দুটোয় নর্মদা নদীর একটা লঞ্চঘাটে ভিড়ল জেলে সর্দার মাছুয়া বুটা সাঁতোলার নৌকা। এই গভীর রাতেও জায়গাটা গমগম করছে। লঞ্চের চেয়ে বড় আকারের মাল টানা নৌকার সংখ্যাই বেশি দেখল রানা, সবগুলোয় ডালপালা কাটা গাছের কাণ্ড বোঝাই করা হচ্ছে। উঁচু তীরে এক সারিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে পুরানো এক ঝাঁক লরি বা ট্রাক। জেলে সর্দার জানাল, এখানকার বেশিরভাগ কাঠই চোরাই; ঠিকাদাররা পঞ্চাশটা গাছ কাটার লাইসেন্স পেলে কম করেও আড়াইশো গাছ কাটে।

ছেলে কিরণ সাঁতোলাকে রেখে নৌকা নিয়ে সাগরে ফিরে গেল সর্দার। ঘাটের এক পাশে এক সারিতে অনেকগুলো ভাসমান হোটেল ও রেস্তোরাঁ দেখা যাচ্ছে, রানাকে তারই একটায় তুলে দিয়ে কিরণ গেল ট্রাক ড্রাইভারদের সঙ্গে কথা বলতে—তারা সবাই অন্য একটা ভাসমান হোটেলে উঠেছে। খানিক পর ফিরে এসে জানাল, ড্রাইভাররা বেশিরভাগই মদ খেয়ে মাতাল হয়ে আছে। যারা মদ খায়নি তারা জুয়া খেলছে, টাকার লোভ দেখিয়েও ট্রাক চালাতে রাজি করানো যায়নি। তবে একজন ঠিকাদার জানিয়েছে, জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে তার একটা লরি রেল স্টেশনে যাবে, কিন্তু কি কারণে কে জানে ড্রাইভার আসতে দেরি করছে। লরিটা এলে রানাকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ফরেস্টারের বাংলোর কাছাকাছি পৌঁছে দেয়া কোন সমস্যা নয়। কিরণ থামতে না থামতে ট্রাক

এঞ্জিনের ভারি শব্দ ভেসে এলো। কেবিন থেকে ছুটে বেরিয়ে গিয়েই আবার তখুনি ফিরে এলো সে, সবগুলো দাঁত বেরিয়ে পড়েছে।

পাঁচশো টাকার ভারতীয় নোট ভাঙিয়ে হোটেলের বিল মেটাল রানা, প্রতিশ্রুতি অনুসারে কিরণকে দিল এক হাজার রুপী।

রানাকে ট্রাকের ক্যাবে তুলে দিয়ে বিদায় নিল কিরণ সাঁতোলা, বলে গেল ছোট একটা নৌকা নিয়ে বাপের সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছে।

মাত্র পাঁচ মাইল দূরে অ্যাসিস্ট্যান্ট ফরেস্টারের বাংলো, কিন্তু মাঝপথে উত্তেজনা সৃষ্টি হলো। ক্যাবে ড্রাইভার আর তার সহকারী তো আছেই, ঠিকাদারও রয়েছে। কথা নেই বার্তা নেই, হঠাৎ করে ড্রাইভার রাস্তা ছেড়ে ঘন ঝোপ-ঝাড়ের অনেকটা ভেতর ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়ল। হেডলাইট অফ, এঞ্জিন বন্ধ। রানা কিছু জিজ্ঞেস করতে যাবে, অবাক হয়ে দেখল তিনজনের হাতে তিনটে অটোমেটিক রাইফেল উঠে এসেছে–যার যার পায়ের কাছেই কোথাও লুকানো ছিল।

'কি ব্যাপার?' শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করল রানা।

'খামোশ!' চাপা গলায় ধমকে উঠল গুজরাটী ঠিকাদার।

তারপরই শোনা গেল এঞ্জিনের আওয়াজ আর লোকজনের হৈ-চৈ। ঠিকাদার আর ড্রাইভার ক্যাব থেকে নেমে গেল।

তিন মিনিট পর হাসতে হাসতে ফিরে এলো তারা। ধমক দেয়ার জন্যে রানার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ঠিকাদার জানাল, পোচাররা বনরক্ষীদের ফাঁকি দিয়ে নিশ্চয়ই কোন গণ্ডার বা বাঘ মেরেছে, খবর পেয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট ফরেস্টার আরও কিছু বনরক্ষী নিয়ে ব্যাপারটা তদন্ত করতে যাচ্ছে।

পাঞ্জাবী ড্রাইভার ভাঙ খেয়ে খানিকটা ঘোরের মধ্যে আছে, সে দ্বিমত পোষণ করে বলল–বাঘ বা গণ্ডার কিছুই মারা যায়নি, সহকারী ফরেস্টার বাবুজীর পত্নীর বাচ্চা হবে। ব্যথা উঠেছে, তাই

ঢাক-ঢোল পিটিয়ে হাসপাতালে যাচ্ছে।

ঠিকাদার বলল, মেয়েটার বিয়েই হয়েছে মাত্র পাঁচ মাস। দেখে কিছুই বোঝা যায় না, তবে কথাটা যখন রটেছে তখন তিন মাসের পোয়াতি হলেও হতে পারে।

এরপর ওদের আলোচনা শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করছে দেখে কানে তালা দিতে বাধ্য হলো রানা। এই কাজটা ভালই পারে ও। যে-কোন আওয়াজ বা কথা শুনতে না চাইলে শুনতে পায় না–বা যদি পায়ও, শব্দগুলো দুর্বোধ্য আওয়াজ হিসেবে কানে বাজে, অর্থ বা তাৎপর্য থাকে না।

ফরেস্ট অফিসারের বাংলোর গার্ড বা বনরক্ষীরা ট্রাকটা দেখে ফেললে অসুবিধে আছে, তাই তিনশো গজ বাকি থাকতে রানাকে নামিয়ে দিল তারা। রানাকে আধ ঘণ্টার মধ্যে অবশ্যই ফিরতে হবে, দেরি করে ফিরলে এসে দেখবে ট্রাক নেই।

ট্রাকের আওয়াজ শুনে বাংলোর দুজন গার্ড আগে থেকেই রাইফেল হাতে সতর্ক হয়ে ছিল, টর্চের আলোয় রানাকে দেখতে পেয়ে তাদের একজন সামরিক কায়দায় হুংকার ছাড়ল, 'হল্ট!'

রানা তো থামলই, মাথার ওপর হাতও তুলল।

'কে তুমি? কার লরিতে এলে? এখানে কি চাই?' হিন্দীতে প্রশ্ন করল গার্ডরা।

'পরদেশী মুসাফিরও বলতে পারো, আবার ভারত সরকারের মেহমানও বলতে পারো,' জবাব দিল রানা। 'একটা বিপদে তোমাদের দেশকে আমি সাহায্য করছি। দিল্লির সঙ্গে কথা বলার জন্যে আমার এখন একটা ফোন দরকার।'

একজন গার্ড দু'পা এগিয়ে এসে রাইফেলের মাজলটা রানার বুকের ঠিক মাঝখানে ঠেকাল। 'তোমরা যে ডাকাত নও তার প্রমাণ কি? অ্যাসিস্ট্যান্ট ফরেস্টার চলে যাবার পর আমরা ক'জন গার্ড পাহারায় আছি দেখতে এসেছ, তাই না?'

আসল ঘটনা বোঝাবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করল রানা,

কিন্তু গার্ডরা ওর কোন কথাই বিশ্বাস করতে রাজি নয়।

'লছমি,' অন্ধকার বাংলোর ভেতর থেকে হঠাৎ মিষ্টি একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। 'ভদ্রলোককে দেখে, কথা শুনে আমার কিন্তু মনে হচ্ছে না উনি ডাকাত। ওঁর বুক থেকে রাইফেলটা সরাও, তারপর পথ দেখিয়ে ড্রইংরুমে নিয়ে এসো।'

ড্রইংরুমে ঢুকে একবার মাত্র তাকাল রানা, তাতেই আন্দাজ করল তরুণী বধূ খুব বেশি হলে চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা। রানাকে ইঙ্গিতে টেলিফোনটা দেখাল সে। ধন্যবাদ বলে ক্রেডল থেকে রিসিভার তুলল ও।

রানাকে বলা হয়েছে, আইএসএস প্রধান কৈলাস জাঠোরের এই নম্বরটা সম্পূর্ণ নিরাপদ, ট্রেস করা সম্ভব নয়। এর আরও একটা সুবিধে হলো, ডায়াল করলে দু'জায়গায় রিঙ হবে–অফিসে ও বাড়িতে।

এত রাতেও কৈলাস জাঠোর জেগে আছেন, একবার রিঙ হতেই রিসিভার তুললেন। নিরাপদ হওয়া সত্ত্বেও লাইনে বেশিক্ষণ থাকলেন না তিনি। রানার কথা শেষ হতে মাত্র দুটো তথ্য দিলেন–এক, দিল্লি পর্যন্ত যাবার দরকার নেই রানার, তাঁর একজন প্রতিনিধি আজমিরে ওর সঙ্গে দেখা করবে; দুই, রানাকে আবার চরসে পৌঁছে দেয়ার বিকল্প ব্যবস্থা করা সম্ভব। তারপরই যোগাযোগ কেটে দিলেন তিনি।

তরুণী বধূকে আরেকবার ধন্যবাদ দিয়ে এক ছুটে বাংলো থেকে বেরিয়ে এলো রানা। তিনশো গজ পেরুতে পারেনি, ট্রাকটা ওকে ফেলেই রওনা হয়ে গেল। ছুটতে ছুটতে ধরল রানা ওটাকে, লাফ দিয়ে ক্যাবে উঠে বসল। কোন কারণ ছাড়াই ঠিকাদার আর ড্রাইভার হাসতে হাসতে পরস্পরের গায়ে গড়িয়ে পড়ছে।

ঠিক ট্রেন ছাড়ার আগের মুহূর্তে স্টেশনে পৌঁছাল ওদের ট্রাক। তিন হাজার টাকায় রফা হয়েছে, কিন্তু আরও পাঁচশো টাকা বকশিশ চেয়ে বসল ড্রাইভার। ঠিকাদার রানাকে বলল. 'বাবুজী,

এই ড্রাইভার আর ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট যদি সবকিছু কেড়ে নিয়ে, পেটে ছুরি মেরে জঙ্গলে ফেলে দিত আপনাকে, তখন কি হত? পাঁচশো টাকা তো কমই চেয়েছে, দিয়ে দিন।'

লোকটা কৌতুক করল নাকি বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা দিতে চাইল, রানা ঠিক বুঝতে পারল না। তবে বকশিশ দিতে রাজি হলো না ও। বলল, 'তোমরা যা চেয়েছিলে তাতেই আমি রাজি হয়েছি, এখন বেশি চাইলে দেব কেন?'

ড্রাইভার হুমকি দিয়ে বলল, 'না দিলে আপনার অসুবিধে হতে পারে।'

মুচকি একটু হাসল রানা। 'তোমাদেরকে বলা হয়নি, আমি কিন্তু আইনের লোক,' বলতে বলতে ঘুরে দাঁড়াল, সোজা হেঁটে গেট পেরিয়ে ঢুকে পড়ল প্ল্যাটফর্মে, পিছন ফিরে একবার তাকালও না। তবে এঞ্জিনের আওয়াজ ঢুকল কানে, ট্রাক ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরে যাচ্ছে চোরাকারবারীরা।

এটা তীর্থযাত্রীদের জন্যে বিশেষ ট্রেন, অথচ প্ল্যাটফর্ম প্রায় খালিই বলা চলে। স্বভাবতই একটু অবাক হলো রানা। টিকিট কাউন্টারের লোকটাকে প্রশ্ন করতে কারণটা বোঝা গেল। অযোধ্যায় মসজিদ ভেঙে রামমন্দির নির্মাণকে উপলক্ষ করে শিবসেনারা সুরাট, বরোদা, রাজকোট, আহমেদাবাদ, ভুপাল ইত্যাদি শহরে এমন তাণ্ডব শুরু করেছে যে মাজার জিয়ারত তো দূরের কথা, বাড়ি ছেড়ে বেরুতেই সাহস পাচ্ছে না বিশেষ একটা সম্প্রদায়ের লোকজন।

শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বিলাসবহুল কমপার্টমেন্টের মাত্র একটা টিকিটই বিক্রি হলো; রানা ধারণা করল, সেই আজমির পর্যন্ত এই কমপার্টমেন্টে অন্য কেউ উঠবে না, সারাটা পথ নাক ডেকে ঘুমাতে পারবে।

দরজা ও কাঁচের জানালা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ল ঠিকই, কিন্তু মাত্র একটা স্টেশন পার হতেই আশ্চর্য মিষ্টি এক সৌরভ ঢুকল

নাকে, ধীরে ধীরে সজাগ হয়ে উঠছে রানা। অবাঞ্ছিত কারও উপস্থিতিতে ওর যখন ঘুম ভাঙে, মনের ভেতর একটা বিপদ-সংকেত বাজতে থাকে। এই মুহূর্তে সেরকম কিছু বাজছে না, শুধু সতর্ক হবার একটা তাগাদা অনুভব করছে। সিটটাকেই ডিভান বানিয়ে শুয়েছে ও, মাথায় দিয়েছে ভাঁজ করা একটা কম্বল, গায়ে সূতী চাদর—দুটোই ভারতীয় রেলওয়ের সরবরাহ করা।

প্রথমে সামান্য একটু চোখ খুলল রানা। ওর সামনের সিটে সম্ভবত কোন তরুণী বসে আছে, পাসহ উরুর অর্ধেকটা দেখতে পাচ্ছে রানা, আঁটসাঁট জিনসে মোড়া। অচেনা সেন্টের গন্ধকে ছাপিয়ে উঠল সিগারেটের কড়া ঝাঁঝ। হয় মেয়েটি সিগারেট খাচ্ছে, নয়তো কমপার্টমেন্টে আরও কেউ আছে।

নড়াচড়া করতে হলো না, ঘুমের মধ্যে হাতটা কখন যেন কম্বলের নিচে ঢুকে পড়েছে, ফলে বামহাতের আঙুলের ডগায় পিস্তলটার অস্তিত্ব অনুভব করছে রানা। ট্রেন তার নিজস্ব আওয়াজ, দোলা ও ছন্দ বজায় রেখে ছুটে চলেছে। কমপার্টমেন্টের ভেতর অন্য কোন শব্দ নেই।

হঠাৎ কোকিলের মত মিষ্টি ও সুরেলা কণ্ঠ শোনা গেল। 'তুমি জেগেছ, রানা। চোখ মেলে আমার দিকে তাকাও।'

গলাটা চেনা চেনা লাগছে রানার। লাউডস্পীকারে শুনেছে? নাদিরা বুলবুলি?

ভাঁজ করা হাত চোখ থেকে সরিয়ে সরাসরি তাকাল রানা। হ্যাঁ, নাদিরাই। একা সে। তবে সিগারেট খাচ্ছে না। ছাই দেখে বোঝা গেল অ্যাশট্রেতে ওটা অনেকক্ষণ ধরে পুড়ছে। এবং কথা বলার পর সে আর এ জগতে নেই।

এমন ধ্যানমগ্ন, গভীর, মুগ্ধ বিস্ময়ে বিহ্বল দৃষ্টি এর আগে কোন মানুষের চোখে দেখেনি রানা; এ বোধহয় শুধু বাঁশী শুনে কোন কালনাগিনীর সম্মোহিত হয়ে পড়ার সঙ্গেই তুলনা করা যেতে পারে, বিষ থাকা সত্ত্বেও যে ছোবল মারতে ভুলে গেছে।

'তুমি?' ডিভানে উঠে বসল রানা, বাম হাতটা এখনও ভাঁজ করা কম্বলের নিচে, ওয়ালথারটা ছুঁয়ে আছে। মনে হলো, রানার কথা শুনতে পায়নি নাদিরা। এ মুহূর্তে সে কোথায়, তা-ও বলা মুশকিল। চোখে পলক পড়ল না, এমন কি শ্বাস-প্রশ্বাস সচল থাকলে শরীরে যে উত্থান-পতন লক্ষ করা যায় সেটাও তার মধ্যে অনুপস্থিত। পিস্তলটা কম্বলের নিচে থেকে বের করল রানা, নাদিরার দিকে তাক করে আবার বলল, 'নিশ্চয়ই একা আসোনি, করিডরে তোমার লোকজন অপেক্ষা করছে। কিন্তু এখন যদি গুলি করি, কে আমাকে বাধা দেবে?'

হঠাৎ একটা ঝাঁকি খেলো নাদিরা। তার চোখ-ধাঁধানো রূপ সত্যি পাগল করার মতই, নিজের অজান্তেই একটা ঢোক গিলল রানা। ধীরে ধীরে আশ্চর্য একটা আনন্দ ও তৃপ্তিময় হাসির ঢেউ নাদিরার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল। 'কি বললে?' অস্ফুটে জিজ্ঞেস করল সে। 'গুলি করবে?' বুক টান-টান করায় গায়ের টকটকে লাল শার্টের ভেতর সুডৌল স্তনযুগল আরও যেন ফুলে উঠল। বাম হাতটা লম্বা করে দিল সে, মুঠো খুলতেই দুই সিটের মাঝখানে–কার্পেটের ওপর–ঝরে পড়ল ছ'টা বুলেট। 'তোমার হাতে মরতে পারাটা তো আমার পরম সৌভাগ্য। কেউ তোমাকে বাধা দেবে না, পিস্তল লোড করে মাথায় বা বুকে যেখানে খুশি যে-ক'টা ইচ্ছে গুলি করতে পারো।'

কার্পেটে পড়ে থাকা বুলেটগুলোর দিকে দু'সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল রানা। এখানে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে না পারার ঘটনা ঘটছে। ওর মাথার নিচ থেকে পিস্তলটা চুরি করেছিল নাদিরা, বুলেটগুলো বের করে নিয়ে আবার কম্বলের নিচে রেখে দিয়েছিল, অথচ ওর ঘুম ভাঙেনি!

'কেন, কি কারণে আমার হাতে মরার এত শখ তোমার?' জিজ্ঞেস করল রানা, ভুরু জোড়া কুঁচকে আছে। হাত থেমে নেই, অলসভঙ্গিতে বুলেটগুলো তুলে পিস্তলের ম্যাগাজিনে ভরছে,

আড়চোখে লক্ষ করল নাদিরার বড় আকারের হাতব্যাগটা যেন অবহেলার সঙ্গেই পাশের খালি সিটে ফেলে রাখা হয়েছে। 'থাক, আমি আগ্রহ বোধ করছি না—এ প্রশ্নের উত্তর তোমার না দিলেও চলবে।' পিস্তল রিলোড করা হয়ে গেল। 'তুমি বরং আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দাও।'

'তুমি আমাকে যে-কোন প্রশ্ন করতে পারো, রানা,' বলল নাদিরা। 'দুনিয়ায় বোধহয় একমাত্র তোমাকেই আমি কোন মিথ্যেকথা বলতে পারব না। তবে যা জিজ্ঞেস করার তাড়াতাড়ি করো। ওরা মাত্র এক ঘণ্টা সময় দিয়েছে আমাকে, তা-ও অনেক কষ্টে আদায় করতে হয়েছে।'

'ওরা?'

'শাহ বকশীর পাঁচজন ইরানী দেহরক্ষী। আমার স্বামী আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে না, তাই পাহারা দেয়ার জন্যে ওদেরকে পাঠিয়েছে। আমি আমার ব্যক্তিগত বডিগার্ড মেহেরবানকে আনতে চেয়েছিলাম, অনুমতি দেয়নি। সে জানে আমি তোমার কাছে আসছি, পার্টনার হবার প্রস্তাব দেব, কিন্তু আসল কথাটা জানে না।'

'আসল কথা?' পরিস্থিতিটা এখনও রানার কাছে পরিষ্কার নয়।

'আসল কথা হলো…এখুনি শুনতে চাও? বলতে পারি, যদি কথা দাও যে শোনার পর আমাকে পাগল ভাববে না।'

'না, আমি কোন কথা দিতে পারি না,' বলল রানা। 'কারণ তোমাকে আমি শত্রু বলে জানি।'

'তাহলে পরে শুনো। তুমি বরং কি জিজ্ঞেস করতে চাও করো।'

'তুমি পাকিস্তানী স্পাই, আইএসআই এজেন্ট, অস্বীকার করো?' প্রশ্ন করল রানা।

'হ্যাঁ, আমি ওদের একজন এজেন্ট; তবে চাকরি করি না,

চুক্তিতে কাজ করি। চুক্তির মেয়াদ চলতি মাসেই শেষ হয়ে যাচ্ছে।'

'তুমি বা তোমরা জেনে ফেলেছিলে যে সাঈদ শাকির বাংলাদেশী স্পাই, পাকিস্তানী ইন্টেলিজেন্সে তাকে রোপণ করা হয়েছে–সেজন্যেই আইএসআই চীফ ইউসুফ হায়দার শাকিরকে চরসে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেন, তুমি যাতে তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে পারো?'

'শাকির অনেক গোপন তথ্য বাংলাদেশে পাচার করে পাকিস্তানের মারাত্মক ক্ষতি করছিল,' বলল নাদিরা, 'কাজেই তাকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তবে তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার কোন নির্দেশ আমি পাইনি।'

'কিন্তু তা সত্ত্বেও তুমি তার জিভ কেটে নিয়েছিলে,' হিসহিস করে বলল রানা। 'কারণ সে তোমাকে পাকিস্তানী স্পাই হিসেবে চিনত...'

'হ্যাঁ, স্বীকার করছি, এই জঘন্য কাজটা বাধ্য হয়ে করতে হয়েছে আমাকে,' একটু ম্লান সুরে বলল নাদিরা। 'কারণ আগুনে পুড়ে মরার সময় আমি ওখানে উপস্থিত থাকায় শাকির অবশ্যই আমার সাহায্য চাইত, আর সেই সঙ্গে শাহ বকশী ও জেনারেল গোরস্কি জেনে ফেলত যে আমি পাকিস্তানী এজেন্ট। এটা আমি চাইনি। তাই বাধ্য হয়ে ওর জিভটা আমাকে আগেই কেটে নিতে হয়।'

হাতের পিস্তল নাদিরার দুই স্তনের ঠিক মাঝখানে তাক করা, ট্রিগারে পেঁচিয়ে থাকা আঙুলটাকে অনেক কষ্টে সামলে রেখেছে রানা। আত্মরক্ষার প্রয়োজন না হলে, ঠাণ্ডা মাথায় কাউকে খুন করার কথা ভাবতেই পারে না ও–প্রতিপক্ষ নারী হলে কাজটা আরও অসম্ভব মনে হয়। কিন্তু এই মুহূর্তে নাদিরার প্রতি তীব্র ঘৃণা ওকে দিশেহারা করে তুলছে। এখন যদি দুর্ঘটনাবশতই একটা গুলি বেরিয়ে যায়, রানা কোন অপরাধবোধে ভুগবে বলে মনে হয়

না। 'বাহ্,' বলল ও, 'বড় অদ্ভুত যুক্তি তো! পুড়ে মরার সময় সাহায্য চাইবে, তাই ওর জিভ কেটে নিতে হলো। শাকির কি তোমাদের হাতে-পায়ে ধরেছিল? তাকে যাতে জ্যান্ত পোড়ানো হয়?'

মাথা নিচু করে নাদিরা বলল, 'বলেছি, তোমাকে আমি মিথ্যে কথা বলতে পারব না। শাকিরকে জ্যান্ত পোড়ানোর সিদ্ধান্তটা আমার ছিল না, রানা। নির্দেশটা শাহ বকশী দেয়।' একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল সে, নড়েচড়ে বসল, সারাক্ষণ রানার মুখে তাকিয়ে আছে–দৃষ্টিতে এখনও কোমল অনুরাগ ও মুগ্ধ বিস্ময়। 'আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে ঝগড়া বা তর্ক করতে আসিনি...'

রানার প্রশ্ন শেষ হয়নি। 'তোমরা কি চন্দ্রা দেবযানিকেও মেরে ফেলেছ?'

'না, এখনও তাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে।' নাদিরার ঠোঁটে এক চিলতে রহস্যময় হাসি দেখা গেল। 'তবে ভারতীয় ওই এজেন্ট সম্পর্কে তোমার দরদ দেখে অনেকেরই হাসি পাবে, বিশেষ করে যারা জানে যে চরসে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কি ভয়াবহ ব্যবস্থা নিয়ে রেখেছে। এ-সব প্রসঙ্গ এখন থাক, আমি কিন্তু সত্যি তোমার সঙ্গে শত্রুতা নয়, বন্ধুত্ব করতে এসেছি...'

সঙ্গে সঙ্গে তাকে থামিয়ে দিল রানা, 'যাই করতে এসে থাকো, তোমাকে দেখে আমার অসহ্য লাগছে। সত্যি কথা বলতে কি, তোমাকে খুন না করার কোন কারণই আমি দেখতে পাচ্ছি না।'

'মাসুদ রানা, নিজেকে তুমি যতটা চেনো,' হঠাৎ গভীর ও দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলল নাদিরা, 'তোমাকে আমি তারচেয়ে বেশি চিনি তো কম নয়। আমার এ দাবি স্পর্ধা বা ধৃষ্টতা নয়, এ আমার গর্ব।

'আইএসআই-এর রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট সারা পৃথিবীর দুর্ধর্ষ

স্পাইদের ওপর একটা করে কমপিউটর ফাইল তৈরি করার প্রোগ্রাম হাতে নেয়, সাবজেক্ট হিসেবে আমি পাই তোমাকে। সেই থেকে পরবর্তী তিন বছর তুমিই ছিলে আমার ধ্যান। আমার চিন্তা-চেতনার সবটুকুই তুমি একা দখল করে রেখেছিলে। বলতে সংকোচ নেই, আমার অস্তিত্বের অংশ হয়ে উঠেছিলে তুমি।

'অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, অনেক কষ্টে আমি সিআইএ ও এফবিআই-এর কমপিউটরে ঢুকে পড়ি । স্লীপার এজেন্টকে দিয়ে কেজিবির ফাইল চুরি করাই। মোটকথা, তোমার সম্পর্কে যেখানে যত তথ্য ছিল সব আমি সংগ্রহ করি। এমনকি তোমার সম্পর্কে বিসিআই যে-সব গোপন ফাইল মাঝে-মধ্যে তৈরি করেছে, সেগুলোতেও চোখ বুলাবার সুযোগ হয় আমার–কিভাবে? প্লীজ, জিজ্ঞেস কোরো না। তো কি দাঁড়াল? নিজের সম্পর্কে তুমি যা জানো না, আমি তা জানি। প্রমাণ চাইলে এখুনি তা দিতে পারি।'

এরপর একটানা দশ মিনিট রানা সম্পর্কে এমন সব গোপন তথ্য মুখস্থ বলে গেল নাদিরা, শুনে রানার গায়ের পশম দাঁড়িয়ে গেল। তথ্যগুলো ওর সম্পর্কে হলেও, সেগুলোর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সম্পর্কিত এমন সব স্পর্শকাতর বিষয় জড়িয়ে আছে যে রানার এখন উচিত নাদিরাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বাংলাদেশের কোন কারাগারে চিরকাল আটকে রাখার ব্যবস্থা করা, আর নয়তো ঠাণ্ডা মাথায় এখানেই খুন করতে হয়।

এক সময় থামল নাদিরা। হাসছে সে। 'রিসার্চ করতে গিয়ে তোমাকে আমি এতটাই চিনেছি, তোমার থট প্রসেসও আমার পরিচিত হয়ে উঠেছে–তুমি কোন্ পরিস্থিতিতে কি চিন্তা করবে তা-ও আমি বলে দিতে পারব। না, রানা–এ-সব তথ্য আমি ছাড়া আর কেউ জানে না; কাজেই ফাঁস হয়ে যাবে এই ভয়ে, অন্তত আমাকে খুন করার কথা ভেবো না।'

'বেশ, তুমি আমার সম্পর্কে অনেক কিছু জানো,' বলল রানা। 'তো কি হলো? ব্ল্যাকমেইল করবে?'

'ব্ল্যাকমেইল সাধারণত মানুষ টাকা-পয়সা বা বিশেষ সুবিধের লোভেই করে, তাই না?' নাদিরা হাসছে। 'কিন্তু আমি তোমাকে দশ হাজার কোটি টাকার মালিক হবার প্রস্তাব দিতে এসেছি।'

'ইন্টারেস্টিং। তা প্রস্তাবটা কি?' রানার প্রশ্ন করার ভঙ্গিটা অলস, সুরে তাচ্ছিল্যের রেশ।

'আমি তোমাকে চাই।'

'কি বললে?' রানার সন্দেহ হচ্ছে, শুনতে ভুল করেছে।

'তোমার মন, রক্ত-মাংসের শরীর ও আত্মা—সব চাই। তিনটে বছর তুমি ছিলে আমার প্রতি মুহূর্তের সঙ্গী,' ফিসফিস করে কথা বলছে নাদিরা, যেন একটা ঘোরের ভেতর আছে। 'তোমার সম্পর্কে যত বেশি জেনেছি, তত বেশি সর্বনাশ করেছি নিজের। বিশেষ করে ব্যক্তিগত তথ্যগুলো ছিল বিষ, সব আমি স্বেচ্ছায় ঢক্-ঢক্ করে গিলেছি। এ প্রেম কিনা জানি না, তবে তোমাকে চিরকালের জন্যে নিজের করে পাবার যে উন্মত্ততা নিজের ভেতর অনুভব করি সেটাকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। কাজেই এর পরিণতি সম্ভবতঃ হয় তুমি আমার হবে, নাহয় তুমি বা আমি—দু'জনের একজন—এই পৃথিবীতে থাকব না।'

'মেয়েলি আবেগ ও উচ্ছ্বাস চিরকালই আমার অপছন্দ,' বলল রানা, ওর প্রতি নাদিরার তীব্র আকর্ষণ উপলব্ধি করতে পেরে খানিকটা অস্বস্তি বোধ করছে। 'ওগুলো বাদ দিয়ে তোমার প্রস্তাবে নিরেট কিছু থাকলে বলতে পারো।' কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার একটা সম্ভাবনাও উঁকি দিচ্ছে মনে।

নিজের বক্তব্য আগেই গুছিয়ে রেখেছিল নাদিরা, আকর্ষণীয় বাচনভঙ্গির সাহায্যে ধীরে ধীরে বলে গেল—কখনও ইংরেজিতে, কখনও উর্দু বা হিন্দীতে, আবার কখনও বাংলায়। প্রথমে গোটা পরিস্থিতি সম্পর্কে রানাকে পরিষ্কার একটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করল সে।

উপমহাদেশে যে মারাত্মক সংকট সৃষ্টি হয়েছে তার জন্যে

এককভাবে সবচেয়ে বেশি দায়ী পাকিস্তান। প্রতিবেশীদের প্রতি ভারতের অবিশ্বাস এবং সবাইকে চোখ রাঙিয়ে দমিয়ে রাখার মনমানসিকতাও এই সংকটের জন্যে কম দায়ী নয়। শাহ্ বকশী নির্ঘাত ভণ্ড, নতুন একটা ধর্মকে অনাচার ও অত্যাচারের লাইসেন্স হিসেবে গিলিয়ে গোটা উপমহাদেশের অপরাধপ্রবণ লোকজনের গুরু তথা নেতা হতে চায় সে। স্বামী যখন ঘোষণা করল শয়তান তাকে পয়গম্বর হিসেবে দুনিয়ায় পাঠিয়েছে, রাগে ও ঘৃণায় উকিলের মাধ্যমে তাকে ডিভোর্স করে নাদিরা। এই ঘটনার কিছু দিন পর আইএসআই-এর ইউসুফ হায়দার তার সঙ্গে যোগাযোগ করে এজেন্ট হিসেবে কাজ করার প্রস্তাব দেন। পেশাটায় রোমাঞ্চ, উত্তেজনা ও চ্যালেঞ্জ আছে দেখে রাজি হয়ে যায় নাদিরা। ইউসুফ হায়দার তাকে প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে চরস দ্বীপে পাঠান। নাদিরা শর্ত দেয়, তার ব্যক্তিগত বডিগার্ড মেহেরবানও সঙ্গে যাবে। ইউসুফ হায়দার রাজি হন। তবে ছয় হপ্তার একটা ট্রেনিং কোর্স শেষ করতে হয় মেহেরবানকে।

ইতিমধ্যে চরস দ্বীপে জাঁকিয়ে বসেছে শাহ্ বকশী, তার ভক্ত ও অনুচরের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। শয়তান উপাসকদের জন্যে স্বাধীন আবাসভূমির স্বপ্ন দেখত ঠিকই সে, কিন্তু তা অর্জন করার কোন প্ল্যান তার ছিল না। আইএসআই সেই প্ল্যান তৈরি করে দিল নাদিরার মাধ্যমে। শাহ্ বকশী তো মহা খুশি—স্বাধীন একটা রাষ্ট্রও পাবে সে, সুইস ব্যাংকে জমাও পড়বে সাত হাজার কোটি টাকা। শর্ত-টর্ত নিয়ে বিশেষ মাথা না ঘামিয়ে নাদিরাকে আবার বিয়ে করে ফেলল।

ইউসুফ হায়দার ভারতকে চরম একটা শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। তিনি জানতেন চরসে দু'ধরনের রাশিয়ান মিসাইল বসানো হয়েছে। প্রথম চালানটা পাঠিয়েছিল মস্কো থেকে রুশ সরকার, দ্বিতীয় চালানটা নিখোঁজ রুশ মেজর জেনারেল সের্গেই গোরস্কির কাছ থেকে কেনা হয়। জেনারেল গোরস্কি যে

পাকিস্তানের ওপর খেপা, বোমা ফেলে দেশটাকে ধ্বংস করতে চায়, ইউসুফ হায়দারের তা না জানার কথা নয়। তিনি এ-ও জানতেন যে গোরস্কির কাছ থেকে পাওয়া নিউক্লিয়ার ওঅরহেডগুলোর অন্তত দু'তিনটে পাকিস্তানের দিকে তাক করে বসানো হয়েছে। কাজেই আইএসআই যদি চায় মিসাইল ঘাঁটি সহ চরস দ্বীপ ভারতের হাতছাড়া হয়ে যাক, তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

দীর্ঘদিন ধরে ধীরে ধীরে প্রস্তুতি নেয়া হলো। ভারতের স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীতে পাকিস্তানের যত চর, ইনফর্মার, স্লীপার এজেন্ট আর ডাবল এজেন্ট আছে তাদের সবার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তুলল নাদিরা। তাদের অনেককে চরসে দাওয়াত দিয়ে এনে শাহ বকশীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল, এমনকি মিছিমিছি দীক্ষা নিয়ে শয়তান উপাসক সাজার প্রহসনেও অংশ নিতে উৎসাহ যোগাল।

তারপর একদিন শাহ বকশী তার শিষ্যদের নিয়ে চরম আঘাত হানল চরস মিসাইল ঘাঁটিতে। ভারতীয় জওয়ান আর অফিসারদের কচুকাটা করল তারা। নাদিরার হস্তক্ষেপে জেনারেল গোরস্কি আর তার লোকজন বেঁচে গেল। নাদিরা ভাব দেখাল, গোরস্কির প্রেমে পড়েছে সে। ওদিকে স্বামীকে বোঝাল, মিসাইল ও নিউক্লিয়ার ওঅরহেডের সমস্ত রহস্য না জানা পর্যন্ত রাশিয়ানদের বাঁচিয়ে রাখা দরকার।

প্রেমের অভিনয় করে গোরস্কির কাছ থেকে মিসাইল ও নিউক্লিয়ার ওঅরহেড সম্পর্কে যা কিছু জানার ছিল, সবই জেনে নিয়েছে নাদিরা। মিসাইলগুলো মাস্টার কমপিউটরের মাধ্যমে নিক্ষেপ করা যায়, নিউক্লিয়ার ওঅরহেডগুলোও মাস্টার কমপিউটরের সাহায্যে অ্যাকটিভেট করা যায়। এই কাজগুলো রেডিও সিগনালের মাধ্যমে অনেক দূর থেকেও করা সম্ভব। তবে রেডিও সিগনাল শুধু মাস্টার কমপিউটর অপারেট করার মাধ্যমে যা করার করতে পারবে–প্রতিটি মিসাইলে একটা করে বিল্ট-ইন

কমপিউটর আছে, সেগুলোর টার্গেটিং প্রোগ্রাম অদলবদল করতে পারবে না। পরমা সুন্দরী নাদিরার প্রেমে অন্ধ হয়ে সব মূল্যবান তথ্যই তাকে বলে দিয়েছে জেনারেল গোরস্কি। নাদিরা তার কথার সত্যতা যাচাই করার জন্যে নিজে গিয়ে দেখে এসেছে সত্যি সত্যি পাকিস্তানের বড় তিনটে শহরে একটা পঞ্চাশ ও দুটো একশো টনের অ্যাটম বোমা ফেলার ব্যবস্থা করা আছে। টার্গেটগুলো হলো ইসলামাবাদ, করাচী ও লাহোর। বাংলাদেশেরও দুটো শহরকে টার্গেট করা হয়েছে–ঢাকা ও চট্টগ্রাম। আরও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, বিল্ট-ইন কমপিউটরের সাহায্যে মিসাইল তিনটে যার যার নির্দিষ্ট টার্গেটে লক করা, এবং একবার লক করার পর মাস্টার কমপিউটরের সাহায্যে তা খোলা বা টার্গেট বদল করা সম্ভব নয়, করতে হলে মই বেয়ে মিসাইলের মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছাতে হবে, আবরণ খুলে অপারেট করতে হবে বিল্ট-ইন কমপিউটর–যদি পাসওয়ার্ড জানা থাকে তোমার। শুধু পাকিস্তানে নয়, ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী তাদের রণকৌশল হিসেবে বাংলাদেশ, বার্মা, অস্ট্রেলিয়া, চীন ও থাইল্যান্ডেও অ্যাটম বোমা ফেলার পাকা ব্যবস্থা করে রেখেছে।

এরপর নিজের প্ল্যানটা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল নাদিরা।

পাকিস্তানের প্রতি তার বিশেষ কোন দরদ নেই। শাহ বকশী বা জেনারেল গোরস্কিকেও কোনদিন ভালবাসেনি সে। স্পষ্ট ভাষায় জানাল, নাদিরা বুলবুলির জন্মই হয়েছে মাসুদ রানাকে ভালবাসার জন্যে। শাহ বকশীর নামে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সূত্র থেকে নিয়মিত চাঁদা তোলে সে, সেই টাকা জমতে জমতে এরইমধ্যে তিন হাজার কোটি ছাড়িয়ে গেছে। এই তিন হাজার কোটি আর সার্ক থেকে প্রাপ্য সাত হাজার কোটি টাকা রানার হাতেই তুলে দেবে সে, ও শুধু একবার রাজি হোক তার প্রস্তাবে। বাংলাদেশকে বিপদমুক্ত করতে ওকে সাহায্যও করবে সে।

প্রশান্ত মহাসাগরের কোথাও ছোট একটা দ্বীপপুঞ্জ দেখে

এসেছে নাদিরা, প্রায় জনবসতিহীনই বলা যায়, ওটা কিনে রানার সঙ্গে ওখানে সংসার পাতার ইচ্ছা তার। তাই বলে রানাকে যে ওর অতীতের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করতে হবে, তা নয়। এমনকি বিয়ের পরও ও যদি বিসিআই এজেন্ট থাকতে চায়, সে আপত্তি করবে না...

'বুঝতে পারছি,' এক পর্যায়ে নাদিরাকে থামিয়ে দিয়ে বলল রানা, 'তোমার কাছে এ-সবই রঙিন স্বপ্ন। কিন্তু আমার কাছে স্রেফ দুঃস্বপ্ন। না-না, আমাকে ব্যাখ্যা করতে দাও। প্রেমে পড়াটা অন্যায় কিছু নয়। যে-কেউ আমার প্রেমে পড়তে পারে। শুধু তুমি বাদে, নাদিরা।'

'মানে? তোমার কথা ঠিক বুঝলাম না।'

'তুমি আমার সম্পর্কে এত কিছু জানো, আর এই আসল কথাটা জানো না যে বহুকাল ধরে একটি মেয়েকে ভালবাসি আমি, সে-ও আমাকে...'

'জানি বৈকি। তুমি সোহানার কথা বলছ। কিন্তু সবাই জানে তোমরা দু'জন ঘনিষ্ঠ হবার বদলে কিভাবে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়া যায় তারই সাধনা করছ।'

'সেই সাধনাও তো ভালবাসারই একটা প্রকাশ,' বলল রানা। 'হয়তো খুব কাছে আসার জন্যে প্রথমে অনেক দূরে সরে যাবার প্রয়োজন আছে।'

'আমি একটা সুযোগ চাই, আর কিছু না,' হঠাৎ কাতর মিনতির সুরে বলল নাদিরা। 'তোমার পায়ে পড়ি, শুধু এই একটা জিনিস ভিক্ষা দাও আমাকে। সুযোগ বলতে তোমার খানিকটা সময় চাইছি আমি। যদি পাই, সোহানার নাম আমি তোমার মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করব...'

'তোমাকে আলাদাভাবে বা নিভৃতে সময় দেয়া সম্ভব নয়,' বলল রানা, শব্দ নির্বাচনের সময় সতর্ক। 'তবে তোমার সঙ্গে কাজ করতে আমার আপত্তি নেই।' জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতে

দেখল, ট্রেনটা পাহাড়ী এলাকার ভেতর দিয়ে ছুটে চলেছে।

'বেশ, তাতেই আমি আপাতত খুশি থাকব। তাহলে চলো, আজই তোমাকে চরসে ফিরিয়ে নিয়ে যাই,' বলল নাদিরা, আগ্রহ ও উত্তেজনায় চোখ দুটো চকচক করছে। 'তার আগে এসো, দু'জন মিলে ওদের পাঁচজনকে খতম করি...'

দশ

হকচকিয়ে গেল রানা। একজন নয়, দু'জন নয়, পাঁচ-পাঁচজন মানুষকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে চাইছে নাদিরা! শুধু তাই নয়, এত উৎসাহ নিয়ে কথাটা বলছে, মানুষ মারা যেন একটা ছেলেখেলা ব্যাপার। 'শাহ বকশীকে জবাবদিহি করতে হবে না তোমার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ওদেরকে খুন করে একটা স্টেশনে নেমে যাব আমরা,' বলল নাদিরা। 'আমার কাছে প্রচুর জেলিগনাইট আর ডিটোনেটর আছে, বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ট্রেনটাকে লাইন থেকে ফেলে দেয়া কোন সমস্যা নয়। শাহ বকশীকে বলা হবে দুর্ঘটনায় ওরা মারা গেছে, তবে আমরা দু'জন মিরাকুলাসলি অক্ষত অবস্থায় বেঁচে গেছি...'

'ট্রেন ফেলে দিলে বহু নিরীহ প্যাসেঞ্জার মারা যাবে,' মনে করিয়ে দিল রানা।

'বহু আসবে কোত্থেকে, সব মিলিয়ে টিকিটই তো বিক্রি হয়েছে পঁচিশ-ত্রিশটা।'

রানা বুঝতে পারছে নাদিরা মানসিক রোগী, নিরীহ মানুষ খুন

করাটাকে কোন অন্যায় বা অপরাধ বলেই মনে করে না। প্রসঙ্গ বদল করল ও। 'পাঁচজন সশস্ত্র দেহরক্ষীকে চলন্ত ট্রেনে কিভাবে তুমি খুন করতে চাও?'

'কেন, গুলি করে! আমাদের দু'জনের কাছেই তো পিস্তল আছে।'

'গুলির শব্দ শুনে গার্ড ছুটে আসবে না?'

'ওহ্, ডিয়ার গড! তুমি শুধু শুধু সময় নষ্ট করছ, রানা! দু'জনেই জানি, এ-সব কোন সমস্যা নয়। গার্ড আসুক আর যে-ই আসুক, তাকেও মরতে হবে।'

মাথা নাড়ল রানা। 'মানুষ সাপ বা বিছে নয় যে আসতে দেখলেই মারা যায়।'

'ঠিক আছে, গুলি করে লোক জড়ো করলাম না!' বলে হাতব্যাগটা টেনে নিল নাদিরা, ভেতরে হাত ঢুকিয়ে একটা লাইটার বের করল। 'এটা রাখো।'

তার বাড়ানো হাত থেকে জিনিসটা রানা নিল না। 'আগে বলো, কি ওটা। আমাকে দিতেই বা চাইছ কেন?'

হাতটা গুটিয়ে নিয়ে নাদিরা বলল, 'এটা সাধারণ কোন লাইটার নয়। সিলেক্টর অফ-এর ঘরে সরিয়ে পাঁচবার বোতামে চাপ দিলে আগুন জ্বলবে না। কিন্তু ছয়বারের বার চাপ দিলে দুই ফুট লম্বা তরল গ্যাস বেরুবে, সেই গ্যাস সঙ্গে সঙ্গে দপ করে জ্বলেও উঠবে। আইএসআই এজেন্টরা এটাকে খুদে নাপাম বলে।'

'এটা নিয়ে আমি কি করব?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'অন্তত দু'জন দেহরক্ষীর গায়ে আগুন ধরাতে পারবে,' বলল নাদিরা। 'বাকি তিনজন হকচকিয়ে যাবে, সেই সুযোগে তুমি একজনকে, আমি দু'জনকে খতম করব—গলায় তার পেঁচিয়ে হোক বা বুকে ছুরি বসিয়ে।'

আবার মাথা নাড়ল রানা, ক্ষীণ একটু হাসল। 'তুমি দেখছি আমাকে কিলিং মেশিন ধরে নিয়েছ। আমার ফাইল কি তাই

বলে?'

'না, তা বলে না।' একটু ম্লান ও বিব্রত দেখাল নাদিরাকে। 'কিন্তু শত্রুর সংখ্যা কমাবার এই সুযোগ হাতছাড়া করা কি আমাদের উচিত হবে?'

'আমি যত দূর জানি, চরসে ওদের সংখ্যা প্রায় তিনশো,' বলল রানা। 'তুমি কি এদের সবাইকে খুন করার প্ল্যান করেছ?'

নাদিরা হেসে উঠল। 'ওরা দুই ভাগ হয়ে গেছে, রানা। প্রায় অর্ধেকের মত আমার বশে চলে এসেছে। বাকি অর্ধেক এখনও শাহ্ বকশীর প্রতি অনুগত। ওই দেড়শোজন আর রাশিয়ানদের সত্তরজন, মোট দুশো বিশজনের কিছু একটা ব্যবস্থা আমাদেরকেই করতে হবে।' লাইটারটা হাতব্যাগে না ভরে কোলের ওপর ফেলে রেখেছে সে।

'আমি চরসে পৌঁছাবার পর কি ঘটবে সে-সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা পেতে চাই,' বলল রানা। 'শাকিরকে গুলি করে পালাবার সময় গ্রেনেড চার্জ করে শাহ্ বকশীর অনেক শিষ্যকে ওপারে পাঠিয়ে দিয়েছি–তারপরও তুমি বলতে চাইছ, আমাকে সমান অংশীদার হিসেবে পেতে চায় সে?'

'চাইছে কি আর সাধে! রাশিয়ানদের সরিয়ে দেয়ার পর যে গ্যাপটা তৈরি হবে সেটা পূরণ করবে কিভাবে? আমি তাকে বুঝিয়েছি–মাসুদ রানা মিসাইল, নিউক্লিয়ার ওঅরহেড, ঘাঁটি ও দ্বীপের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে যা যা করা দরকার সব করবে। তাছাড়া, আমার পরামর্শ গ্রহণ না করে তার উপায়ও নেই। সে খুব ভাল করেই জানে যে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী কি কারণে চরসের ধারেকাছে ঘেঁষতে পারছে না।'

'বেশ, দুশো বিশজনকে মারলাম আমরা,' বলল রানা। 'তারপর?'

'তারপর সুইস ব্যাংকে চাঁদার টাকা না পৌঁছানো পর্যন্ত অপেক্ষা,' বলল নাদিরা। 'ইতিমধ্যে বিল্ট-ইন কমপিউটরের

পাসওয়ার্ড আমার কাছ থেকে জেনে নিয়ে নিউক্লিয়ার ওঅরহেড সহ দূর পাল্লার মিসাইলের টার্গেট বদল করবে তুমি, ফলে তারপর কেউ যদি রেডিও সিগনাল পাঠায়ও, ঢাকা বা চট্টগ্রামে কোন অ্যাটম বোমা পড়বে না।

'রানা, প্রিয় রানা, সত্যিকার অর্থে তুমি যদি আমার জীবনসাথী হতে রাজি হও, তোমার হাতে আমি এই উপমহাদেশের নিয়তি নির্ধারণের ক্ষমতা পর্যন্ত তুলে দিতে রাজি আছি। ওঅর স্ট্র্যাটিজির অজুহাত তুলে ভারত যদি ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরকে পারমাণবিক বোমার টার্গেট করতে পারে, সুযোগ থাকায় তুমি কেন ভারতের দিল্লি, বোম্বে, আর কোলকাতাকে টার্গেট করতে পারবে না? তোমার যদি পাইকারী হত্যাকাণ্ডে আপত্তি থাকে, কমপিউটরকে আমিই নাহয় মিসাইল ছোঁড়ার নির্দেশ দেব।

'আর পাকিস্তানকে? ওদেরকেই বা তুমি ছাড়বে কেন! ওরা তোমাদের ওপর কম অত্যাচার করেনি। পাওনা সম্পদও তো দিচ্ছে না। সর্বশেষ ক্রাইম, খুন হবার জন্যে শাকিরকে আমার কাছে পাঠানো। আমাকে শুধু ভালবাসবে বলে কথা দাও, রানা; তুমি পাকিস্তানের যেখানে চাইবে সেখানেই অ্যাটম বোমা ফেলতে রাজি আছি আমি...'

এ কোন পিশাচীর পাল্লায় পড়েছে, ভাবতে গিয়ে বুকের ভেতরটা রানার শিরশির করে উঠল। 'আরেকটা প্রশ্ন, নাদিরা,' একটা ঢোক গিলে বলল ও। 'শাহ্ বকশীকে নিয়ে কি করব আমরা?'

'ভণ্ড প্রতারকদের কিছু করতে হয় না,' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল নাদিরা। 'অবস্থা বেগতিক দেখলে ওরা পালায়। পালিয়ে কোথায় যাবে, তা-ও আমার জানা আছে। তুমি যদি ধরতে চাও, ঠিকানাটা চেয়ে নিয়ো।'

'এখন তাহলে ইরানী পাঁচজনকে ডাকো,' বলল রানা। 'রক্তপাত ঘটাবার কোন প্রয়োজন নেই, সবাই একসঙ্গে চরসে

ফিরে যাই চলো। কিভাবে যাব?' ডিভান থেকে নেমে হাতের পিস্তল কোমরে গুঁজে রাখল ও, শার্ট ও জ্যাকেট পরছে।

হাতব্যাগ থেকে একটা মোবাইল ফোন বের করে দেখাল নাদিরা। 'হেলিকপ্টার থেকে নেমে ট্রেনে চড়েছি আমরা। পাইলট ওখানেই আমার কল পাবার অপেক্ষায় বসে আছে।'

'ভেরি গুড,' বলল রানা। 'প্ল্যানটা তাহলে ওদেরকে ডেকে জানাও।'

দরজায় নক করে ইরানী দেহরক্ষীদের লীডার শাহবাজ-এর নাম ধরে ডাকল নাদিরা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে পাঁচটা দৈত্য ছোট্ট কমপার্টমেন্টের ভেতর ঢুকে পড়ল, পরনে ভারতীয় আর্মির ইউনিফর্ম, কি এক অজ্ঞাত কারণে সবাই তারা পৈশাচিক হাসি হাসছে।

প্রস্তুতি নেয়া তো দূরের কথা, কেন কি ঘটছে বোঝার সময়ও রানা পেল না, ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তিনজন ইরানী পালোয়ান। তাদের চড়-থাপ্পড় পটকা আর ঘুসিগুলো বোমার মত আওয়াজ করছে। তবে মাত্র এক মিনিটের মধ্যে জ্ঞান হারাল রানা, তার আগে দেখতে পেল প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি করেও বাকি দু'জন ইরানীর সঙ্গে নাদিরা সুবিধে করতে পারছে না।

এগারো

হঠাৎ করে জ্ঞান ফিরল। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল কোথায় রয়েছে, কি ঘটেছে। কমপার্টমেন্টে একা ও, কার্পেটে মুখ দিয়ে পড়ে

আছে। আগের মতই প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলেছে ট্রেন। দরজা বন্ধ, ঝাপসা কাঁচের বাইরে একজন পালোয়ানের ছায়া দেখা গেল। একটু ভাল করে তাকাতে চোখে ধরা পড়ল ব্যাপারটা, দরজার কবাট একটু ফাঁক হয়ে আছে।

চাবি না থাকলে এই দরজা বাইরে থেকে লক করা সম্ভব নয়, আরোহীরা শুধু ভেতর থেকে লক করতে পারবে। ব্যাপারটা ইরানী দেহরক্ষীদের জন্যে সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে, তাই তারা তালাটা সম্ভবত ভেঙে ফেলেছে।

কার্পেটে বসার সময় ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল রানা। খুলির অন্তত দু'জায়গা আলুর মত ফুলে গেছে। শরীরের প্রতি ইঞ্চিতে ব্যথা অনুভব করছে ও। এর মানে হলো, জ্ঞান হারাবার পরও ওকে রেহাই দেয়া হয়নি। এরকম মার অনেকদিন খায়নি রানা, শাহ বকশীর ভক্তরা শুধু ওর হাড়গুলো খুলে নিয়ে যায়নি।

পিস্তলটা নেই। নেই ছুরিটাও। তবে মেঝের এক কোণে, কার্পেটের একটা ভাঁজের আড়ালে নাদিরার লাইটারটাকে পড়ে থাকতে দেখল ও। তুলে ভরে রাখল পকেটে।

পা টিপে টিপে দরজার সামনে চলে এলো রানা। নব ধরে সাবধানে ঘোরাল। তালা যে ভাঙা, তাতে কোন সন্দেহ নেই, তবে বাইরে থেকে যেভাবেই হোক কবাট আটকে রাখা হয়েছে। আধ ইঞ্চিটাক খুলল, তারপর আর নড়ে না।

অকস্মাৎ হাঁ করে খুলে গেল দরজা, একটা পিস্তলের কালো চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। 'পিছু হটো, মিয়া, পিছু হটো!' খেঁকিয়ে উঠল ইরানী গুণ্ডা। 'কোন রকম চালাকি করলে নাড়ীভুঁড়ি সব বের করে আনব।'

পিছু হটল রানা। 'না, মানে, ভাবলাম এতক্ষণে নিশ্চয়ই ভুল বোঝাবুঝির অবসান হয়েছে, তোমরা ক্ষমা চাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছ...'

'ভুল বোঝাবুঝির কোন ঘটনা এখানে ঘটেনি,' পিস্তলধারীর

পিছন থেকে কর্কশ গলায় বলল শাহবাজ, ওদের লীডার। 'আমরা সর্বশেষ পয়গম্বর মহান শাহ বকশীর নির্দেশ মতই যা করার করছি।'

দরজা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল, তবে তার আগে রানা দেখতে পেল কবাট আটকাবার জন্যে কোমরের একটা বেল্ট ব্যবহার করছে ওরা।

কি ঘটতে চলেছে, আন্দাজ করতে রানার কোন অসুবিধে হচ্ছে না। যে-কোন কারণেই হোক, রানাকে পার্টনার করার প্রস্তাব পছন্দ হয়নি শাহ বকশীর। কিন্তু সে-কথা নাদিরাকে বলতে নিশ্চয়ই কোন অসুবিধে ছিল তার। তাই স্ত্রীর সঙ্গে একদল খুনীকে পাঠিয়েছে। ওই পাঁচ খুনী স্রেফ মজা করার জন্যেই নাদিরাকে দীর্ঘ এক ঘণ্টা রানার সঙ্গে কথা বলতে দিয়েছে, জানে ট্রেন আজমিরে পৌঁছানোর আগে কোন এক সময় রানাকে খুন করলেই হবে।

ডিভানে বসে চিন্তা করছে রানা। ওরা সবাই আসবে না, অন্তত দু'জন নাদিরাকে পাহারা দেবে। তিনজন দৈত্যকে একা সামলানো অসম্ভব, তবে নাদিরার লাইটারটা সত্যি যদি কাজের জিনিস হয় তাহলে হয়তো অসম্ভবকে সম্ভব করা যেতে পারে।

তবে বলা মুশকিল কখন ওরা আসবে। এখুনি আসতে পারে, আবার এক ঘণ্টা দেরিও করতে পারে।

ঠিক পাঁচ মিনিট পর এলো ওরা। তিনজন। ভেতরে ঢুকে দু'জন দাঁড়াল দরজার দু'পাশে। শাহবাজ, ওদের লীডার, দরজা বন্ধ করে কবাটে পিঠ ঠেকাল, রানার দিকে তাকিয়ে আছে। তিনজনের হাতই খালি, তবে প্রত্যেকের হোলস্টারেই পিস্তল রয়েছে।

'আর পাঁচ মিনিট,' সঙ্গীদের বলল শাহবাজ, তারপর আবার তাকাল রানার দিকে। 'সত্যি দুঃখিত। বলার কথা একটাই, এটাকে ব্যক্তিগতভাবে নিয়ো না। প্রেরিত পুরুষ হুকুম করেছেন,

আমরা সেই হুকুম পালন করছি মাত্র।'

'কিন্তু সে তার বিবিকে বলেছে অন্য কথা...'

'তা-ও আমরা জানি,' বলল শাহবাজ। 'আমাদের পয়গম্বর জাদুকর নন, তাই দুষ্ট মানুষের কুবুদ্ধির মোকাবিলা করেন কূটকৌশল দিয়ে। তোমাকে চরসে তিনি দেখতে চান না, এ-কথা বেগম সাহেবাকে বলেও যখন কোন কাজ হলো না তখন বাধ্য হয়ে আমাকে তাঁর সঙ্গে পাঠালেন তোমার একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করতে...' হাতঘড়ি দেখল সে। 'আর তিন মিনিট।'

চেহারায় ব্যাকুল একটা ভাব, রানা বলল, 'কৌতূহলে মরে যাচ্ছি, ভাই! তিন মিনিট পর কি ঘটবে?'

দুই কোমরে হাত রাখল শাহবাজ, চোখ-মুখ থেকে উপচে পড়ছে উত্তেজনা। 'সামনে লোহার একটা ব্রিজ পড়বে, ওটা থেকে নদীর তলা দুশো ফুট নিচে।'

দরজার ডান পাশ থেকে তার এক সঙ্গী বলল, 'বছরের এই সময়ে নদীতে পানি খুব কমই থাকার কথা। এই লাইনে প্রায়ই যাওয়া-আসা করতে হয়, নিচে তাকালে নদীতে শুধু বড় বড় পাথর দেখতে পাই...'

তৃতীয়জন বলল, 'সংক্ষেপে, তোমার কোন আশা নেই। এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে আমরা তিনজন জানালা দিয়ে নিচে ফেলে দেব তোমাকে?'

'কিন্তু আমি যদি বাধা দিই?'

'তাহলে আগে গুলি করে মারব, তারপর নিচে ফেলব তোমার লাশ,' বলল শাহবাজ।

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। বড় করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'এক মিনিট বাকি থাকতে বোলো, কেমন? শেষ একটা সিগারেট খেতে চাই। কি, সুযোগটা দেবে তো?'

মাথা ঝাঁকাল খুনীরা। লীডার বলল, 'শেষ ইচ্ছা পূরণের রেওয়াজ যখন আছে, তোমাকে বঞ্চিত করাটা উচিত হবে না।

আর বেশি দেরি নেই।'

ধীরে ধীরে, অত্যন্ত সাবধানে ডিভান ছেড়ে দাঁড়াল রানা। 'তোমাদের বেগমসাহেবা কোথায়?'

'তিনি পাশের কামরায় বিশ্রাম নিচ্ছেন,' বলল শাহবাজ। 'সিগারেট যদি খেতেই হয়, এখনি ধরাও–এরপর আর সময় পাবে না।'

পকেটে হাত ভরল রানা। পরমুহূর্তে চেহারা ম্লান হয়ে গেল। এ-পকেট ও-পকেট হাতড়াচ্ছে। হাতে লাইটার, কিন্তু সিগারেট নেই। কমপার্টমেন্টের মাঝখান থেকে নড়ল না, ওখানে দাঁড়িয়েই খালি হাতটা পাতল। 'একটা সিগারেট হবে নাকি?' চোখে-মুখে বিব্রত ভাব, লাইটারটা নার্ভাস ভঙ্গিতে বারবার জ্বালার চেষ্টা করছে।...দু'বার; তিনবার...

হোলস্টার থেকে প্রথমে পিস্তলটা বের করল শাহবাজ। 'হবে,' বলে এগিয়ে এসে রানার সামনে দাঁড়াল, খালি হাত দিয়ে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করছে।

রানার হাতে লাইটারটা চারবার ক্লিক করল।

শাহবাজ পুরো প্যাকেটটাই বাড়িয়ে ধরল, তবে খোলা অবস্থায়।

রানার হাতে আরেকবার ক্লিক করে উঠল লাইটার। ওটা সরাসরি শাহবাজের বুকে তাক করা ছিল। কিন্তু ঘটল না কিছুই।

প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট টেনে নেয়ার সময় রানা লক্ষ করল লাইটারের সিলেক্টর অফ-এর ঘরে নয়, রয়েছে অন-এর ঘরে। বাঁচা-মরার মত চরম সংকটে এরকম ভুল আগে কখনও করেছে কিনা মনে করতে পারল না ও।

হঠাৎ খুনীদের একজন বলল, 'ওস্তাদ, এখন আর সিগারেট ধরাবার সময় নেই, ব্রিজ কাছে চলে এসেছে!' জানালার কাঁচ তুলে বাইরে মাথা বের করে দিয়েছে সে। 'ওকে ধরে এদিকে টেনে আনো, ফেলে দিয়ে ঝামেলা চুকাই।'

রানার ঠোঁটে সিগারেট। শাহবাজ তার অপর সঙ্গীকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকল।

রানার হাতে চারবার ক্লিক করল লাইটার। 'অন্তত একটা টান দিতে দাও!' মিনতির সুরে বলল ও। 'আগুন হবে?'

'হলেও, হাতে সময় নেই,' পিস্তলটা হোলস্টারে গুঁজে রেখে বলল শাহবাজ। সে আর তার সঙ্গী পা বাড়াল, রানাকে ধরার জন্যে যার যার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

হাতের লাইটারটা শাহবাজকে দেখাল রানা, ধরেছে পিস্তলের মত সরাসরি তার মুখে তাক করে। 'আমিও আর দেরি করতে পারি না,' বলে লাইটারের বোতামে চাপ দিল, এবার নিয়ে পাঁচবার।

নাপাম বড় ভয়ংকর অস্ত্র। দুই ফুট লম্বা জ্বলন্ত ঘন তরল পদার্থ লাফ দিয়ে ঢেকে ফেলল শাহবাজের মুখ। লোকটার চিৎকার তখনও থামেনি, মুখ হয়ে উঠল পোড়া কয়লা। কি ঘটছে বোঝারও সময় পায়নি, শাহবাজের পাশে দ্বিতীয় লোকটা আক্রান্ত হলো। চোখ গেল, নাক গেল; ঠোঁট, দাঁত, কপালের হাড় পুড়ে কয়লা হতে কিছুই বাকি থাকল না। শাহবাজ দড়াম করে পড়ে গেল মেঝেতে, তার ওপর আছাড় খেলো দ্বিতীয় লোকটা।

লাইটার ফেলে দিয়ে পিছু হটছিল রানা, বন করে আধ পাক ঘুরল। খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তৃতীয় খুনী, হোলস্টার থেকে জিনিস বের করছে, ছুটে এসে তার বুকে দু'হাত দিয়ে ধাক্কা দিল ও, একইসঙ্গে উরুসন্ধিতে ভাঁজ করা হাঁটু দিয়ে প্রচণ্ড এক গুঁতো। ছিটকে জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল লোকটা। ছুটে এসে উঁকি দিতে রানা দেখল নদীর শুকনো তলাতেই পড়ছে সে।

শাহবাজ আর তার সঙ্গীর মগজ পর্যন্ত পুড়ে গেছে, কাজেই বেঁচে থাকার প্রশ্ন ওঠে না। শাহবাজকে সার্চ করার সময় স্বস্তির নিঃশ্বাস

ফেলল রানা–ওর প্রিয় ওয়ালথার আর খাপসহ ছুরিটা উদ্ধার করা গেল একই পকেট থেকে।

তাড়াতাড়ি করিডরে বেরিয়ে এসে ডান দিকে, অর্থাৎ এঞ্জিনের দিকে এগোল রানা। প্রথম কাজ বাকি দুই ইরানী খুনীর হাত থেকে নাদিরাকে উদ্ধার করা।

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে ওর। কার কাপলিং-এর ওপর ভেস্টিবিউল বা অ্যান্টি-রূমে পা দিতেই দেখতে পেল দুই ইরানীর একজন সিধে হলো, তারপর ছোট্ট এক লাফ দিয়ে পরবর্তী কার বা কমপার্টমেন্টের প্ল্যাটফর্মে ফিরে গেল। সম্ভবত লীডার সহ তিন সঙ্গীর ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে যা বোঝার বুঝে নিয়েছে ওরা, সাবধানের মার নেই ভেবে শেষ কারটার সংযোগ খুলে দিয়েছে।

রানা যখন লাফ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল, দুটো কারের মাঝখানে এখন দশ ফুটের মত ব্যবধান তৈরি হয়েছে। সিদ্ধান্তটা বাধ্য হয়ে বাতিল করতে হলো, কারণ লাফ দিয়ে টার্গেটে পৌঁছতে না পারলে যে কার-এ রয়েছে সেটারই চাকার তলায় চাপা পড়তে হবে ওকে। এখনও বেশ জোরে ছুটছে কারটা, তবে ধীরে ধীরে গতি কমে আসছে।

ভেস্টিবিউলে দাঁড়িয়ে এঞ্জিনসহ ট্রেনের একটা অংশকে ক্রমশ দূরে সরে যেতে দেখছে রানা। ওদিকে সেই ইরানী লোকটাও দাঁড়িয়ে রয়েছে। তবে তার সঙ্গী বা নাদিরাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

বারো

অচল ট্রেন কার থেকে যেখানে নামল রানা, হাইওয়েটা সেখান থেকে বেশি দূরে নয়, ট্যাক্সি পেতেও কোন অসুবিধে হলো না। আজমিরে পৌঁছে ফাইভ স্টার দ্য রয়্যাল তাজমহলে উঠল। খাওয়াদাওয়া সেরে সিটি পার্কে ঢুকল বেলা তিনটের দিকে। তেকোনা পুকুরটা খুঁজে বের করল, বসল উত্তর পারের একটা বেঞ্চে। পার্কের এটা শেষ প্রান্ত, সীমানার বাইরে গাছপালায় ঢাকা মাটির বেশ ক'টা টিলা দেখা যাচ্ছে। সময়টা দুপুর। রোদ লাগায় টিলার মাথায় ঝিক করে উঠল কি যেন। তারপর আরেকবার, অন্য এক টিলায়।

সন্দেহ নেই, ওগুলো অটোমেটিক রাইফেলে ফিট করা টেলিস্কোপ। আইএসএস চীফ কৈলাস জাঠোর প্রয়োজনে রানাকে মারার জন্যে স্লাইপার পাঠিয়েছে, এটাই ধরে নিতে হয়। সিদ্ধান্তটা সম্ভবত নতুন নয়, সাহায্যের আবেদন নিয়ে তিনি যখন ঢাকায় যান তখনই নেয়া হয়েছিল–বিসিআই বা আইএসআই যাকেই চরসে পাঠাক, বিপদটা কেটে গেলে তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। কারণটা বলতে গেলে স্পষ্টই। নিউক্লিয়ার ওঅরহেড সহ দুটো মিসাইল ঢাকা ও চট্টগ্রামের দিকে তাক করে বসানো হয়েছে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর গোপন 'ওঅর স্ট্র্যাটিজি'-র অংশ হিসেবে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই তারা চায় না যে তথ্যটা পাকিস্তান বা বাংলাদেশ জেনে ফেলুক। জানলে দুনিয়া জুড়ে মহা হৈ-চৈ

পড়ে যাবে। প্রশ্ন উঠবে দূর পাল্লার মিসাইল আর নিউক্লিয়ার ওঅরহেড ভারত পেলই বা কোত্থেকে! তাছাড়া, আর্থিক ক্ষতিটাও হবে মারাত্মক। ভারতীয় পণ্য সামগ্রী বিশাল একটা বাজার হারাবে—ব্যাপারটা জানাজানি হবার পর বাংলাদেশীরা আর কিছু কিনবে না। কাজেই কৈলাস জাঠোর তাঁর প্রতিনিধিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে দ্বিধা করেননি—চরস থেকে ফিরে আসা মাসুদ রানার সঙ্গে কথা বলে দেখতে হবে তথ্যটা সে জানে কি না; জানলে সংকেত দিয়ো, বাকি কাজ স্নাইপাররা সারবে।

লোক পাঠাবার একটা ব্যবস্থা যখন করা গেছে, রানার বদলে ভারতীয় কোন এজেন্টকে পাঠানো হবে।

তবে রানার এ-সব অনুমান যদি নিতান্তই ভুল হয়, ভারতীয় ইন্টেলিজেন্সে লুকিয়ে থাকা পাকিস্তানী এজেন্টরা যদি স্নাইপার দু'জনকে পাঠিয়ে থাকে, সেই ভুলের মাসুল ওকে প্রাণের বিনিময়ে দিতে হতে পারে। কিন্তু এ এমন এক পেশা, ঝুঁকিটা নিতেই হয়; পালানোর বা এড়িয়ে যাবার সুযোগ থাকে না। এখন যেমন নেই। এটাই রঁদেভো, এখানেই কৈলাস জাঠোরের প্রতিনিধি আসবে। চরসে ফিরতে হলে তার সঙ্গে রানার কথা হওয়াটা জরুরী।

কাগজের ঠোঙায় সেদ্ধ ছোলাই হবে, ভবঘুরে টাইপের এক লোক অনবরত একটা একটা করে মুখে পুরছে আর অলস এলোমেলো পা ফেলে হেঁটে আসছে রানার দিকে। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, শার্টের আস্তিন কনুই পর্যন্ত গুটানো, ধুতির প্রান্ত ঘাস আর ধুলোয় লুটাচ্ছে। লোকটা কাছে আসতে সস্তা মদের কড়া ঝাঁঝ ঢুকল রানার নাকে। ওর সামনে দিয়ে চলে গেল সে। তারপর পিছু হটে ফিরে এলো। 'আমি বাঙ্গালী বাবু। চানা-বুট চলবে নাকি? আরে নিন-নিন, খেয়ে দেখুন।'

মনে মনে হাঁপ ছাড়ল রানা। শুদ্ধ বাংলায় কথা বলছে লোকটা। এটাই কোড বা পাসওয়ার্ড। তবে জবাবটা হওয়া চাই হিন্দীতে, রানা বাংলা বললে কৈলাস জাঠোরের প্রতিনিধি ফিরে

যাবে। 'দুঃখিত, ছোলা আমি খাই না। তবে আপনার এই বেহাল অবস্থা দেখে আমার মনে প্রশ্ন জাগছে, আপনিও কি আমার মত আম ও ছালা দুটোই হারিয়েছেন?'

রানার পাশে ধপ করে বসে পড়ল ছদ্মবেশী ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট। 'আম ও ছালা? খুলে বলুন।'

ভুলেও রানা দূরে, টিলাগুলোর দিকে তাকাচ্ছে না। 'চন্দ্রা দেবযানি শয়তানদের হাতে আটকা পড়েছে, আমি তাকে উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়েছি। যে কাজে গিয়েছিলাম, মিসাইল ঘাঁটি দখল করতে, সেই ঘাঁটি দেখার সুযোগ পর্যন্ত পাইনি।'

ভবঘুরের পেশীতে একটু যেন ঢিল পড়ল। 'তারমানে আপনার মিশন সম্পূর্ণ ব্যর্থ। তাহলে আবার সেখানে আপনি যেতে চাইছেন কেন?'

'কেন ফিরে যেতে চাই?' হঠাৎ মুচকি একটু হাসল রানা। 'ফিরে যেতে চাই এক পরমাসুন্দরীর প্রেমের আহ্বানে সাড়া দিতে–বিশ্বাস করুন বা না-ই করুন।'

'মনে হচ্ছে পরকীয়া? সে কি শাহ বকশীর তৃতীয় বিবি?' লোকটা গম্ভীর।

'এত জেরা না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চরসে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দিন,' বলল রানা। 'দেরি হলে চন্দ্রাকে বাঁচানো যাবে না, মিসাইলগুলোর টার্গেটও বদলানো সম্ভব হবে না।'

'মিসাইলগুলোর টার্গেট?' লোকটা এত বড় হাঁ করল, আলজিভ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে।

'শুনুন, চরসে আসলে কি ঘটছে সে-সম্পর্কে আপনাদের কোন ধারণাই নেই,' বলল রানা। 'গোটা ব্যাপারটায় আইএসআই-র হাত রয়েছে। শাহ বকশী পাকিস্তানী এজেন্টদের হাতের পুতুল। মিসাইল ঘাঁটি দখল করার পর ওরা কি করেছে, শুনবেন? সবগুলো মিসাইলের মুখ এদিকে, অর্থাৎ ভারতের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে।

'ভগবান! ও ভগবান!'

'ওঁকে আর কষ্ট দেবেন না এখন, পরে ডাকলেও চলবে,' রানাকে সিরিয়াস দেখাল। 'তার আগে আপনি আমাকে বিদায় করুন।'

দ্বীপে ফেরার পর আবার আগের মতই নাদিরার অবিচ্ছিন্ন ছায়ায় পরিণত হয়েছে কাফ্রী বডিগার্ড। এয়ারস্ট্রিপেই ছিল সে, নাদিরা হেলিকপ্টার থেকে নেমে আসতে একটা গাড়িতে তুলে কেল্লায় নিয়ে এসেছে। কাফ্রী চায়নি, কিন্তু নাদিরার সঙ্গী দুই ইরানী এক রকম জোর করেই গাড়িতে উঠে পড়ে। তাদের ওপর নাকি নির্দেশ আছে নাদিরাকে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখতে হবে।

পত্নী, উপপত্নী আর ক্রীতদাসীরা কেল্লার ভেতরকার একটা প্রাচীর ঘেরা উঠানে গোল্লাছুট খেলছিল, আরামকেদারায় বসে খেলার নামে তাদের হাসাহাসি আর রঙ্গরস উপভোগ করছিল শাহ বকশী। হঠাৎ সেখানে দুই ইরানী প্রহরী ও কাফ্রী বডিগার্ডকে নিয়ে ঝড়ের বেগে হাজির হলো তার তৃতীয় পক্ষ।

নাদিরা রাগে কাঁপছে। 'জনাব বকশী, আপনি সত্যি তাহলে একটা ভণ্ড? আমার সঙ্গেও প্রতারণা করবেন জানলে দ্বিতীয়বার অবশ্যই আমি আপনাকে বিয়ে করতাম না...'

হাত ইশারায় নির্দেশ দিল শাহ বকশী, সঙ্গে সঙ্গে গোটা উঠান খালি হয়ে গেল। আশপাশে, আলো ও ছায়ার ভেতর, তার ইরানী দেহরক্ষীদের শুধু দেখা যাচ্ছে। 'শান্ত হও, বেগম,' নরম সুরে বলল শাহ বকশী। বলতে হলো না, দেহরক্ষীদের একজন একটা আরামকেদারা এনে নাদিরার সামনে রাখল। 'আগে আরাম করে বসো, তারপর যা বলার বলো। তোমাকে একা ফিরতে দেখে বুঝতে পারছি, মাসুদ রানা আমাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। ভাল কথা, আমার আরও তিনজন দেহরক্ষী কোথায়?'

'এ-কথা বলতে আপনার লজ্জা করছে না, জনাব শাহ বকশী?' হিসহিস করে বলল নাদিরা। 'রানাকে পার্টনার করার

প্ল্যানটা আপনি আমার সামনে অনুমোদন করলেন, অথচ আমার সঙ্গে যাদেরকে পাঠালেন সেই দেহরক্ষীদের বলে দিলেন রানাকে তারা যেন খুন করে!' হঠাৎ হেসে উঠল সে। 'আপনার বাকি তিনজন দেহরক্ষী? আপনার জন্যে দুঃসংবাদ হলো, ঘটেছে আসলে উল্টোটা। রানা খুন হয়নি, সে-ই বরং আপনার তিন দেহরক্ষীকে ট্রেন থেকে নদীতে ফেলে দিয়েছে। বিশ্বাস না হয়, বাকি দু'জনকে জিজ্ঞেস করুন, জানালা দিয়ে নিজের চোখে দেখেছে ওরা।'

'বেগম! বেগম! কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে কেন? এ তুমি কেমন কথা বলো! যাকে নিজের মন ও প্রাণ দিয়েছি, তার কথা অবিশ্বাস করব কেন।'

'জনাব বকশী, আজ কিন্তু ছেলেভোলানো নরম কথায় কাজ হবে না!' সাবধান করে দিয়ে বলল নাদিরা। 'আপনাকে এখুনি প্রমাণ করতে হবে যে রানাকে খুন করার নির্দেশ আপনি দেননি। তা না হলে...তা না হলে ডিভোর্স তো আপনাকে করবই, তারপর যেখানে যত লোক আছে আমার সবাইকে আপনার ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়ার নির্দেশ দেব। বুঝতেই পারছেন, আমি নির্দেশ দেয়ার পর এক ঘণ্টাও পার হবে না, ভারতীয় এয়ারফোর্সের ঝাঁক ঝাঁক জেট ফাইটার আর হেলিকপ্টার গানশিপ চরসের মাথায় চক্কর দেবে...'

'প্লীজ, বেগম, তুমি বসো!' অনুরোধ করল শাহ বকশী। 'বিশ্বাস করো, তোমার অভিযোগ সত্যি নয়। মাসুদ রানাকে আমাদের দরকার, তাকে আমি খুন করার নির্দেশ দিতে পারি না– দিইওনি! এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার ঘটেছে।'

'আপনার দুই দেহরক্ষীকে প্রশ্ন করা হোক, শোনা যাক কি বলে ওরা।' তাদের দিকে তাকাল নাদিরা। 'এই, তোমরা চুপ করে আছ কেন? আমাকে বলোনি, রানাকে মারার জন্যে জনাব শাহ বকশীর স্পষ্ট নির্দেশ পেয়েছ তোমরা?'

দুই দেহরক্ষী মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল, কারও মুখে কথা নেই।

আরও কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করার পর হেসে উঠল নাদিরা। 'জনাব শাহ্ বকশী, ওদের এই চুপ্ করে থাকার কি অর্থ করব আমরা?'

'গোটা ব্যাপারটার মধ্যে আমি গভীর ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছি, বেগম,' ভারি গলায় বলল শাহ্ বকশী, থমথম করছে চেহারা। 'কোন একটি মহল চায়নি মাসুদ রানার সঙ্গে হাত মেলাই আমরা। হয়তো আমাকে আর তোমাকে হত্যা করে চরসে অভ্যুত্থান ঘটাবার প্ল্যান আছে তাদের, সেজন্যেই চায়নি রানা এসে আমাদের প্রতিরক্ষা আরও শক্তিশালী করুক।'

'তাহলে তো ষড়যন্ত্রকারীদের বিচার হওয়া উচিত, তাই না?' নাদিরার গলায় চ্যালেঞ্জের সুর।

'হওয়া উচিত?' আরও গম্ভীর হলো শাহ্ বকশী। 'বলো, হয়ে গেছে। ওদেরকে আমি মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি, এই মুহূর্তে কার্যকরী করা হবে। আকমল! আলিজান! নিজেদের সপক্ষে তোমাদের কিছু বলার আছে?'

এবারও দুই ইরানী চুপ করে থাকল, মাথা আগের মতই নত।

'তারমানে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করছ তোমরা। বেশ...'

হঠাৎ মুখ তুলে আকমল বলল, 'হুজুর, সত্যি কথা বললে প্রাণ যাবে, মিথ্যে কথা বললেও বাঁচব না, কাজেই মরার আগে সত্যি কথাটাই বলে যাই। রানাকে খুন করার নির্দেশ আপনিই আমাদেরকে দিয়েছেন। আমাদের দোষ একটাই–আপনি নিষেধ করা সত্ত্বেও ব্যাপারটা বেগমসাহেবার কাছে গোপন রাখতে পারিনি।'

'ষড়যন্ত্র! গভীর ষড়যন্ত্র!' বড় করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল শাহ বকশী। 'ডাহা মিথ্যেকথা বলছে। হঠাৎ শিরদাঁড়া খাড়া করে বিকট হাঁক ছাড়ল, 'লীডার জানবাজ! ফায়ারিং স্কোয়াড–জলদি!'

ছায়ার ভেতর থেকে পিল পিল করে বেরিয়ে এলো আরও অনেক দেহরক্ষী। তাদের লীডার জানবাজ নির্দেশ দিল, আকমল ও আলিজানকে উঁচু প্রাচীরের ওদিকে নিয়ে যেতে হবে। পাঁচিলের দিকে পিছন ফিরে দাঁড় করানো হলো তাদের। দশ গজ সামনে রাইফেল হাতে পজিশন নিল চারজন দেহরক্ষী। মুখ না খোলার শপথ নিয়ে শাহ বকশীর সেবা করতে সেই সুদূর ইরান থেকে এসেছে তারা, সেই শপথ ভেঙে কেউ চায় না নিজের বিপদ ডেকে আনতে। তাদেরই দুই স্বদেশী সঙ্গীকে বিনা অপরাধে খুন করা হচ্ছে, বুঝেও কিছু করার নেই।

নাদিরাও ব্যাপারটা বুঝল। সে হুমকি দেয়ায় শাহ বকশী তাকে শান্ত করার জন্যে বিচারের নামে এই প্রহসন শুরু করেছে। সে যাই হোক, ইরানী দেহরক্ষীদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠার এই সুযোগটা নাদিরা ছাড়বে না। 'জনাব শাহ বকশী, ওদের অপরাধ এত মারাত্মক নয় যে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে,' আবেদনের সুরে বলল সে। 'দয়া করে আমার একটা অনুরোধ রাখুন, ওদেরকে ক্ষমা করে দিন...'

'না!' প্রবলবেগে মাথা নাড়ল শাহ বকশী। 'শুধু ষড়যন্ত্র পাকায়নি, আমাকে মিথ্যেবাদী বলে অপমানও করল। জানবাজ!'

অনেক কষ্ট করে নাদিরা চোখে পানি এনে ফেলেছে। 'আপনার পায়ে পড়ি...'

জানবাজ গর্জে উঠল। 'ফায়ার!'

সেই পুরানো ছক, তবে প্রতিবার নতুনের মতই কাজ দেয়। বরোদার সদর থানা এলাকায় গুরুতর একটা অপরাধ করে পুলিসের হাতে গ্রেফতার হলো মুকুন্দ চোপরা।

এক কলেজের মাঠে দাঁড়িয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে সাদা পাউডার অর্থাৎ হেরোইন বিক্রি করছিল রানা, নামের সঙ্গে চেহারা-সুরতও আমূল বদলে নিয়েছে। খবর পেয়ে গোটা কলেজ

ঘেরাও দেয় পুলিস। ওর কাছে পিস্তল ছিল, একাই পুলিসের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়। অবশ্য শেষ রক্ষা হয়নি, পুলিস তাকে পিস্তল ও হেরোইন সহ গ্রেফতার করে বরোদার পুরানো জেলখানায় পাঠিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষ এরকম বিপজ্জনক অপরাধীকে এই পুরানো জেলখানায় রাখতে রাজি নয়, তারা খুব তাড়াতাড়ি একটা ভ্যানগাড়ির ব্যবস্থা করে চোপরাকে বরোদার নতুন জেলখানায় পাঠাবার আয়োজন করল। ওটা খুব দুর্ভেদ্য করে বানানো হয়েছে, পাহারাও খুব কড়া, ফলে কারও পক্ষে পালানো সম্ভব নয়। তবে নতুন জেলখানা অনেক দূরে, যেতেও হবে গভীর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। ভ্যানগাড়িতে তাই দশজন সশস্ত্র পুলিস দেয়া হলো। আরেকটা জীপ থাকবে ভ্যানগাড়ির পিছনে, তাতেও পুলিস থাকবে দশজন। আর অভিযুক্ত ব্যক্তির হাতে তো হাতকড়া থাকবেই।

পুরানো জেলখানায় খিজির পাশা নামে একজন কয়েদী আছে, অন্যান্য কয়েদীরা তাকে দেখামাত্র ঢোক গেলে, অর্থাৎ তাদের গলা শুকিয়ে যায়। দেহটা ছোটখাট একটা বাড়ির সাইজ হলেও, খিজির পাশার আচরণ বা হাবভাব কিন্তু বাচ্চা একটা ছেলের মতই নিরীহ ও সরল, বোকা বোকা হাসিটা সারাক্ষণই লেপ্টে আছে মুখে। তাহলে সবাই তাকে দেখে ভয় পায় কেন? ভয় পায়, কারণ, হাসতে হাসতে নিজের জীবনের এমন সব অভিজ্ঞতা আর ঘটনার কথা বলে পাশা, যা শুনলে যে-কোন মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়বে।

এক তরুণী, তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়াই, দুপুরে রুটি খেতে দিতে দেরি করায় প্রথমে তার মুখে কাপড় গুঁজে দেয় পাশা, তারপর ছুরির ডগা দিয়ে খুঁচিয়ে চোখ দুটো তুলে নেয়। সেবার তরুণীকে প্রাণে মারেনি সে, এবার থেকে সময় মত খেতে দেয়ার প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়ে ছেড়ে দেয়। তরুণীর স্বামী হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে স্ত্রীর চিকিৎসা করায়, তবে আসল ঘটনা চেপে গিয়ে

ডাক্তারদের জানায় বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল। ডাক্তাররা অবাক হলেও, কেউ তারা এ-বিষয়ে বিশেষ মাথা ঘামায়নি। পরিবারটি ছিল অত্যন্ত দরিদ্র, তাদের বাড়িতে ঘন ঘন ডাকাত পড়বে কেন? তাছাড়া, ডাকাতরা টাকা-পয়সা নিতে আসে, না হাত-পা কাটতে? এর আগে এই মহিলার স্বামী নিজে দু'বার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল—একবার ডাকাতরা তার ডান পা হাঁটু পর্যন্ত কেটে নিয়ে যায়, আরেকবার বাম হাত কনুই পর্যন্ত।

এই ঘটনার পর ছ'মাস পার হয়ে গেছে। সেই চক্ষুহীন তরুণী খিজির পাশাকে ঘড়ির কাঁটা ধরে সময় মতই ডাল-রুটি খেতে দেয়, ভুলেও কখনও দেরি করে না। কিন্তু একদিন হলো কি, ঘরে ডাল বা অন্য কিছু না থাকায় পাশার জন্যে শুধু রুটি তৈরি করে রাখল সে। দুপুরবেলা বাড়ি ফিরল পাশা। শুধু রুটি দেয়া হয়েছে দেখে খুব হাসি পেয়ে গেল তার।

জেলখানায় বসে এই গল্পটা বহুবার লোকজনকে শুনিয়েছে পাশা, প্রতিবার আগেই বলে নিয়েছে কোন ব্যাপারে তার যদি খুব বেশি হাসি পেয়ে যায় তাহলে সেটা খুব বিপদের কথাই।

শুধু রুটি দেখে প্রচণ্ড হাসি পেল পাশার, সেই হাসি থামাবার জন্যে তরুণীকে জবাই করতে হলো তার; কিন্তু তাতেও যখন হাসি থামার কোন লক্ষণ দেখা গেল না তখন বাধ্য হয়ে হাড় থেকে ছাড়িয়ে চুলোয় মাংস চড়িয়ে দিল সে, আর হাড়সহ বাকি বর্জ্য বাড়ির পিছনের উঠানে পুঁতে রেখে এলো, তার মাকে যেখানে কবর দেয়া হয়েছে।

তরুণীর প্রৌঢ় স্বামী বাড়ি ফিরল আরও দু'ঘণ্টা পর। পাশা দু'জনের জন্যেই খাবার বাড়ল, রুটি ও মাংস। 'তোমার মা কোথায়?' লোকটার প্রশ্ন শুনে পাশার শুধু হাসি পেতে লাগল। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রাখল সে, কারণ জানে একবার হাসিটা শুরু হলে তার হাত থেকে লোকটারও রেহাই নেই।

খাওয়াদাওয়া শেষ হবার পর আবার লোকটা জিজ্ঞেস করল,

'তোমার মা কোথায় বলছ না কেন?'

এবার পাশা জবাব দিল, 'আমার মা তো অনেক আগেই কবরে চলে গেছে। তুমি আসলে তোমার দ্বিতীয় স্ত্রীর কথা জিজ্ঞেস করছ। এই তো, এইমাত্র তাকে আমরা মজা করে খেলাম।'

লোকটা হাঁ করল। মনে হলো বমি করবে।

পাশা আবার বলল, 'বাবা, সময় থাকতে পালাও; আমার কিন্তু প্রচণ্ড হাসি পাচ্ছে!'

শুধু যে সৎমাকে তা নয়, খিজির পাশার কথা সত্যি হলে সে তার ত্রিশ বছরের জীবনে বাহান্নটা মেয়েকে ধর্ষণ করেছে, তাদের মধ্যে ধর্ষণের পর গলা টিপে বা ছুরি মেরে খুন করেছে অন্তত বিশজনকে। না, অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, তার বিরুদ্ধে ধর্ষণ বা খুনের অভিযোগে কোন মামলা দায়ের করা হয়নি।

বরোদার এক পারসী পরিবারে জন্ম খিজির পাশার, ঘুরে ঘুরে গুজরাটের বিভিন্ন এলাকায় থাকা হয়েছে তার, বন্ধু-বান্ধব পেয়েছে বেশিরভাগই হিন্দু। গুজরাট দাঙ্গাপ্রবণ এলাকা, হিন্দুদের সঙ্গে দলবেঁধে মুসলমানদের তাড়া করতে বেরুত। তখনই মানুষ খুন আর নারী ধর্ষণের প্রথম স্বাদ পায় সে। এরপর চলে যায় চরস দ্বীপে।

চরসে থানা-পুলিসের ঝামেলা নেই। জেলেদের মেয়ে-বউ দেখলেই তার হাসি পায়, সেই হাসি লাগামহীন হয়ে ওঠে তারা ভয় পেয়ে পালাবার চেষ্টা করলে। তখন তাদেরকে ধাওয়া না করে আর উপায় থাকে না।

সে-সময় শাহ বকশী চরসে তার নতুন ধর্মীয় দর্শনের প্রচার খুব জোরেশোরে শুরু করেছে। বিশেষ করে তার এই কথাগুলো খিজির পাশাকে সম্মোহিত করে ফেলল, 'অপরাধ করে শাস্তি এড়ানো কোন ব্যাপার নয়। মহান শয়তানের পুজো করলেই সব মাফ হয়ে যাবে। অপরাধ করে মানুষ মজা পায়—ঈশ্বর যতই মানা

করুন, শয়তান চায় না মানুষ সেই মজা থেকে বঞ্চিত হোক। যে যত পারো অন্যায়-অপরাধ করো, তবে তা করার আগে মহান শয়তানের কাছ থেকে লাইসেন্সটা চেয়ে নিতে ভুলো না…'

'আমি চিরকাল আপনার ক্রীতদাস হয়ে থাকতে চাই!' ঠাস করে শাহ্ বকশীর পায়ের কাছে সটান আছাড় খেয়ে পড়ল খিজির পাশা। তার কীর্তিকলাপের কথা কিছু কিছু আগেই শাহ্ বকশীর কানে গিয়েছিল, খুশি মনেই তাকে দীক্ষা দিল সে। তার বিরোধিতা করছে, এমন কিছু জেলে সর্দারকে হুমকি-ধামকি দিয়ে চরস থেকে ভাগাবার দায়িত্বও দিল।

দু'দিন পর পাঁচজন সর্দারের লাশ গাছের ডালে ঝুলতে দেখা গেল। শাহ্ বকশী আড়ালে ডেকে পাশাকে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার? সর্দাররা মারা গেল কিভাবে? লাশ ঝোলানোই বা হলো কেন?'

'মারা গেল দম বন্ধ হয়ে,' জবাব দিল পাশা। 'গলা টিপে ধরেছিলাম। লাশ ঝোলানো হয়েছে সম্ভাব্য বিরোধিতাকারীদের মনে ভয় ধরাবার জন্যে।'

সেই থেকে শাহ্ বকশীর ডান হাত হয়ে উঠল খিজির পাশা। যখনই যাকে খুন করার প্রয়োজন হোক, শাহ্ বকশী পাশাকে ডেকে লোকটার ব্যবস্থা করতে বলে। চব্বিশ ঘণ্টাও পেরোয় না, লোকটা মারা যায়। আরও একটা কঠিন কাজ করতে হত পাশাকে। দ্বীপে যত চরস তৈরি হয় সব পানির দরে কিনে নেয় শয়তানের পদলেহী শাহ্ বকশী, ইরান ও ইরাক থেকেও প্রচুর আফিম আর হেরোইন আমদানি করে সে। সুরাট ও বরোদায় তার গোপন গুদাম আছে, সেখান থেকে পাইকারদের কাছে সাপ্লাই দেয়া হয় চরস আর হেরোইন। এই কাজটার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে হয়েছে পাশাকে। ঝুঁকি থাকলেও, খুব কঠিন কোন কাজ নয়। গুদামের ভেতর বেচাকেনা চলে 'এক হাতে টাকা, এক হাতে মাল,' এই পদ্ধতিতে। শুধু পরিচিত পাইকারদেরই ঢুকতে দেয়া

হয় গুদামে। ড্রাগস বিক্রির টাকা ট্রাকে তুলে নিয়ে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে একটা পরিত্যক্ত জেটিতে পৌঁছায় সে, ওখানে হাজির হয় একটা জেলে নৌকা। ওই নৌকায় চড়ে চরসে ফিরে আসে পাশা, সঙ্গে থাকে বস্তা বস্তা টাকা।

বলাই বাহুল্য, এমন যোগ্য ডান হাতকে খুবই পছন্দ করত শাহ্ বকশী। কিন্তু সেই পাশা হঠাৎ একদিন বলতে গেলে তার বুকেই ছোবল মেরে বসল। কিভাবে?

শাহ বকশী নতুন একটা দায়িত্ব দিয়ে বলেছিল, তার হারেমে কি ঘটে না ঘটে পাশা যেন সেদিকে একটু খেয়াল রাখে। খেয়াল রাখতে গিয়ে শাহ বকশীর সবচেয়ে সুন্দরী উপপত্নীকে দেখে ফেলল পাশা, আর দেখেই তার হাসি পেয়ে গেল। ধর্ষিতা উপপত্নী ভয় দেখাল, শাহ বকশীকে সব বলে দেবে সে। কাজেই তাকে খুন করে লাশও গুম করতে হলো পাশার। গোটা ব্যাপারটা কিন্তু হারেমের অনেক তরুণীই দেখল বা আন্দাজ করতে পারল। এক সময় কথাটা শাহ্ বকশীর কানেও গেল। রাগে ফেটে পড়ল সে, ইরানী দেহরক্ষীদের নির্দেশ দিল, 'শালাকে জ্যান্ত ধরে আনো!'

কিন্তু পাশাকে পেলে তো ধরে আনবে। চরস থেকে বরোদায় পালিয়ে আসে সে। দু'দিন পর পুলিস হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় তাকে।

পাশা আসলে হেরোইন বিক্রি করার জন্যে নিজেদের গুদামে ঢুকেছিল, আর ঠিক ওই সময় পুলিস সেখানে হানা দেয়। ওখানে শাহ্ বকশীর আরও লোকজন ছিল, তাদের সঙ্গে পুলিসের গুলি বিনিময় হয়, তাতে একজন পুলিস মারা যায়। সবাই পালিয়ে গেলেও, মাতাল অবস্থায় থাকায় পাশা পালাতে পারেনি। পুলিস তাকে ধরে এনে হত্যা মামলায় ঝুলিয়ে দিয়েছে। তবে হাজারো জেরা ও টরচার করা সত্ত্বেও গুদামের মালিকের নাম প্রকাশ করেনি পাশা। তার ধারণা, এত বড় উপকার করায় শাহ্ বকশী

নিশ্চয়ই তাকে ক্ষমা করবেন। তো একেবারে শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, বিপজ্জনক হাজতী মুকুন্দ চোপরার সঙ্গে আরেক বিপজ্জনক হাজতী খিজির পাশাকেও নতুন জেলখানায় পাঠিয়ে দেয়া হবে।

ভ্যানগাড়িতে তোলার আগে দুই হাজতীকে একই সেলে রাখা হলো। ইতিমধ্যে জেলখানার সবাই জেনে ফেলেছে কি অপরাধে ধরা পড়েছে চোপরা। খিজির পাশার বুদ্ধিশুদ্ধি তেমন প্রখর না হলেও, তার মনে কিছু একটা সন্দেহ জাগলেও জাগতে পারে। বরোদা শহরের হেরোইন ব্যবসা সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা আছে তার, সংশ্লিষ্ট বহু লোককে চেনে। চোপরা জেনুইন একজন হেরোইন বিক্রেতা কি না পরখ করার জন্যে নানা প্রশ্ন তুলল সে।

কৈলাস জাঠোরের প্রতিনিধি বাঙ্গালী বাবু রানাকে ব্রিফ করার সময় প্রয়োজনীয় সব তথ্যই সরবরাহ করেছে, রানাও সে-সব মুখস্থ করে নিয়েছে, ফলে পাশাকে বোকা বানাতে ওর কোন অসুবিধে হলো না।

পাশার যা স্বভাব, চোপরাকে সে তার ভাগ্য বিপর্যয়ের গল্পটা শোনাল। শাহ বকশী একজন পয়গম্বর, এ-কথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে সে, কাজেই সেই মহান ধর্মগুরুর উপপত্নীকে ধর্ষণ ও খুন করা নির্ঘাত মহাপাপ। তবে ইদানীং পাশার বারবার একটা কথা মনে পড়ছে। শাহ বকশী তাকে বলেছেন, 'যত খুশি পাপ করো, মহান শয়তানের পুজো করলে তিনি তোমাকে ক্ষমা করবেন।' পাশা এখন ভাবছে, মহান শয়তান যদি যে-কোন পাপ ক্ষমা করতে পারেন, তাঁর প্রেরিত পুরুষ হয়ে শাহ বকশী কেন তাকে ক্ষমা করতে পারবেন না?

কিন্তু ক্ষমা পেতে হলে শাহ বকশীর পায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে তা চাইতে হবে, তাই না? কাজেই জেল ভেঙে পালাতে হবে পাশাকে। পুরানো কয়েকজন কয়েদীর সঙ্গে এ-বিষয়ে আলাপ হয়েছে তার। পালানো সম্ভব বলে জানিয়েছে তারা,

যদিও তাদের কাছ থেকে সাহায্যের কোন প্রতিশ্রুতি আদায় করতে পারেনি সে।

কে জানে আজ কি ঘটতে চলেছে। জেলে ঢোকার পর আজই প্রথম বাইরে বেরুবার সুযোগ পাচ্ছে পাশা। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে দীর্ঘ একটা পথ পাড়ি দিতে হবে। সারারাত চলবে গাড়ি। নতুন জেলখানায় পৌঁছাতে নির্ঘাত সকাল হয়ে যাবে। তার আগে অনেক কিছুই ঘটতে পারে। যদি কোন সুযোগ পাওয়া যায়, চোপরা কি সেটা গ্রহণ করবে—পালাবে?

পাশার প্রশ্ন শুনে চমকে ওঠার ভান করল রানা, তারপর হাঁ করে তাকিয়ে থাকল তার দিকে, ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে হাত বুলাতে ভুলে গেছে।

'কি ভাই, চোপরা, তুমি অমন চমকে উঠলে কেন? তোমার মনের কথা বলে ফেলেছি, তাই না? অস্বীকার কোরো না, আমি জানি, আমার মত তুমিও পালাবার কথা ভাবছ। বলো না, ভাই, সত্যি কোন ব্যবস্থা করতে পারবে…?'

'কই, না, কোথায় আমি চমকালাম!' দ্রুত মাথা নেড়ে প্রতিবাদ করল রানা। 'তুমি ভুল দেখেছ।'

'আমার চোখকে তুমি ফাঁকি দিতে পারোনি…'

'বেশ, ভাল কথা, পারিনি,' রেগে উঠে বলল রানা। 'পালাবার কোন প্ল্যান আমার যদি থেকেও থাকে, তোমাকে সে-সব কেন বলতে যাব? তোমাকে আমি চিনি? তুমি আমার কোন্ উপকারে আসবে?'

মনে মনে নিজের মাথায় হাত বুলাচ্ছে খিজির পাশা, সেই সঙ্গে উপদেশও দিচ্ছে—মাথাটা ঠাণ্ডা রাখো…এই লোক আজই পালাবে…নিশ্চয়ই কোন আয়োজন করা আছে…ভাল করে চেপে ধরলে তোমাকেও সঙ্গে নেবে। শান্ত সুরে রানাকে বলল, 'হ্যাঁ, আসব; অবশ্যই আমি তোমার অনেক বড় উপকারে আসব।'

মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল রানা। 'নাহ্, থাক, আমার কোন

উপকার লাগবে না। অচেনা লোককে বিশ্বাস করলে ঠকতে হয়, এ আমার জানা আছে।'

'নতুন পয়গম্বর শাহ বকশীর নাম তুমি যদি এখনও না শুনে থাকো,' নরম সুরে বলল পাশা, 'কথা দিচ্ছি, দু'চারদিনের মধ্যেই লোকজনের মুখে মুখে শুনতে পাবে। শুধু ভারতের নয়, গোটা দুনিয়ার মানুষ তাকে চিনতে পারবে। আর আমি ছিলাম সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহামানবের ডান হাত। আমাকে তুমি অচেনা মানুষ বলো কি করে!'

'তা, আমার তুমি কি উপকারে আসবে, শুনি?' তাচ্ছিল্যের সুরে জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমাদের আছে কয়েকশো কোটি টাকার ড্রাগ ব্যবসা,' ধীরে ধীরে বলল পাশা। 'শাহ বকশীকে বললে তোমার মত অভিজ্ঞ লোককে লুফে নেবেন তিনি। তখন তোমাকে খুচরো হেরোইন বেচতে গিয়ে পুলিসের ধাওয়া খেতে হবে না।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' বিরক্তি দেখিয়ে বলল রানা। 'আগে সময় হোক, তখন দেখা যাবে তোমাকে নিয়ে কি করা যায়।'

অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল ওরা। এক সময় ভোর হয়ে এলো, অথচ সেলের দরজা খুলে ওদেরকে কেউ নিতে এলো না। উদ্বেগে আর উত্তেজনায় অস্থির খিজির পাশার একটাই আশঙ্কা, কর্তৃপক্ষ হয়তো তাদেরকে স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত বাতিল করেছে। দু'রাত ঘুমায়নি, রানা ক্লান্ত; তারপরও অভিনয়টা চালিয়ে যেতে হচ্ছে–মুচকি, রহস্যময় একটু হেসে তাকে জানাল, 'কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হয়, বুঝলে। যারা আমাকে আটকেছে, তারাই আমাকে চলে যেতে দেবে। কথায় আছে না, টাকার মাথায় বুড়োর বিয়ে। দেরি হচ্ছে…হতেই পারে, নিখুঁত আয়োজন করতে সময় লাগে।'

ভোর পাঁচটায় সেন্ট্রিরা এসে নিয়ে গেল ওদের। প্রথমে অবশ্য

দু'জনের হাত পিছন দিকে নিয়ে গিয়ে হাতকড়া পরানো হলো। ভ্যান গাড়িটা বেশ বড়, ওরা ছাড়াও রাইফেল হাতে দশজন পুলিস উঠল তাতে। পুলিসরা বসল দু'পাশের বেঞ্চে। রানা আর পাশাকে বসতে দেয়া হলো ভ্যানের একদম পিছনে, আড়াআড়ি করে ফেলা বেঞ্চে।

ওদের পিছু নিয়ে একটা জীপও রওনা হলো, তাতেও ঠাসাঠাসি করে দশজন পুলিস বসেছে, সবার হাতে অটোমেটিক রাইফেল।

প্রথম এক ঘণ্টা কিছুই ঘটল না। গাড়ি দুটো শহর ও লোকবসতি পিছনে ফেলে জঙ্গলের ভেতর নির্জন রাস্তা ধরে ছুটছে। হেড কনস্টেবল বেঞ্চ ছেড়ে একবার উঠল। প্রথমে খিজির পাশার হাতকড়া পরীক্ষা করল, তারপর রানার। ভ্যানে তোলার আগে সেই ওদেরকে হাতকড়া পরিয়েছে। হাতকড়ায় তালা দেয়ার পর চাবির গোছাটা তাকে পকেটে ভরে রাখতেও দেখেছে ওরা। নতুন থানায় রানার সঙ্গে ওর অস্ত্র ও কাগজ-পত্রও পাঠানো হচ্ছে, সে-সব একটা চামড়ার ব্যাগে ভরে কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়েছে সে।

আরও এক ঘণ্টা পার হলো। এখনও কিছু ঘটছে না। শুধু আবার সে-ই হেড কনস্টেবল বেঞ্চ ছেড়ে উঠে এসে রানা ও পাশার হাতকড়া পরীক্ষা করল। তবে একটু পরই একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করল পাশা। ব্যাপারটা চোখে পড়ার মত নয়, সে শুধু রানার পাশে একেবারে গা ঘেঁষে বসে থাকায় অনুভব করতে পারল।

রানার হাত ও কাঁধের পেশী আড়ষ্ট হয়ে উঠছে। পাশার সন্দেহ হলো, শিরদাঁড়ার কাছে হাত দুটো মোচড়াচ্ছে রানা।

একটু সরে বসে বেঞ্চে হেলান দিল পাশা। আড়চোখে তাকিয়ে রানার পিঠের দিকটা দেখার চেষ্টা করল। হঠাৎ স্থির হয়ে গেল রানা, একেবারে পাথরের মূর্তি, তবে দু'চোখে তীব্র তিরস্কার। তাকিয়ে থাকতে নিষেধ করছে, বুঝতে পেরে ঘাড়

ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকাল পাশা। তবে তা মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্যে। আবার বেঞ্চে হেলান দিয়ে রানার হাত দুটো দেখার চেষ্টা করল সে।

চোখ রাঙাবার সময় নেই, নিজের কাজে ব্যস্ত রানা। ওর ডান হাতের দু'আঙুলে ধরা হাতকড়া খোলার লম্বা ও চকচকে একটা চাবি দেখতে পেল পাশা। চাবিটা হ্যান্ডকাফের কী-হোলে ঢোকাবার চেষ্টা হচ্ছে।

রানা সরাসরি না তাকিয়েও টের পেল, ঝট করে হেড কনস্টেবলের দিকে তাকাবার ঝোঁকটা অনেক কষ্টে একেবারে শেষ মুহূর্তে সামলে নিল পাশা। এরপর বেশ কয়েক মুহূর্ত করুণ দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল সে। রানা নির্বিকার, এমন কি চেহারায় কোন সহানুভূতির ছাপও নেই। ধীরে ধীরে পাশার হাবভাব বদলাতে শুরু করল। চোখ গরম করে নিরবে হুমকি দিচ্ছে—তাকেও পালাবার সুযোগ করে দিতে হবে, তা না হলে পুলিসদের সবাইকে বলে দেবে রানা কি করছে।

মনে মনে হাসল রানা। ভাব দেখাল, ও ভয় পেয়েছে। তারপর ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে বুঝিয়ে দিল, তাকেও পালাতে সাহায্য করা হবে।

খানিক পর চোখ ইশারা করতে আবার রানার গা ঘেঁষে বসল পাশা। ইতিমধ্যে নিজের হাত মুক্ত করেছে রানা, এবার নিজের চাবিটা পাশার ডান হাতের আঙুলের ফাঁকে গুঁজে দিল।

দশ মিনিট পর পুলিসরা ফিসফাস শুরু করল। কি ব্যাপার? না, জীপটা এত বেশি পিছিয়ে পড়েছে যে অনেকক্ষণ হলো সেটাকে পিছনে দেখাই যাচ্ছে না।

আরও দশ মিনিট পর ড্রাইভারকে নির্দেশ দেয়া হলো, ভ্যান থামাও। ড্রাইভার নির্দেশটা পালন করল আরও কয়েক মিনিট পর। সে ভ্যান থামাল ফাঁকা একটা জায়গার মাঝখানে, চারপাশে গাছপালায় ঢাকা মাটির টিলা দেখা যাচ্ছে।

জীপের জন্যে অপেক্ষা করার সময় পুলিসরা ভ্যান থেকে নেমে কেউ প্রস্রাব করতে বসল, কেউ গাছের গুঁড়ির ওপর বসে সিগারেট ধরাল। একেবারে অপ্রস্তুত অবস্থাই বলতে হবে। রানা ও পাশাকে পাহারা দেয়ার জন্যে একা শুধু হেড কনস্টেবল বসে আছে ভ্যানের পিছনে।

অকস্মাৎ এক সঙ্গে সাত-আটটা অটোমেটিক রাইফেল গর্জে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ভ্যানের একদিকের সবগুলো চাকা বিস্ফোরিত হলো, মাকড়সার জাল হয়ে গেল সামনের উইন্ডস্ক্রীন, ভ্যানের পিছন দিকেও অন্তত একটা গুলি ঢুকল—অর্থাৎ হামলা তিনদিক থেকে শুরু হয়েছে।

একে তো অপ্রস্তুত অবস্থা, তার ওপর কোন আড়াল না থাকায় ভ্যানের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে বা বসে থাকা পুলিস কনস্টেবলরা শৃংখলা হারিয়ে পাগলের মত চারদিকে ছুটোছুটি শুরু করল। তাদেরকে যার নেতৃত্ব দেয়ার কথা, সে-ই হেড কনস্টেবলই যেখানে ভ্যানের পিছনের মেঝেতে পড়ে রক্তে ভেসে যাচ্ছে, তখন আর এরচেয়ে ভাল কি-ই বা আশা করা যায়—বিশেষ করে সেই রক্ত যদি পলিথিনে ভরে নিয়ে আসা ঘন রঙ হয়।

কে জানে কারা কেন হামলা করল, তবে কয়েক পশলা গুলি করে পিছু হটতে শুরু করল তারা। এতক্ষণে যেন বীরত্ব দেখাবার একটা সুযোগ পেল পুলিসরা। গুলি করতে করতে পিছু ধাওয়া করল তারা।

ঠিক ওই সময় ভ্যানের পিছন থেকে লাফ দিল রানা, তবে লাফ দেয়ার আগে 'আহত' হেড কনস্টেবলের কাঁধ থেকে চামড়ার ব্যাগটা নিতে ভোলেনি।

দৌড়! দৌড়! দৌড়!

কখনও রানা আগে তো কখনও পাশা। এভাবে প্রায় চল্লিশ মিনিট। হাঁপাতে হাঁপাতেই কথা হচ্ছে। পাশা বলছে, 'এই জঙ্গলের প্রতিটি গাছ তার চেনা, কাজেই পথ-প্রদর্শক হওয়া তারই

সাজে।'

রানা বলল, 'উপকারের কথাটা কিন্তু ভুলো না।'

উত্তরে পাশা বলল, 'ফোনে শুধু এই কথাটা বলব যে আমি মুক্ত। শাহ্ বকশী কেমন খুশি হন, নিজের কানেই তুমি শুনতে পাবে। হবেন না, আমি যে তাঁর ডান হাত! তারপর তোমার প্রসঙ্গ তুলব। বলব, অত্যন্ত গুণী একজন মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছি, তার হাতে আমাদের ড্রাগস-এর ব্যবসাটা ছেড়ে দেয়া যায়। তোমাকে কিন্তু ভাই দীক্ষা নিতে হবে! আরে, সে যে কি মজার ব্যাপার, কি বলব। যতই অপরাধ করো, তোমার কোন পাপ বা শাস্তি হবে না...'

'ফোন?' রানার চোখে প্রশ্ন।

'সাধে কি বলছি আমাকে সামনে থাকতে দাও!' ছোটার গতি বাড়িয়ে দিল পাশা। তুমি একটু আস্তে-ধীরেই এসো, মহামান্য শাহ্ বকশীর সঙ্গে আলাপটা আমি গোপনেই সারতে চাই।'

তাছাড়া এমনিতেও বেশ একটু পিছিয়ে পড়ল রানা। শোল্ডার হোলস্টার, ওয়ালথার, কাগজ-পত্র ও ছুরিটা বের করে নিয়ে চামড়ার ব্যাগটা একটা ঝোপের ভেতর ফেলে দিল। বগলের কাছাকাছি বাহুর ভেতর দিকে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকে রাখল খাপ সহ ছুরিটা। শোল্ডার হোলস্টার পরে তাতে পিস্তল ভরার আগে দেখে নিল লোড করা আছে কি না। মুকুন্দ চোপরার পরিচয়-পত্র, ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদি রাখল শার্টের বুক পকেটে। আবার ছুটতে শুরু করে কেন যেন হঠাৎ গা-টা ছমছম করে উঠল রানার। একবার মনে হলো, কি যেন শুনতে পেয়েছে। এদিকে কোন নদী বা খাল আছে কিনা ওর জানা নেই। শুনলেও শব্দটা ঠিক চিনতে পারেনি—একবার মনে হচ্ছে ছুটে চলা পানির কলকল, আরেকবার মনে হচ্ছে খুবই ছোট কোন শিশুর হাসি।

সামনে কোথাও পাশাকে দেখা যাচ্ছে না। চিন্তায় পড়ে গেল রানা। বোঝা বা ঝামেলা মনে করে ওকে ফেলে পালায়নি তো?

ঝোপের ভেতর একটা কাঁটাতারের বেড়া দেখল রানা। তবে অবিচ্ছিন্ন নয়। বড় একটা ফাঁক পেয়ে ভেতরে ঢুকল ও, ঢুকেই আঁতকে উঠল। ধারাটা মন্থর হয়ে এসেছে, তবে একেবারে কাছে চলে আসায় আওয়াজটা এখন আবার শুনতে পাচ্ছে রানা। দ্বিখণ্ডিত একটা লাশ, ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে মাথাটা। পাশেই পড়ে রয়েছে বড় একটা ছোরা ও রাইফেল। লাশটা একজন বনরক্ষীর, অন্তত ইউনিফর্ম দেখে তাই মনে হলো।

হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার বুক। জঙ্গলের ভেতর কাঁটাতারের বেড়া কেন? এই বনরক্ষীই বা এখানে কি করছিল? এটা কি তাহলে অ্যাসিস্ট্যান্ট ফরেস্ট অফিসারের বাংলোর পিছন দিক?

'পাশা!' চিৎকার করছে রানা, ছুটছে, অন্তঃসত্ত্বা তরুণী বউটার কথা ভেবে আতঙ্কিত। 'এই! কোথায় তুমি! পাশা!'

দ্বিতীয় লাশটাকে রানা চিনতে পারল। এ-ও ইউনিফর্ম পরা বনরক্ষী, বাংলোয় প্রহরার দায়িত্ব পালন করে। লোকটা ওর বুকে রাইফেলের মাজল ঠেকিয়েছিল। নামটাও মনে আছে—লছমি।

লছমিকে গলা টিপে মেরেছে পাশা। লাশের পাশেই পড়ে রয়েছে হাত থেকে খসে পড়া রাইফেল। ছোরাটা খাপ সহ কোমরে গোঁজা।

পিছনের বাগান পার হয়ে উঠানে পৌঁছাল রানা। বারবার ডেকেও পাশার কোন সাড়া নেই। উঠান থেকে কিচেন দেখা যাচ্ছে, দরজাটা খোলা। ভেতরে চুলো জ্বলতে দেখল রানা, চুলোর ওপর একটা পাতিলে গরম পানি টগবগ করে ফুটছে।

আরও দুটো ঘর পার হলো রানা। একটা ডাইনিং রূম, আরেকটা সম্ভবত গেস্টরূম। পাশাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। বাড়ির লোকজনও যেন গায়েব হয়ে গেছে।

'পাশা!' আবার ডাকল রানা।

উত্তরে হাসল কেউ। সেই হাসির মধ্যে এমন কিছু আছে,

রানার গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেল। তারপর খোলা একটা দরজার ওদিকে পাশাকে দেখতে পেল ও। ঘরটা আগেও দেখেছে রানা, লম্বা একটা সোফার পিছনে দাঁড়িয়ে ওখান থেকে ফোন করেছিল দিল্লিতে, কৈলাস জাঠোরের নম্বরে। ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে পাশা, তবে কথা বলছে একটা মোবাইল ফোনে। ঠিক কথা বলছে না, প্রায় সারাক্ষণই শুধু শুনছে সে, উত্তরে হুঁ-হাঁ করছে আর হাসছে। রানা লক্ষ করল, অন্য কোন দিকে পাশার খেয়ালই নেই, সে তার নিজের পায়ের সামনে তাকিয়ে আছে। ওখানে কিছু পড়ে আছে কিনা ঠিক বুঝতে পারছে না রানা, লম্বা সোফাটা ওর দৃষ্টিপথে বাধা হয়ে রয়েছে।

তারপর গোঙানির আওয়াজ পেল রানা। সেই সঙ্গে কুৎসিত, অশ্লীল খলখল শব্দে হেসে উঠল পাশা। ড্রইংরুমে ঢুকে দ্রুত এগোল রানা, সোফটাকে ঘুরে তাকাতেই সেই নতুন বউটাকে কার্পেটে চিৎ হয়ে পড়ে থাকতে দেখল। একজোড়া জর্জেটের ওড়না পাকিয়ে রশি বানানো হয়েছে, তারপর সেগুলো দিয়ে তার হাত দুটো পিছমোড়া আর পা দুটো এক করে বেঁধেছে। মুখে একটা রুমাল গুঁজে দিতেও ভুল করেনি পাশা। সে দাঁড়িয়ে আছে তরুণীর পেটে বুটসহ একটা পা তুলে দিয়ে।

এগিয়ে এসে লোহার মত শক্ত হাতে পাশার কাঁধ খামচে ধরল রানা। 'পা নামাও!'

তরুণীর পেট থেকে পা নামিয়ে ঘুরল পাশা, হাসছে সে। বোতাম টিপে হাতের মোবাইল ফোন অফ করল, ছুঁড়ে দিল সোফার দিকে, বলল, 'তোমার ব্যাপারটা পাকা করে ফেললাম, ভাই চোপরা। সরাসরি পয়গম্বরের সঙ্গেই কথা হলো। সব শুনে বললেন–নো প্রবলেম, নিয়ে এসো ওকে। বললেন, দুই-আড়াই ঘণ্টার মধ্যে একটা হেলিকপ্টার পাঠিয়ে দিচ্ছেন। বিরাট একটা সুখবরও দিলেন। সাত হাজার কোটি টাকা চাঁদা পাচ্ছি আমরা। আমরা মানে যারা মহান শয়তানের পূজারী।'

'এত টাকা চাঁদা হয় নাকি?' রানা যেন কিছু জানে না। পাশাকে পাশ কাটিয়ে এলো ও, মেয়েটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। মুখ থেকে রুমালটা বের করতেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে। 'যা হবার হয়েছে, কথা দিচ্ছি আর কিছু ঘটবে না।' তার হাত ও পায়ের বাঁধন খুলে দিচ্ছে।

'উনি বললেন, সার্ক দিচ্ছে,' প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে পাশা, সারা মুখে উজ্জ্বল হাসি নিয়ে বিনা প্রতিবাদে রানার কাজও দেখছে। 'আসলে দেশগুলোকে কিছু একটা ভয় দেখিয়ে ওই চাঁদা আদায় করা হচ্ছে। ডিটেইলস জানতে পারব চরসে পৌঁছে। এ-ও শুনলাম যে পারসীদের জন্যে আলাদা রাষ্ট্রের দাবি কাল মাঝরাতের মধ্যে ভারত সরকারকে মেনে নিতে বলা হয়েছে, তা না হলে চরস ঘাঁটির মিসাইলগুলো ভারত সহ সার্ক দেশগুলোকে টার্গেট করবে।'

'হোয়াট!' মেয়েটিকে ধরে দাঁড় করাচ্ছে রানা, রীতিমত আঁতকে উঠল। দ্রুত চোখ বুলাল রোলেক্স হাতঘড়িতে। সকাল দশটা। সময়সীমা দেয়া হয়েছিল সাতদিন, অথচ তিনদিনও পার হলো না, সেটা কমিয়ে নতুন সময়সীমা ঘোষণা করেছে শাহ বকশী। অর্থাৎ মিশন সফল করার জন্যে মাত্র আটত্রিশ ঘণ্টা সময় পাবে রানা। 'আপনি সোজা নিজের ঘরে চলে যান,' মেয়েটাকে বলল ও। 'ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে বসে থাকুন, আমরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত বেরুবার দরকার নেই।'

রানার কথা মেয়েটা শুনল ঠিকই, কিন্তু ভাব দেখে মনে হলো না ওর ওপর ভরসা রাখতে পারছে। চেহারায় নগ্ন আতঙ্ক, সারা শরীর এখনও কাঁপছে; সাহস সঞ্চয় করে পাশার দিকে তাকাল সে।

পাশা শব্দ করে হেসে উঠল। 'এটা তুমি কি বললে, দোস্ত! দরজা ও কেন বন্ধ করতে যাবে? দরজা বন্ধ করব আমরা–ঠিক আছে, মেনে নিলাম,' আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করল সে, '–প্রথমে

তুমি, তারপর আমি।'

'পাশা, এই ভদ্রমহিলা আমার পরিচিত,' সুরটা কঠিন হলেও শান্ত ভঙ্গিতে কথা বলছে রানা। 'ইনি মাত্র গতকালই আমার একটা উপকার করেছেন। গার্ড দু'জনকে খুন করে তুমি সাংঘাতিক অপরাধ করেছ, কিন্তু এরপর যদি দেখি এই ভদ্রমহিলার কোন ক্ষতি করতে যাচ্ছ, আমার হাতে স্রেফ খুন হয়ে যাবে তুমি।'

'খুনের প্রসঙ্গ যখন উঠলই, তাহলে কথাটা তোমাকে জানাতেই হয়,' রানার গা ঘেঁষে দাঁড়ানো বউটার দিকে নোংরা দৃষ্টিতে বারবার তাকাচ্ছে পাশা। 'আমি যখন দ্বিতীয় বনরক্ষীর গলা টিপে ধরেছি, জানালা দিয়ে তোমার এই কড়া মাল সেটা দেখে ফেলে। স্টীল আলমারি খুলে স্বামীর রেখে যাওয়া পিস্তলটা বের করেছিল, কিন্তু আমি ঘরে ঢোকার পরও গুলি করতে সাহস পায়নি। লোড করা পিস্তল, মুকুন্দ চোপরা। এই যে,' বলে শিরদাঁড়ার কাছে বেল্টে গুঁজে রাখা ল্যুগারটা বের করে দেখাল রানাকে।

রীতিমত শঙ্কিত হয়ে উঠল রানা, ভাবছে–মেয়েটার কপালে আজ না জানি কি আছে। 'তুমি কি আমার সঙ্গে লড়তে চাও, পাশা?' জিজ্ঞেস করল ও।

হেসে উঠে মাথা নাড়ল পাশা। 'পাগল নাকি! এইমাত্র না পয়গম্বরকে কথা দিলাম তোমাকে নিয়ে আসছি! তুমি?'

'তুমি যদি এই ভদ্রমহিলাকে বিরক্ত করো, আমি অবশ্যই তোমার সঙ্গে লড়ব।'

'কি দিয়ে?' জিজ্ঞেস করল পাশা।

চোখের পলকও পড়ল না, শোল্ডার হোলস্টার থেকে রানার হাতে বেরিয়ে এলো ওয়ালথারটা।

'ও, আচ্ছা, ভেতরে পিস্তল ছিল বলেই লাশের কাঁধ থেকে ব্যাগটা ছিনিয়ে এনেছ। বেশ, বেশ।' হাসছে পাশা। 'আমরা

দু'জনেই তাহলে সশস্ত্র। একেই বলে অচলাবস্থা, তাই না? তো এক কাজ করি এসো। জিনিসটাকে বেডরুমেই পাঠিয়ে দাও, তবে দরজাটা খোলা থাকুক। খেয়ে যখন সাধ মিটছে না, দেখে সাধ মেটাই।'

পাশা থামতে না থামতে এক ছুটে খোলা দরজা দিয়ে বেডরুমে ঢুকে পড়ল মেয়েটা, ঝাঁপ দিয়ে বিছানায় পড়ল উপুড় হয়ে। কান্নার দমকে পিঠটা ফুলে ফুলে উঠছে।

সেদিকে তাকিয়ে আপনমনে হেসেই চলেছে পাশা। তার এই আচরণ রানার শিরদাঁড়ায় ঠাণ্ডা শিরশিরে অনুভূতি জাগিয়ে তুলল।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাশার অস্থিরতা বাড়ছে। এখনও হাসছে, তবে সেটা এখন কেমন যেন কাঁপা কাঁপা। আগের সেই সতর্ক বা আক্রমণাত্মক ভঙ্গিটা নেই, পিস্তলটা গুঁজে রেখেছে বেল্টে।

সোফায় বসে থাকতে পারছে না। ড্রইংরুমের মেঝেতে দু'মিনিট পায়চারি করল, দু'মিনিট খোলা জানালা দিয়ে বাংলোর সামনের ফাঁকা উঠানে তাকিয়ে থাকল।

অনেক দেরিতে টের পেল রানা, পাশার এই আচরণ আসলে ওকে বোকা বানাবার প্রস্তুতি ছিল মাত্র। পিস্তলটা সরিয়ে রেখে রানাকে ভাবতে দিয়েছে, মেয়েটাকে হাতে পাবার ইচ্ছাটা বাতিল করেছে সে।

তৃতীয়বার পায়চারি শুরু করল পাশা। বিশ সেকেন্ডও হয়নি, হঠাৎ তীরবেগে বেডরুমে ঢুকেই দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

তেরো

তরুণীর আর্তচিৎকারে গোটা বাংলো যেন থরথর করে কেঁপে উঠল। রানা জানে পাশা একটা জাত খুনী, খুন করাটা তার মানসিক রোগ, কাজেই ওর হাতে সময় খুব কম—ডাকাডাকি করে বা হুমকি দিয়ে সেটা আরও কমিয়ে আনাটা বোকামি হবে। ছুটে এলো ও, কাঁধ দিয়ে প্রচণ্ড ধাক্কা মারল দরজার কবাটে। একবার, দু'বার…

বউটা এখন আর চিৎকার করছে না। রানা শুধু হাসির শব্দ শুনতে পাচ্ছে। পাশা হাসতে হাসতেই বলল, 'দোস্ত, তোমার কি পিপীলিকার মত পাখা গজাল?'

পাঁচবারের বার রানার কাঁধের ধাক্কা খেয়ে চৌকাঠ থেকে কজাসহ ছিটকে পড়ল কবাট। বেডরুমে ঢুকে ভারসাম্য সামলাতে ব্যস্ত রানা, মেয়েটাকে ছেড়ে খাট থেকে লাফ দিল পাশা, তার প্রথম গুলিটা রানার মাথার চুল পুড়িয়ে দিয়ে দেয়ালে গভীর গর্ত তৈরি করল।

দ্বিতীয়বার লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না, সময় নিয়ে লক্ষ্যস্থির করছে সে। রানা জানে, একমাত্র পাশাই ওকে চরসে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে। কাজেই তাকে খুন করার মানে হবে, ব্যর্থ মিশন। আর মিশন ব্যর্থ হলে বাংলাদেশের পোড়া কপালে স্মরণকালের ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসতে পারে, উপমহাদেশের পাঁচ-সাতটা জনবহুল শহরের বেশিরভাগ মানুষও মারা যেতে পারে।

রানাই গুলি করল, দ্বিতীয় গুলিটা পাশাকে করার কোন সুযোগ না দিয়েই। পাশার মাথার প্রায় অর্ধেকটা উড়ে গেল, ছিটকে গিয়ে সাদা দেয়াল নোংরা করে দিল খানিকটা হলুদ মগজ। ভারি বস্তার মত দড়াম করে মেঝেতে পড়ে গেল লাশটা।

এরপর পাঁচ মিনিট বউটার চাদর ঢাকা মৃতদেহের পাশে চুপচাপ বসে থাকল রানা। জীবনে অনেক কাজেই ব্যর্থ হয়েছে ও, ওর অসতর্কতার জন্যে দু'একজনকে প্রাণও হারাতে হয়েছে, কিন্তু আগে যা কখনোই ঘটেনি, এই মৃত্যুটা ওর চোখে পানি এনে দিচ্ছে। তবে রানা উপলব্ধি করল, ওর এই ব্যর্থতা চোখের পানি কেন, কোনকিছু দিয়েই মোছা যাবে না।

সাধারণ একটা নতুন বউ। অন্তঃসত্ত্বা। একজন নয়, আসলে দু'জন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। পাশা হয়তো টেরই পায়নি যে তার হাতের প্রচণ্ড চাপে মেয়েটার ঘাড় ভেঙে গেছে। রানা দরজা ভেঙে বাধা না দিলে সে সম্ভবত লাশটাকেই ধর্ষণ করত।

পাঁচ মিনিট পর হঠাৎ করেই উপলব্ধি করল রানা এখন ওর কি করা উচিত। ফোনে পাশার সঙ্গে নরম নরম কথা বললেও, শাহ বকশী নিশ্চয়ই ভুলে যায়নি যে তার উপপত্নীকে ধর্ষণ ও খুন করেছে সে। এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না-হেলিকপ্টার নিয়ে যারা আসছে তাদের ওপর নির্দেশ আছে পাশাকে দেখামাত্র গুলি করতে হবে। সেক্ষেত্রে তার লাশ দেখে খুশিই হবে লোকগুলো, এমন কি ওই লাশ চরসে যাবার জন্যে রানার পাসপোর্ট হিসেবে অবদান রাখলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

ভারি লাশটা টেনে বাংলোর সামনের উঠানে এনে রাখল রানা। এমন জায়গায়, আকাশ থেকে যাতে পরিষ্কার দেখা যায়, আবার উঠানে যান্ত্রিক ফড়িং নামাতে যাতে কোন সমস্যা না হয়।

না, ট্রেনের ঘটনাটা রানা ভোলেনি। ইরানী গুণ্ডাদের হাতে খুন হতে যাচ্ছিল ও, জান বাঁচিয়েছে তাদের তিনজনকে খুন করে।

বোঝাই যায়, শাহ্ বকশী নাদিরাকে মুখে যাই বলে থাকুক, ইরানী দেহরক্ষীদের নির্দেশ দিয়েছিল তারা যেন অবশ্যই ওকে খুন করে।

নাদিরার বক্তব্য সঠিক হলে প্রায় দেড়শো ইরানী দেহরক্ষী এখনও শাহ্ বকশীর প্রতি অনুগত। চরসে পৌঁছে এদেরকে রানার সামলাতে হবে। সামলাতে হবে নাদিরাকেও; কারণ ওকে দিয়ে শাহ বকশী আর জেনারেল গোরস্কি, এই দুই ঝামেলা থেকে মুক্ত হতে চাইবে সে। চরসে এই মুহূর্তে কার ক্ষমতা কতটুকু তার ওপর নির্ভর করবে ওদের মিশনের ভবিষ্যৎ। রানার আশা, চরসে পৌঁছেই চন্দ্রা দেবযানিকে মুক্ত করতে পারবে ও। সামনে অনেক কঠিন সব কাজ, দু'জন না হলে সামলানো যাবে না।

বুকটা দুরু দুরু করছিল, হেলিকপ্টার এসে পৌঁছাবার পর না জানি কি ঘটে। বেলা একটার দিকে যান্ত্রিক ফড়িঙের আওয়াজ শুনে একদম শান্ত ও গম্ভীর হয়ে উঠল রানা। এখন যে-কোন কিছু ঘটতে পারে। হেলিকপ্টার হয়তো ল্যান্ডই করবে না, পাশার লাশ দেখে যা বোঝার বুঝে নেবে আরোহীরা, কয়েক পশলা গুলিতে রানাকে ঝাঁঝরা করে যেখান থেকে এসেছে সেখানে ফিরে যাবে। কিংবা হয়তো বন্দী করার জন্যে নামবে, চরসে নিয়ে গিয়ে হাজির করবে শাহ্ বকশীর সামনে, ভুয়া পয়গম্বর ওকে জ্যান্ত পোড়াবার নির্দেশ দেবে।

কিন্তু এ-সব কিছুই ঘটল না।

হেলিকপ্টার ল্যান্ড করার পর একজন মাত্র নিচে নামল, চকচকে কালো লেদার ড্রেস আঁটসাঁট হয়ে আছে শরীরে, মাথায় হেডসেট। দেখেই চিনতে পারল রানা। ওকে বিস্মিত হতে দেখে হেডসেট হাতে নিয়ে হাসল নাদিরা বুলবুলি, তার চিৎকার রোটরের শব্দকে ছাপিয়ে উঠল, 'আমার স্বামী যখন বলল যে পাশা জেল থেকে পালিয়েছে, তার এক বন্ধুকে নিয়ে চরসে আসতে চায়, তখনই আমি বুঝে ফেলি তার বন্ধুটি নির্ঘাত তুমি। তাই

নিজেই কপ্টার নিয়ে চলে এলাম।' হেসে উঠল খিলখিল করে। 'তোমার ছদ্মবেশ কোন কাজেরই হয়নি...'

'একা?' ছদ্মবেশের উপকরণগুলো মুখ থেকে খুলে ফেলে দিচ্ছে রানা।

মাথা ঝাঁকাল নাদিরা। 'তোমার সঙ্গে অনেক আলাপ আছে, রানা। আমি অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয় একটা ষড়যন্ত্রের আভাস পাচ্ছি। চলো, ফেরার পথে হেডসেটে আলাপ করব। স্যাডিস্টটা মারা গেল কিভাবে?'

'বাংলোর ভেতর আরও একটা লাশ আছে,' ম্লান সুরে বলল রানা। 'রেপ করতে গিয়ে পাশা তার ঘাড় ভেঙে ফেলে। সে যাক—পাশার ব্যাপারটা শাহ্ বকশী কিভাবে নেবে?'

'তুমি ওকে খুন করতে বাধ্য হও।' মাথা ঝাঁকাল নাদিরা। 'একটা ভাল কাজ করেছ। শাহ্ বকশীকে আমি বলেছি মুকুন্দ চোপরা আসলে তুমি। যেভাবেই নিক, কিছু এসে যায় না।'

বিশ মিনিট পর, ওদের হেলিকপ্টার ইতিমধ্যে ভারত মহাসাগরের ওপর চলে এসেছে, হেডসেটে ফিট করা রেডিওর মাধ্যমে নাদিরাকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'চরসের পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ধারণা দাও দেখি। তবে তার আগে চন্দ্রার খবর বলো।'

'তার গায়ে ওরা কেউ হাত দিতে পারেনি,' বলল নাদিরা। 'তাকে আমি আমার নিজের মহলে আনিয়ে রেখেছি—বন্দী, তবে শয়তান উপাসকদের নাগালের বাইরে।'

'ধন্যবাদ, নাদিরা,' বলল রানা।

'জিজ্ঞেস করবে না, ভারতীয় একজন এজেন্টের প্রতি এত কেন দরদ আমার? শয়তানগুলো ওকে যদি ছিঁড়ে খায় তাতে আমার কি! বিশ্বাস করো, ভারতকে আমি দু'চোখে দেখতে পারি না। তোমার কাছে তো কিছুই লুকাচ্ছি না, এটাও বলে ফেলি—আমার হাতে বেশ ক'জন ভারতীয় এজেন্ট মারা গেছে।'

রানা কথা বলছে না।

‘তোমরা একটা মিশন নিয়ে চরসে এসেছিলে,’ আবার বলল নাদিরা। ‘চন্দ্রা তোমার পার্টনার বা টীম মেইট। বিপদে ওকে কেউ সাহায্য করলে তার প্রতি তুমি খুশি হবে, এই চিন্তা থেকে ওর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছি আমি।’

‘সত্যি আমি খুশি হয়েছি, নাদিরা,’ বলল রানা। ‘এবং কৃতজ্ঞতাও জানাচ্ছি।’

‘এই একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার, রানা,’ বলল নাদিরা, কণ্ঠস্বরই বলে দিচ্ছে সে সিরিয়াস ও আন্তরিক। ‘কে আমার স্বামী, আমি কাদের পক্ষে কাজ করি, কোন্ লোকটা কার কি ক্ষতি করতে চাইছে–এ-সবের আর কোন গুরুত্ব নেই।’

‘ঠিক বুঝলাম না,’ বলল রানা।

‘ধর্তব্য শুধু একটা বিষয়, যত গুরুত্ব শুধু সেটারই, আর তা হলো–আমি তোমার দলে। এখন থেকে তুমি যা করতে চাইবে তাতে আমার পূর্ণ সমর্থন থাকবে। যে-কোন সাহায্য চাওয়া মাত্র আমার কাছ থেকে পাবে তুমি…’

বাধা দিল রানা। ‘এ-সব কথা আর কাউকে বলেছ নাকি? ইউসুফ হায়দার যদি শোনে, সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে খুন করার নির্দেশ দেবে।’

‘না, কাউকে বলিনি,’ বলল নাদিরা। মাথা নাড়তে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। ‘তবে ডায়েরীতে লিখেছি…’

‘ওটা তুমি পুড়িয়ে ফেললে ভাল করবে।’

একটু চিন্তিত দেখাল নাদিরাকে। ‘আরেকবার ভাল করে খুঁজতে হবে, কোথায় যে রাখলাম…’

রানা ভাবছে, নাদিরা বিপদে পড়লে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ‘ডায়েরীটায় ঠিক কি লিখেছ, মনে আছে?’

হেসে ফেলল নাদিরা। ‘গোপন কিছু না। তোমাকে ছাড়া বাঁচব না, শুধু এই কথাটা লেখা আছে। লিখেছি, তোমার জন্যে আমি সব করতে পারি।’

রানা উপলব্ধি করল, নাদিরা আসলে নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। ডায়েরীটা আইএসআই-এর হাতে পড়তে যা দেরি, তারা অবশ্যই নাদিরাকে ধরে পাকিস্তানে নিয়ে যাবে, দেখামাত্র যদি মেরে না-ও ফেলে। তবে ওর জন্যে সব করতে পারে, তার এই কথাটা কতটুকু সত্য তা একটু যাচাই করে দেখতে হয়। সত্যি কি তুমি আমাকে সাহায্য করবে, নাদিরা? ঠিক যেভাবে আমি চাইব?'

'চেয়েই দেখো না,' মৃদুকণ্ঠে বলল নাদিরা।

'চাইব, তবে এখুনি নয়,' বলল রানা। 'তার আগে তুমি আমাকে চরসের পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ধারণা দাও। তখন বললে অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয় ষড়যন্ত্রের আভাস পাচ্ছ। কি আভাস?'

'এই যেমন, চুক্তি নবায়ন করতে আমি রাজি নই, এ-কথা জানা সত্ত্বেও আইএসআই আমাকে ইসলামাবাদে ডেকে পাঠিয়েছে। তারপর ধরো, শাহ বকশী আমার সঙ্গে কোন পরামর্শ না করেই সুইস ব্যাংকে চাঁদা পাঠাবার সময়-সীমা কমিয়ে এনেছে। ওদিকে গুজব শুনছি, বড় কয়েকটা জাহাজ ভাড়া করা হবে বা হয়েছে, ওটায় চড়ে চরসের সব ক'জন শয়তান উপাসক এক সঙ্গে সুরাটে চলে যাবে। নির্দেশ দেয়া হয়েছে, শাহ বকশীর ব্যক্তিগত হেলিকপ্টার যেন সব সময় তৈরি অবস্থায় থাকে। তুমিই বলো, এ-সব থেকে কি বোঝা যায়?'

কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর মুখ খুলল রানা। 'আইএসআই যদি কোনভাবে বুঝে থাকে যে এখন থেকে তুমি আর পাকিস্তানের স্বার্থ রক্ষা করতে উৎসাহী নও, সঙ্গে সঙ্গে ওরা তোমার জায়গায় অন্য কাউকে দায়িত্ব নিতে বলবে, এক। দুই, ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীতে ওদের যত এজেন্ট আছে তাদের সবাইকে নির্দেশ দেয়া হবে তারা যেন তোমার সঙ্গে কোন যোগাযোগ ও সম্পর্ক না রাখে। তিন, ভারতীয় বাহিনীকে আগের মতই চরসে পৌঁছাতে বাধা দেবে আইএসআই, কিন্তু রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানী

বাহিনীকে ঠিকই পাঠাবে।'

'ওহ্, গড, রানা! এভাবে তো চিন্তা করিনি!' নাদিরা যেন হাঁপিয়ে উঠল। 'চরসে এসে পাকিস্তানীরা কি করবে?'

'কল্পনা করো। যা খুশি তাই করতে পারে ওরা। বিল্ট-ইন কমপিউটরের সাহায্যে মিসাইলগুলোর টার্গেট নতুন করে ফিক্স করতে পারবে। যে পারমাণবিক বোমাটার করাচীতে পড়ার কথা ছিল, সেটাকে দিল্লিতে ফেলার ব্যবস্থা করতে পারবে। যে দুটো মিসাইল ঢাকা ও চট্টগ্রামের দিকে তাক করা আছে সেগুলো ওভাবেই রেখে দিতে পারবে। এমন কি, এ-সব কিছু না করে পাকিস্তানীরা নিউক্লিয়ার ওঅরহেড সহ সবগুলো মিসাইল নিজেদের জাহাজেও তুলে ফেলতে পারে। ওই জাহাজ কোথায় ফিরবে তুমি জানো।'

'গড! ওহ্, গড! ইউ আর রিয়েলি আ জিনিয়াস, রানা।' কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল নাদিরা। তারপর বলল, 'চরসে পাকিস্তানী বাহিনী আসতে চাইলে পরিবেশ-পরিস্থিতির ওপর আগেই নিয়ন্ত্রণ আনতে হবে তাদের। তা না হলে সংঘর্ষ বাধবেই। আমার স্বামীর স্থানীয় ভক্তরা সংখ্যায় অনেক। খুন করা বা হওয়া, দুটোতেই তারা অভ্যস্ত। ইরানীরাও প্রায় সবাই এখন আমার প্রতি অনুগত। তারপর আছে জেনারেল গোরস্কি আর তার দল।'

'এদের মধ্যে কোন্ পক্ষটি আইএসআইকে সাহায্য করবে,' বলল রানা। 'শাহ বকশী?'

নাদিরা প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'জেনারেল গোরস্কির তো প্রশ্নই ওঠে না।'

'তাহলে শাহ বকশীই,' বলল রানা, 'কারণ, চরসে আর তো কেউ নেই।'

চোদ্দ

রানার প্রিয়পাত্র হবার জন্যে সম্ভাব্য সব কিছু করতে রাজি নাদিরা। এটা শুধু তার মুখের কথা নয়, কাজেও প্রমাণ করে দেখাল। রানাকে সে জিজ্ঞেস করল, 'কি চাও তুমি, রানা? পাকিস্তানের ওপর প্রতিশোধ নেবে? উড়িয়ে দেবে ইসলামাবাদ, করাচী বা লাহোর? ওরা তোমাদের ত্রিশ লাখ মানুষকে খুন করেছে–এই একটা সুযোগ, তুমি ওদের অন্তত দুই কোটি মানুষকে সাফ করে দাও।

'নাকি একজন মুসলমান হিসেবে শিবসেনা, বিজেপি, গোটা হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর আক্রোশ পোষণ করো, ভারতকে মনে করো বাংলাদেশের প্রধান শত্রু? সেক্ষেত্রে দিল্লি, বোম্বে, কলকাতা ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দাও না! কিভাবে কি করতে হবে, সব আমি তোমাকে দেখিয়ে দেব।

'কিংবা যদি মনে করো মিসাইল আর ওঅরহেডগুলো বাংলাদেশে নিয়ে গেলে মন্দ হয় না, সে-ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। দু'ভাবে কাজটা করা যায়। পাকিস্তানীদের জাহাজের বহর নিয়ে আসতে দাও, মিসাইলগুলো লোড করুক, তারপর গোটা বহর হাইজ্যাক করে চট্টগ্রাম বন্দরে নিয়ে যাব। মোটকথা, যা খুশি তাই করতে পারো তুমি। শুধু মুখ ফুটে বলো একবার।'

'কোন শর্ত নেই?' রানার মুখে একটু নার্ভাস হাসি।

'না, কোনই শর্ত নেই,' মৃদু কণ্ঠে বলল নাদিরা। 'অনেক চিন্তা

করে একটা জিনিস বুঝেছি, রানা–আসলে জোর করে কারও ভালবাসা আদায় করা যায় না। এ আমার এক তরফা ভালবাসাই। তবে তোমার মন পাবার সাধনা থেকে কেউ আমাকে বিচ্যুত করতে পারবে না...'

'শর্ত না থাকলে তোমার সাহায্য নিতে আমার কোন আপত্তি নেই,' বলল রানা। 'প্রথম কথা, নাদিরা, আমি চাই না পাকিস্তান চরসে এসে মিসাইল আর নিউক্লিয়ার ডিভাইসগুলো দখল করে নিক। ওদের রক্ত গরম, যুক্তি মানে না, পরিণাম চিন্তা করে না, যা খুশি তাই করে বসতে পারে। আমি এ-ও চাই না যে মিসাইল ও বোমা ভারত আবার ফিরে পাক...'

'তাহলে কি চাও? বাংলাদেশে নিয়ে...?'

মাথা নাড়ল রানা। 'এ-সব আসলে বাংলাদেশের দরকার নেই। আমরা স্বাধীন হয়েছি মুক্তিযুদ্ধ করে–এই যে গোটা একটা জাতির যোদ্ধা হিসেবে পরিচিতি, এটাকে আমরা খুব বড় করে দেখি। ব্যাপারটা আমাদেরকে একটা ইউনিক স্ট্যাটাস এনে দিয়েছে। জাতি তার ভেতরের শক্তি ও প্রবণতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন, জানে আগ্রাসন হোক বা ধর্মান্ধদের বাড়াবাড়ি, প্রয়োজন হলে সব এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দেয়া যাবে।'

'তাহলে ওগুলো নিয়ে কি করবে তুমি?' নাদিরা বেশ অবাকই হলো।

'সে প্রসঙ্গ পরে, নাদিরা,' বলল রানা। 'এখন আমি তোমার কাছ থেকে একটা তালিকা চাই। ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীতে আইএসআই-এর যে-ক'জন এজেন্ট আছে তাদের সবার নাম-ঠিকানা থাকতে হবে ওই তালিকায়।'

'পাবে,' সঙ্গে সঙ্গে রাজি হলো নাদিরা। 'চাইলে এখনই। এমন কি এ-ও জিজ্ঞেস করব না যে কেন চাইছ তালিকাটা।'

'কারণটা বলতে আমার আপত্তি নেই। তালিকাটা আমি পাঠিয়ে দেব ভারতীয় ইন্টেলিজেন্সের সদর দফতরে। ওরা চব্বিশ

ঘণ্টার মধ্যে সব ক'জনকে গ্রেফতার করে ইন্টারোগেট শুরু করবে।'

'সেক্ষেত্রে কিন্তু ভারতের চরস পুনর্দখলের পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে,' নাদিরার গলায় সাবধান করে দেয়ার সুর।

রানা বলল, 'তাতে লাভ এই যে পাকিস্তান তার চরস অভিযান বাতিল করতে বাধ্য হবে।'

'তা ঠিক।' মাথা ঝাঁকাল নাদিরা। ইতিমধ্যে অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে এসেছে ওরা, চরস আর মাত্র দুশো কিলোমিটার দূরে। ভারত মহাসাগরের সারফেস ঘেঁষে ছুটছে হেলিকপ্টার, কাজেই ভারত বা পাকিস্তানের রাডারে ধরা পড়ার ভয় নেই। রিজার্ভ ট্যাংকে অতিরিক্ত ফুয়েল নিয়ে বেরিয়েছে নাদিরা, সেদিক থেকেও কোন বিপদের আশঙ্কা নেই। 'কিন্তু তখন না বললে যে তুমি চাও না ভারতের হাতে আবার ওগুলো পড়ুক–মিসাইল আর বোমাগুলো?'

'সত্যি চাই না,' বলল রানা। 'ভারত চরসে আসুক, কিন্তু আমরা এমন কিছু একটা করে রাখব, মিসাইল আর বোমা তারা পাবে না। তবে এখনই জানতে চেয়ো না সেটা কি। কারণ আমার নিজেরই জানা নেই। হ্যাঁ, নাদিরা, তালিকাটা তুমি আমাকে এখনই দিতে পারো।'

কোলের ওপর ফেলে হাতব্যাগটা খুলল নাদিরা। মোটা একটা নোটবুক বের করল সে। পাতা উল্টে সিরিয়াল নম্বর দেখছে। একটু ঝুঁকে তাকাতে রানা দেখল পাতাগুলোয় শুধু সিরিয়াল নম্বরই দেয়া আছে, তাছাড়া কলম বা পেন্সিলের একটা আঁচড় পর্যন্ত নেই।

টান দিয়ে তিনটে পাতা ছিঁড়ে রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল নাদিরা। নিল রানা, তবে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি এগুলো? সাদা কেন?'

'সিরিয়াল নম্বর এগারো আর বারো–এ দুটোয় পাবে

আইএসআই এজেন্ট যারা ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীতে আছে তাদের তালিকা। অপর কাগজটায় সাতজন পাকিস্তানী এজেন্টের নাম আছে, এরা বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীতে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে আজ বেশ কয়েক বছর ধরে। সংখ্যাটা আরও বেশি হতে পারে, তবে আমি শুধু এই ক'জনের নামই জানি। ওদেরকে ইন্টারোগেট করলে বাকি সবার নামও বেরিয়ে আসবে, সত্যি যদি আরও কেউ থাকে। না, সাদা নয়, রানা—ইনভিজিবল ইঙ্কে লেখা, জ্বলন্ত বালবের গায়ে সেঁটে ধরলে লেখাগুলো পড়তে পারবে।'

'ধন্যবাদ, নাদিরা,' বলল রানা। 'কাগজগুলো যত্ন করে পকেটে রেখে দিল। 'এবার বিল্ট-ইন কমপিউটরে ঢোকার পাসওয়ার্ড বলো।'

'বারবার শুধু ধন্যবাদই দিচ্ছ,' ম্লান একটু হেসে বলল নাদিরা, 'তোমাকে এভাবে সাহায্য করায় আমি যে নিজের কতবড় সর্বনাশ ডেকে আনছি সে-কথাটা তো একবারও বলছ না!'

বিব্রত দেখাল রানাকে, মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করল, তারপর দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'ঝুঁকি আছে জেনেই কিন্তু তুমি আমাকে স্বেচ্ছায় সাহায্য করতে রাজি হয়েছ। আমি ধরে নিয়েছি, আইএসআই যত বড় বিপদ হয়েই দেখা দিক, নিজেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করা আছে তোমার।'

'চরসে আমার নিজস্ব একটা সেসনা আছে,' ঠোঁটে তিক্ত হাসি, আপনমনে বিড় বিড় করছে নাদিরা, 'ওটায় চড়ে পালিয়ে যেতে পারি। আর পারি বডিগার্ড মেহেরবানকে হুকুম করতে—আমার মাথায় একটা গুলি করো। কিন্তু আমার ব্যাংকে প্রচুর টাকা আছে, ভাবছি ওগুলো কাকে দিয়ে যাব...'

'যদি প্রয়োজন মনে করো,' বলল রানা, 'আমি তোমাকে প্রোটেকশন দিতে পারব।'

'কতদিন, রানা?'

'পরিস্থিতি যতদিন ডিমান্ড করে,' বলল রানা।

‘কোথাকার পরিস্থিতি, রানা? আমার মনের পরিস্থিতি তো সারাক্ষণ, সারাজীবন তোমার প্রোটেকশন ডিমান্ড করবে।’

রানার চেহারা নির্লিপ্ত হয়ে উঠল। ‘এবার কিছু কাজের কথা হোক।’

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল নাদিরা। ‘হোক।’

‘পাসওয়ার্ড?’

‘ডু অর ডাই।’

‘তুমি কি শাহ বকশীর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবে?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘বলো কি, না দিয়ে উপায় আছে! তোমার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে সব কাজ ফেলে কেল্লায় বসে আছে শয়তানের চামচা। দু’জনেই আমরা পরস্পরের সঙ্গে অভিনয় করে যাচ্ছি। প্রকাশ্যে আমার প্রতিটি প্ল্যান সমর্থন করছে বুড়ো, কিন্তু পিছনে শান দিচ্ছে ছুরিতে । শুধু ইরানীরা আমার ভক্ত হয়ে ওঠায় এখনি কিছু করতে সাহস পাচ্ছে না। তবে আইএসআই যদি তার সাহায্য চেয়ে থাকে, সে ইতিমধ্যে জেনে ফেলেছে যে আমি পাকিস্তানী এজেন্ট। এক সময় এ-ও জানবে যে আইএসআই সমর্থন প্রত্যাহার করায় আমার আর কোন ক্ষমতা নেই। তখন সে প্রতিশোধ নিতে চাইবে।’

‘সে তখন দেখা যাবে,’ বলল রানা। ‘তবে না, এয়ারস্ট্রিপ থেকে তুমি আমাকে সরাসরি শাহ বকশীর কাছে নিয়ে যাবে না। প্রথমে নিয়ে যাবে চন্দ্রার কাছে। তার সঙ্গে জরুরী আলাপ আছে আমার।’

‘সেই আলাপটা কি ব্যক্তিগত, না পেশাগত?’ একটু তীক্ষ্ণ হলো নাদিরার কণ্ঠ। ‘আলাপটা যখন হবে, আমি কি উপস্থিত থাকতে পারব?’

‘চন্দ্রার সঙ্গে বা আর কারও সঙ্গে আমার কোন ব্যক্তিগত সম্পর্ক নেই,’ বলল রানা। ‘তুমি যেখানে ভারত ও বাংলাদেশের

এত বড় উপকার করছ, হ্যাঁ, অবশ্যই তুমি উপস্থিত থাকতে পারবে।'

'বেশ খুশি খুশি লাগছে আমার।'

'আরেকটা কথা, নাদিরা,' বলল রানা। 'তুমি কি আমাকে মিসাইল ঘাঁটিতে নিয়ে যেতে পারবে? ওটা তো আন্ডারগ্রাউন্ডে, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল নাদিরা। 'হ্যাঁ, মাটির নিচে। ইরানীরা পাহারা দিচ্ছে, আমি বলে দিলে ওরা তোমাকে অবশ্যই ঢুকতে দেবে...'

'বলে দেবে?' একটু বিস্মিত হলো রানা। 'তুমি আমার সঙ্গে যাবে না?'

খানিক ইতস্তত করে নাদিরা বলল, 'ঠিক আছে, তোমার সঙ্গে মেহেরবান যাবে।'

'কিন্তু তুমি নও কেন?' রানা নাছোড়বান্দা। 'ভয় পাচ্ছ? কি আছে ওখানে?'

'কি নয়–বলো, কে!' কাঁপা কাঁপা নার্ভাস হাসি নাদিরার ঠোঁটে। 'জেনারেল গোরস্কি আর তার দল ওই আন্ডারগ্রাউন্ড মিসাইল ঘাঁটিতেই থাকে, রানা।'

'তাতে কি হলো? তুমিই তো বলেছ, তোমার প্রেমে সে দিওয়ানা হয়ে আছে...'

'ছিল।' রানার বিদ্রূপাত্মক বাচনভঙ্গি শুনে না হেসে পারল না নাদিরা। 'এখন নেই। হঠাৎ করে আমার ওপর থেকে তার আগ্রহ ছুটে গেছে। দিনে তিনবার এসে দেখা করত, ফোন করত দশবার। সব বন্ধ।'

'কারণটা আন্দাজ করতে পারছ?'

'জনাব শাহ বকশী জেনারেলকে বলে দিয়ে থাকতে পারে যে আমি পাকিস্তানের এজেন্ট। ফলে মিসাইল আর বোমার সব রহস্য আমাকে বলে দেয়ায় গোরস্কি এখন নিজের মাথার চুল ছিঁড়ছে। এই অবস্থায় সে যদি আমাকে আন্ডারগ্রাউন্ডে দেখতে পায়, গুলি

করার ঝোঁকটা না-ও দমন করতে পারে—সে বা তার দলের কেউ।'

'ইরানীরা ওখানে পাহারায় থাকা সত্ত্বেও?'

'কেন, আন্ডারগ্রাউন্ড সাইলোয় আড়ালের কোন অভাব আছে? পাহারাদাররা জানবে কিভাবে কোত্থেকে গুলিটা এলো বা কে করল? ওরা হয়তো পরস্পরকে সন্দেহ করবে, কারণ কিছু ইরানী এখনও শাহ্ বকশীর প্রতি অনুগত।'

'ভয়ে পালিয়ে থাকাটা কোন সমাধান নয়,' বলল রানা। 'জেনারেল গোরস্কিকে চোখে চোখে রাখার ব্যবস্থা করলেই তো হয়। ঘাঁটিটা ঘুরেফিরে দেখার সময় তাকেও আমরা সঙ্গে রাখব।'

'বেশ, এত করে যখন বলছ, যাব তোমার সঙ্গে,' বলল নাদিরা। 'আর কিছু, বাঙালী মুক্তিযোদ্ধা?'

রানা হাসল। 'আমার ফাইল যখন পড়েছ তখন তো জানারই কথা যে আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। কিন্তু তুমি কি, নাদিরা? তোমার দেশ কোথায়?'

'আমিও একজন মুক্তিযোদ্ধা, রানা।' হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল নাদিরা। 'কিন্তু দুর্ভাগ্য নিজেদের দেশটাকে এখনও আমরা স্বাধীন করতে পারিনি।'

'তুমি কাশ্মীরী?'

মাথা নাড়ল নাদিরা। 'আমি একজন চেচেন।'

'আশ্চর্য তো! নিজেদের যুদ্ধ ফেলে রেখে তুমি এখানে কি করছ?' রানার বিস্ময় নির্ভেজাল।

এরপর নাদিরা এমন অপ্রত্যাশিত একটা উত্তর দিল, রানার অন্তরাত্মা পর্যন্ত কেঁপে উঠল। 'বললে বিশ্বাস করবে, রানা, চেচেন ফ্রিডম ফাইটারদের হাইকমান্ড রায় দিয়েছে রাশিয়ানরা আমার গোটা পরিবারকে হত্যা আর আমাকে ধর্ষণ করার পর আমি নাকি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছি।' হঠাৎ হেসে উঠল নাদিরা। 'তুমিই বলো, আমাকে পাগল মনে হয়? এতটা যে মুক্তিযুদ্ধ

করতে পারব না?'

রানা ভাবছে, নাদিরা যে মানসিক দিক থেকে বিপর্যস্ত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তার উদ্ভট সব আচরণের আর কোন ব্যাখ্যা নেই। প্রসঙ্গটা তাড়াতাড়ি বদলাতে চাইল ও। 'কোথাও নিশ্চয়ই মারাত্মক ভুল করেছে ওরা। এ-প্রসঙ্গ থাক, নাদিরা। তারচেয়ে বলো, আমাকে নিয়ে কি করবে বলে ভেবেছ? তোমার প্ল্যানটা কি?'

পনেরো

নাদিরা বুলবুলি আইএসআই-এর সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করতে উৎসাহী নয়, মাসুদ রানার প্রেমে পড়ে এখন সে পাকিস্তানের চেয়ে বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষা করতেই বেশি উৎসাহী, এ-খবর পাবার পর ইউসুফ হায়দার চুপ করে বসে থাকেন কি করে! দ্রুত কয়েকটা সিদ্ধান্ত দিলেন তিনি: এক, চরসে নাদিরার জায়গায় আইএসআই এজেন্ট হিসেবে আপাতত দায়িত্ব পালন করবে তাদের অতি বিশ্বস্ত ইনফর্মার মেহেরবান; দুই, মেহেরবানের প্রথম কাজ হবে যেভাবে হোক পাকিস্তানের সঙ্গে হাত মেলাতে শাহ বকশীকে রাজি করানো; তিন, রানা চরসে ফিরে আসার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নাদিরা সহ তাকে গ্রেফতার করতে হবে, তবে মিসাইলগুলোর বিল্ট-ইন কমপিউটরে সাজানো গোপন প্রোগ্রামে বা ফাইলে ঢোকার পাওসওয়ার্ড আদায় না করা পর্যন্ত খুন করা যাবে না; চার, ওই একই কারণে আপাতত জেনারেল

গোরস্কিকেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে; পাঁচ, শাহ বকশী তার কয়েক হাজার স্থানীয় শিষ্য,. ভক্ত, সমর্থক ও অনুগত ইরানী যে-কজন পাওয়া যায় তাদেরকে নিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ড মিসাইল ঘাঁটি দখল করে নেবে; ছয়, বেশ বড়সড় একটা জাহাজ বহর নিয়ে পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর কয়েক হাজার সদস্য চরসের দিকে এরই মধ্যে রওনা হয়ে গেছে, ঘুরপথ ধরে উল্টোদিক থেকে আসছে বলে পৌঁছাতে দেরি হবে, তবে আশা করা যায় কাল বিকেলের আগেই পৌঁছাতে পারবে, তার আগে পর্যন্ত নাদিরার অনুগত ইরানীদের ঠেকিয়ে রাখতে হবে–তারা যেন রানা ও নাদিরাকে মুক্ত করতে বা মিসাইল ঘাঁটি পুনর্দখল করতে না পারে।

মেহেরবান তাগাদা দেয়ায় শাহ বকশী তার কয়েক হাজার শিষ্য, ভক্ত ও ত্রিশজন ইরানী দেহরক্ষীকে রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত হবার নির্দেশ দিল।

রানাকে নিয়ে ফিরতি পথ অর্ধেকেরও বেশি পেরিয়ে এসেছে নাদিরা, এই সময় কেল্লার ভেতর একটা সাউন্ডপ্রূফ কামরায় গোপন বৈঠকে বসল ওরা দু'জন। কোন ভূমিকা না করেই প্রশ্নটা তুলল শাহ বকশী, 'পাকিস্তানকে সাহায্য করার বিনিময়ে আমি বা আমার শয়তান উপাসক সম্প্রদায় কি পাচ্ছে, এই ব্যাপারটা পরিষ্কার হওয়া দরকার না?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।' মাথা ঝাঁকাল মেহেরবান। 'প্রথমে একটা বাস্তব সত্য আপনাকে উপলব্ধি করতে হবে, বকশী সাহেব। সবারই ধারণা, আপনি ভুল জায়গায় এসেছেন, এই উপমাহাদেশে শয়তান উপাসকদের কোনও ভবিষ্যৎ নেই। ওদের বিরুদ্ধে ভারত সরকারকে কিছু করতে হবে না, সাধারণ মানুষই টের পেলে ধাওয়া করবে।'

শাহ বকশী প্রতিবাদ করে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু মেহেরবান দৃঢ় ভঙ্গিতে থামিয়ে দিল তাকে। 'আমাদের পরামর্শ হলো, চাঁদা যা চাওয়ার শুধু ভারতের কাছে চান আপনি, কারণ

সার্কের বাকি সব দেশ ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে একটা পয়সাও তারা দেবে না। ভারতকে বলবেন, তাকে একাই সাত হাজার কোটি টাকা দিতে হবে, তা না হলে ওয়ার্নিং হিসেবে প্রথম পারমাণবিক বোমাটা পড়বে নয়া দিল্লিতে। এটা শুধু হুমকি নয়, টাকা না পেলে সতি সত্যি বোমা আপনি ফেলবেনও।'

শাহ বকশী বলল, 'কিন্তু কিভাবে? আপনিই তো বলেছেন, আমার কাছে যে রেডিও সেট বা মাস্টার কম্পিউটর আছে, ওগুলোর সাহায্যে মিসাইল ছোঁড়া যাবে, নিউক্লিয়ার ওঅরহেডও অ্যাকটিভেট করা যাবে, কিন্তু টার্গেট লক করা থাকলে তা বদলানো যাবে না।'

'হ্যাঁ, বদলাতে হলে মিসাইলে ফিট করা বিল্ট-ইন কমপিউটরের সাহায্য লাগবে,' বলল মেহেরবান। 'আর বিল্ট-ইন কমপিউটরে ঢুকতে হলে পাসওয়ার্ড দরকার হবে। জেনারেল গোরস্কি আর নাদিরাকে সেজন্যেই আটক করে ইন্টারোগেট করতে বলা হচ্ছে। তবে ওরা যদি শেষ পর্যন্ত মুখ না খোলে, আমাদের কমপিউটর এক্সপার্টরা না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ওই জাহাজ বহরের সঙ্গে আসছে ওরা।'

'জাহাজের গোটা একটা বহর? কিন্তু কেন?'

মেহেরবান হাসল। 'ইতিমধ্যে প্রমাণ হয়ে গেছে যে নিউক্লিয়ার ওঅরহেড বা দূরপাল্লার মিসাইল ভারতের কাছে থাকাটা নিরাপদ নয়, তাই আমরা ওগুলো পাকিস্তানে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

'তাহলে যে বললেন, টাকা না পেলে নয়াদিল্লিতে আমি একটা বোমা ফেলতে পারব?' শাহ বকশী অবাক।

'একটা কেন, শুধু ভারতেই তিন-তিনটে ফেলবেন।' হাসছে মেহেরবান। 'ধারণা করি, দু'একটা বোমা আপনি বাংলাদেশেও ফেলতে চাইবেন। চাওয়াই উচিত, যেহেতু বাংলাদেশেরই একজন স্পাই আপনার অমন পরীর মত সুন্দর বউটাকে ভাগিয়ে নিয়ে

যাচ্ছে। তবে এ-ব্যাপারে আমরা আপনাকে কোন সুপারিশ বা অনুরোধ করব না। সব মিলিয়ে দশটা দূরপাল্লার মিসাইল আছে ঘাঁটিতে, নিউক্লিয়ার ওঅরহেডসহ। আমরা পাঁচটা নিয়ে যাব। স্বল্প ও মাঝারি পাল্লার বাকি মিসাইলগুলোও আমরা রেখে যাচ্ছি না।'

শাহ বকশী কিছু বলতে যাচ্ছিল, হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল মেহেরবান। 'এবার আপনার ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গ। টাকা যা আদায় হবে তার অর্ধেক আইএসআইকে কনসাল্টটেন্সী ফি হিসেবে দেবেন আপনি। বোমা নিক্ষেপের পর পাকিস্তান আপনাকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেবে, তবে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। ওখান থেকে ভারতীয় স্বাধীনতাকামী পারসীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন আপনি, তবে দাঁড়িপাল্লা বা শয়তানের বশ্যতা স্বীকার প্রসঙ্গে টুঁ-শব্দটিও করবেন না। কয়েক বছর পর নাম, চেহারা, আদর্শ ইত্যাদি বদলে আবার আপনি ভারতে হাজির হবেন, জ্বালাও-পোড়াও রব তুলে শুরু করবেন আন্দোলন...'

তর্ক ও আলোচনা দীর্ঘক্ষণ ধরে চলল। মেহেরবানের ধৈর্যের কোন অভাব নেই, প্রতিটি বিষয় ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিল প্রায় বিহ্বল হয়ে পড়া শাহ বকশীকে।

ভারত বা বাংলাদেশে বোমা নিক্ষেপের কাজটা আইএসআই নিজেরা করবে না, শাহ বকশীকে দিয়েই করাবে। মাদ্রাজের পণ্ডিচেরীতে একটা আইএসআই সেফ হাউসে বসে রিমোট কন্ট্রোল বা রেডিও সেটের মাধ্যমে মাস্টার কমপিউটরে সিগনাল পাঠিয়ে এই দায়িত্ব পালন করবে সে। তার আগে মিসাইলের বিল্ট-ইন কমপিউটর অপারেট করে অন্তত তিনটে মিসাইলের টার্গেট নতুন করে ফিক্সড করে রাখবে পাকিস্তানী বিশেষজ্ঞরা। তাদের কাজ শেষ হলে শাহ বকশীকে মোবাইল ফোনে খবর দেয়া হবে।

নিজের বিকল্প হেডকোয়ার্টার এবং সেফ হাউসে শাহ

বকশীকে যেতে নিষেধ করে দিল মেহেরবান, কারণ আইএসআই এজেন্টদের মাধ্যমে নাদিরা ওগুলোর ঠিকানা অনেক দিন আগে থেকেই জানে। ঠিকানাগুলো রানাকেও সে বলে থাকতে পারে। কাজেই সাবধানের মার নেই।

শাহ্ বকশী চরস ত্যাগ করবে পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর জাহাজ বহর জেটিতে পৌঁছাবার পরপরই। তার পক্ষ থেকে আইএসআই আরও দুটো যাত্রীবাহী জাহাজ ভাড়া করেছে, সময়মত চরসে পৌঁছাবে। ওগুলো শাহ্ বকশীর কয়েক হাজার শিষ্য ও ভক্তকে ভারতের মেইনল্যান্ডে পৌঁছে দেবে। সুরাট ও বরোদা থেকে ওরা ভারত সরকারের বিরুদ্ধে মীটিং-মিছিল শুরু করবে।

কিন্তু জেনারেল গোরস্কি আর তার লোকজনের কি হবে?

মেহেরবান জানাল, 'ওদেরকে মেইনল্যান্ডে পাঠিয়ে দেয়া হবে। এটাই সম্ভবত ওদের জন্যে সবচেয়ে বড় শাস্তি। দুনিয়ার লোক ওদের ছবি দেখবে, জানবে ওরা চোর। ভারত সরকারের বিব্রত হওয়াটাও হবে দেখার মত। লোকে বলবে, রাশিয়া তাদের কত ঘনিষ্ঠ বন্ধু, অথচ সেই বন্ধুর চুরি যাওয়া জিনিস কিনে এত দিন লুকিয়ে রেখেছিল—ছি!'

শাহ্ বকশী অবশেষে চন্দ্রা দেবযানির প্রসঙ্গ তুলল। কেল্লার ভেতরই গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে তাকে, জেনানা মহলের নাদিরার অংশে। তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে শয়তানের মুখপাত্র বলল, চন্দ্রার রক্তে গোসল করার খুব ইচ্ছা ছিল তার, কিন্তু নাদিরা বাধা দেয়ায় পারা যায়নি। আসলে মাসুদ রানাকে খুশি করার জন্যেই চন্দ্রাকে বাঁচিয়ে রেখেছে সে। এখন যখন নাদিরা চরসে নেই, শাহ্ বকশী যদি মহান শয়তানকে খুশি করার জন্যে চন্দ্রার রক্তে গোসল করতে চায়, মেহেরবান কিছু মনে করবে না তো?

এক গাল হেসে মেহেরবান বলল, 'একটা সত্যি কথা বলি? ওই মেয়েটার ওপর আমার খুব লোভ হয়েছে। জেনানা মহলে

যেতে-আসতে আমাকে কেউ বাধা দেয় না, চন্দ্রার পাহারাদাররা বরং সালাম দেয়। যাই, মনের সাধটা মিটিয়ে আসি। বিশ্বাস করুন, শাহ্ সাহেব, এতেও আপনার মহান শয়তান খুশি হবে।'

বেলা তিনটের দিকে নিরাপদেই চরসে পৌঁছাল ওরা। এয়ারস্ট্রিপে একটা সেসনার পাশে হেলিকপ্টার নামাল নাদিরা। ইঙ্গিতে প্লেনটা রানাকে দেখাল সে, বলল, 'তখন তোমার প্রশ্নের উত্তর দিইনি। এখন দিচ্ছি। হ্যাঁ, তোমাকে নিয়ে আমার একটা প্ল্যান সত্যি আছে। তাতে ওই সেসনারও একটা ভূমিকা থাকবে।'

পঞ্চাশ কি ষাটজন সশস্ত্র ইরানীকে দেখল রানা, একজনের নেতৃত্বে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। 'না ডাকলেও আমাকে পাহারা দেয়ার জন্যে চলে আসে ওরা,' রানাকে বলল নাদিরা। 'আমি ওদেরকে বোঝাতে পেরেছি যে শাহ্ বকশী একটা ভণ্ড। ওদের সবাইকে আমি ইরানে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করে দেব। যথেষ্ট টাকাও দেব, যাতে কিছু একটা করে বেঁচে থাকতে পারে।'

হেলিকপ্টার থেকে নামতেই লীডার জানবাজের নেতৃত্বে সশস্ত্র লোকগুলো ওদেরকে ঘিরে ফেলল। ওদের আরও একটা দল নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে থাকা সেসনাটাকে পাহারা দিচ্ছে, রানাকে নিয়ে সেদিকে এগোল নাদিরা, চারদিকে চোখ বুলিয়ে কাকে যেন খুঁজছে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল, মুখে চিন্তার রেখা। সে তার ব্যক্তিগত বডিগার্ডকে কোথাও দেখতে পাচ্ছে না। ইরানীদের লীডার জানবাজকে কাছে ডেকে জানতে চাইল মেহেরবান কোথায়। জানবাজকেও উদ্বিগ্ন দেখাল। সে জানাল, মেহেরবানকে তারাও অনেকক্ষণ ধরে খুঁজছে, কিন্তু কোথাও পাচ্ছে না।

রানার হাতটা একবার ছুঁয়ে আবার সেসনার দিকে এগোল নাদিরা, ওটাকে আরেকদল সশস্ত্র ইরানী পাহারা দিচ্ছে। 'পাকিস্তানীরা কি এরই মধ্যে শাহ্ বকশীর মাধ্যমে হামলা শুরু করে দিল?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল নাদিরা। 'মেহেরবানকে

সরিয়ে দিতে পারলে আমার নাগাল পাওয়া সহজ হয়।'

'যুক্তিতে মেলে না।' মাথা নাড়ল রানা। 'ইরানীরা তোমার প্রতি যেকরম আগ্রহ দেখাচ্ছে, ওদেরকেও তোমার বডিগার্ড বলতে হয়। একজন বডিগার্ডকে সরিয়ে দিয়ে কি হবে?'

'তোমরা সবাই মন দিয়ে শোনো!' জোর গলায় আহ্বানের সুরে উপস্থিত ইরানীদের উদ্দেশে বলল নাদিরা। 'প্রথমেই আমার বন্ধু মেজর মাসুদ রানার সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি একজন বাংলাদেশী, ইন্টেলিজেন্সে আছেন। যেহেতু আমার বন্ধু এবং আদর্শ একজন মানুষ, তাই আমি আশা করব ইনি কোন নির্দেশ দিলে তোমরা তা সঙ্গে সঙ্গে পালন করবে, কোন প্রশ্ন বা দ্বিধা ছাড়াই।' হাত তুলে সেসনাটা দেখাল নাদিরা। 'ধরো উনি এসে বললেন, প্লেনটা ওঁর দরকার। তোমরা কি করবে? তোমরা বলবে—হ্যাঁ, ঠিক আছে, নিয়ে যান, সার! বুঝেছ তো?'

মনে হলো, নাদিরা আর তার ইরানী ভক্তদের নাটকীয় আচরণ দেখে কৌতুক করার লোভটা দমন করতে না পেরেই রানা বলল, 'প্লেনটায় একবার উঠতে চাই আমি, অনুমতি পাব কি?' যদিও কথাটা মোটেও কৌতুক করার জন্যে বলা নয়, রানার অন্য একটা উদ্দেশ্য আছে।

প্রহরী ইরানীরা আরেকবার একযোগে চিৎকার করে বলল, 'ইয়েস, সার!'

সেসনায় একাই উঠল রানা। নাদিরা তার ইরানী ভক্তদের সঙ্গে কথা বলে নতুন কি খবর আছে জানার চেষ্টা করছে। সেসনায় প্রায় মিনিট দশেক থাকল রানা। নেমে এসে হাসতে হাসতে বলল, 'হাতে সময় নেই, থাকলে এখুনি খানিকটা উড়ে আসতাম।'

'আমিও কিন্তু তোমার সঙ্গী হতাম!' প্রায় চিৎকার করে বলল নাদিরা।

এয়ারস্ট্রিপ থেকে সরাসরি কেল্লার উদ্দেশ্যে রওনা হবে ওরা

শাহ্ বকশী তার তৃতীয় পক্ষকে যথাবিহিত সম্মান দেখাতে কার্পণ্য করছে না, অতি শখের ব্যক্তিগত বাহন রোলসরয়েসটা পাঠিয়ে দিয়েছে।

গাড়িটা নিয়ে এলো একজন ইরানীই, কিন্তু ইঙ্গিতে তার সামনে কথা বলতে রানাকে নিষেধ করে দিল নাদিরা। রানা বুঝে নিল অল্প যে-ক'জন ইরানী এখনও শাহ্ বকশীর ভক্ত, ড্রাইভার লোকটা তাদেরই একজন।

তবে গাড়িতে চড়ার আগে কব্জির রোলেক্সে একবার চোখ বুলিয়ে দূরে তাকাল রানা; হ্যাঙ্গারের পাশে ছোট একটা দালান দেখা যাচ্ছে। 'নাদিরা, ওটা কি একটা অফিস?' জিজ্ঞেস করল ও। 'অফিস হলে নিশ্চয়ই ফ্যাক্স মেশিন আছে?'

'আছে বৈকি।'

আর কিছু না বলে সেদিকে পা বাড়াল রানা। সশস্ত্র ইরানীদের ওখানেই অপেক্ষা করতে বলে ওর পিছু নিল নাদিরা।

অফিসে মাত্র দু'জন কেরানী কাজ করছে, নাদিরা বলতেই পাশের কামরায় চলে গেল তারা। একটা বালব অন করে আইএসআই এজেন্টদের নাম লেখা প্রথম কাগজটা সেটার গায়ে সেঁটে ধরল রানা।

দুটো কাগজের চার পৃষ্ঠায় সব মিলিয়ে নাম রয়েছে দেড়শোজনের। নাদিরা জানাল, এই দেড়শো এজেন্টের অধীনে অন্তত তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার লোক কাজ করে।

ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স চীফ কৈলাস জাঠোরের ফ্যাক্স নাম্বার রানার জানা আছে, তালিকার নামসহ্ জরুরী মেসেজটা পাঠাতে মাত্র দু'মিনিট লাগল। পাল্টা মেসেজে কৃতজ্ঞতা বোধে আপ্লুত কৈলাস বললেন, 'যুগ যুগ জিয়ো, মেরে লাল! তুমহারা ইয়ে কাম ভারত মাতা কভি নেহি ভুলেগি। ভাগোয়ান তুমহে...'

মনে মনে হাসল রানা। ও খুব ভাল করেই জানে, মুখে এ-সব কথা বললেও, আইএসএস চায় না চরস থেকে জীবিত ফিরে

যায় ও।

কৈলাস জাঠোর ওকে আশ্বাস দিয়ে জানালেন, আইএসআই এজেন্টদের গ্রেফতার করার জন্যে এখুনি নির্দেশ দিচ্ছেন তিনি। বিমানবাহিনীকে অনুরোধ করবেন, তাদের ফাইটারগুলো যেন চরসের আকাশে চক্কর দেয়। নৌ-বাহিনীও রওনা হবে।

দ্বিতীয় মেসেজটা পাঠাল রানা ঢাকায়। আইএসআই এজেন্টদের তালিকা দিয়ে জানাল, এদের সবাইকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার করতে হবে। ঢাকা ও চট্টগ্রামের দিকে অ্যাটম বোমা সহ একজোড়া মিসাইল তাক করা আছে, এই বিপজ্জনক খবরটাও জানাল বিসিআই চীফকে, সেই সঙ্গে এই আশ্বাসও দিল যে ওগুলোর টার্গেট সময়মত ঠিকই বদলে দিতে পারবে ও–অন্তত সাধ্যমত চেষ্টার কোন ত্রুটি করবে না।

পাল্টা মেসেজে রাহাত খান বললেন, 'আই অ্যাপ্রিশিয়েট ইওর কনভিকশন–ডু অর ডাই!'

অফিস বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এসে রোলসরয়েসে চড়তে যাবে ওরা, ইরানীদের লীডার জানবাজ তার জীপ থেকে নেমে রাস্তার দিকে নাদিরার দৃষ্টি আকর্ষণ করল, 'ম্যাডাম, ওটা সম্ভবত আপনার গাড়ি!'

ঝকঝকে নীল রঙের মার্সিডিজ, নির্জন রাস্তার ধুলো উড়িয়ে তীরবেগে ছুটে আসছে এয়ারস্ট্রিপের দিকে। আরও কাছে আসতে নাম্বার প্লেট দেখে চেনা গেল–হ্যাঁ, নাদিরার ব্যক্তিগত বাহনই বটে। গাড়িতে মাত্র একজনই রয়েছে। আবিসিনিয়ার কাফ্রীদের মত কালো লোকটা, নাদিরার ব্যক্তিগত বডিগার্ড।

ষোলো

এয়ারস্ট্রিপের কিনারায় ঘ্যাঁচ করে গাড়ি থামিয়ে লাথি খাওয়া ফুটবলের মত বাইরে বেরিয়ে কয়েকটা ড্রপ খেলো মেহেরবান, নাদিরার সামনে থেমে বিনয় ও ভক্তিতে নুয়ে নুয়ে পড়ল। 'সর্বনাশ হয়ে গেছে, ম্যাডাম! ভারতীয় এজেন্ট চন্দ্রা দেবযানি কেল্লা ছেড়ে পালিয়েছে।'

'পালিয়েছে? কোথায় পালিয়েছে?' নাদিরা খবরটা বিশ্বাস করতে পারছে না। 'তুমি কোথায় ছিলে?'

'আপনাকে রিসিভ করার জন্যে এখানে আসতে পারিনি, সেজন্যে আমি ক্ষমা চাই, ম্যাডাম,' বলল মেহেরবান, বিনয়ের অবতার। 'আপনি আমাকে রেডিওর মেসেজ শুনতে বলেছিলেন, তাই রেডিওটা নিয়ে কেল্লার ছাদে উঠে গিয়েছিলাম।' এক মুহূর্ত ইতস্তত করল মেহেরবান, হাত তুলে খুলি চুলকাল। 'আরও খারাপ খবর আছে, ম্যাডাম।'

'কি?'

'আমি হয়তো ভুলই করলাম!' মেহেরবানের চেহারায় অপরাধী অপরাধী ভাব। 'আসলে এটা খারাপ খবর, নাকি ভাল খবর, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'মানে? তুমি কি আমার সঙ্গে কৌতুক করছ?' কঠিন সুরে জানতে চাইল নাদিরা।

'গোস্তাকি মাফ করবেন, ম্যাডাম!' হাতজোড় করল

মেহেরবান। ‘আমরা আসলে কোন্ পক্ষ, এটা আমার কাছে পরিষ্কার নয়। রেডিওতে আইএসআই হেড অফিস জানাল, পাকিস্তানী নৌ-বাহিনী চরসে আসছে। কিন্তু একে. তো আপনি চুক্তি নবায়ন করবেন না, তার ওপর আবার পাকিস্তানের মিত্র নয় এমন দুই ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব গাঢ় করেছেন,’ আড়চোখে একবার রানার আপাদমস্তক দেখে নিল, ‘তাই ধাঁধায় পড়ে গেছি…’

‘আমি কার পক্ষে, এ নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না,’ বলল নাদিরা। ‘তোমার শুধু একটা কথা মনে রাখলেই চলবে–তুমি আমার বডিগার্ড। এবার বলো চন্দ্রা কিভাবে পালাল। তাকে আমার অতি বিশ্বস্ত লোকজন পাহারা দিচ্ছিল।’

‘গোটা ব্যাপারটার মধ্যে আমি একটা গভীর ষড়যন্ত্রের আভাস পাচ্ছি, ম্যাডাম,’ মেহেরবান ভান করল, সে ভয়ানক উদ্বিগ্ন। ‘জেনারেল গোরস্কি কেল্লায় এসেছিল, বকশী সাহেবের সঙ্গে আলাপ করে ফেরার আগে আপনার পাহারাদারদের বলে, জরুরী একটা ব্যাপারে চন্দ্রার সঙ্গে কথা বলতে চায়। জেনানা মহলে সে সব সময় আসা-যাওয়া করে, আপনার বন্ধু, পাহারাদাররা তাই পথ ছেড়ে দেয়…’

সংক্ষেপে ব্যাপারটা হলো, গেটে বা উঠানে না রেখে জেনারেল গোরস্কি তার মার্সিডিজ গাড়িটা দুর্গের প্রধান প্রাচীরের গা ঘেঁষে রেখে ভেতরে ঢুকেছিল। চন্দ্রার সঙ্গে তার দেখা হয় নাদিরার গোলাপ বাগানে। পাঁচ মিনিট পরই গোরস্কি একা জেনানা মহল থেকে বেরিয়ে যায়। প্রায় দশ মিনিট পর চা-নাস্তা পরিবেশন করতে গিয়ে একজন গার্ড চন্দ্রাকে কোথাও দেখতে না পেয়ে বাকি সবাইকে ব্যাপারটা জানায়। খবর পেয়ে মেহেরবান গোলাপ বাগানে ছুটে যায়, শ্যাওলা ধরা পাঁচিলের গায়ে আঁচড়া-আঁচড়ির দাগ দেখে বুঝতে পারে চন্দ্রা কোন পথে পালিয়েছে। পাঁচিলটা প্রায় দশ ফুট উঁচু, অত ওপরে ওঠা তার একার পক্ষে সম্ভব নয়, অবশ্যই তাকে জেনারেল গোরস্কি সাহায্য করেছে।

সবশেষে মেহেরবান জানাল, শুধু এই ব্যাপারটা নয়, জরুরী আরও অনেক বিষয়ে আলাপ করার জন্যে শাহ্ বকশী ওদেরকে তার দরবারে ডেকে পাঠিয়েছে।

নাদিরাকে একটু দূরে সরিয়ে এনে নিচু গলায় রানা বলল, 'তোমার বডিগার্ডের আচরণ কেমন যেন লাগছে আমার। ওর সব কথা বিশ্বাস করার দরকার নেই।'

'তবে চন্দ্রা নিশ্চয়ই পালিয়েছে!'

'জেনারেল গোরস্কি আর চন্দ্রা যে সুযোগ পেলে পরস্পরকে সাহায্য করবে এটা তো জানা কথা। দু'জনেই ওরা ভারতের স্বার্থ দেখছে। চন্দ্রাকে নিয়ে নিশ্চয়ই মিসাইল ঘাঁটিতেই ফিরে গেছে জেনারেল।'

'এখন তাহলে আমাদের কি করা উচিত?' নাদিরা জানতে চাইল।

'চলো, প্রথমে মিসাইল ঘাঁটিতে যাই আমরা,' বলল রানা। 'বুঝিয়ে-শুনিয়ে চেষ্টা করে দেখি চন্দ্রাকে ফিরিয়ে আনতে পারি কিনা।'

'ঘাঁটিতে ক্ষমতার পাল্লা কিন্তু আমাদেরই ভারি,' বলল নাদিরা। 'রাশিয়ানরা সত্তরজন, অস্ত্র বলতে চল্লিশজনের কাছে স্মল আর্মস আছে, কারও কাছেই ছ'টার বেশি বুলেট নেই। আর আমার অনুগত ইরানীর সংখ্যা ওখানে একশোর কাছাকাছি। তাদের সবার কাছে পিস্তল, অটোমেটিক রাইফেল, বেয়োনেট ও গ্রেনেড আছে। বুঝিয়ে কাজ না হলে চন্দ্রাকে তুমি চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে ফিরিয়ে আনতে পারবে।'

'আমি?' রানা বিস্মিত। 'তুমি আমার সঙ্গে যাচ্ছ না?'

'দ্বীপে ফিরে স্বামীর সঙ্গে দেখা না করাটা কেমন দেখায়, বলো, বিশেষ করে সে যখন ডেকে পাঠিয়েছে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'কেল্লাটা এখন আর তোমার জন্যে নিরাপদ বলে মনে করি না...'

'কিন্তু আমি তো আর একা যাচ্ছি না,' বলল নাদিরা। 'আমার সঙ্গে ওরাও থাকবে।' ইঙ্গিতে প্রায় ষাটজন সশস্ত্র ইরানীকে দেখাল সে, জীপ ও ভ্যানের পাশে ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ হাসল সে। 'এরপরও যদি আমার নিরাপত্তা সম্পর্কে তোমার মনে সংশয় থাকে, তাহলে তুমিও চলো আমার সঙ্গে। জনাব বকশী কি বলে শোনার পর চন্দ্রাকে ফিরিয়ে আনতে যেয়ো।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করে রানা বলল, 'সেটাই বোধহয় ভাল। শাহ বকশীর সঙ্গে পরিচয় হওয়া দরকার, কি বলে তাও শুনি।'

জেনারেল গোরস্কি আন্ডারগ্রাউন্ড মিসাইল কমপ্লেক্স থেকে গ্রাউন্ড লেভেলে ওঠার সময় বরাবরের মত রাবারের মুখোশ পরে নিয়েছিল, তার পকেটে অতিরিক্ত আরেকটা মুখোশও ছিল। কেল্লা থেকে ফিরে আন্ডারগ্রাউন্ডে নামার সময় তার সঙ্গে মুখোশ পরা চন্দ্রা থাকলেও, ইরানী প্রহরীরা ব্যাপারটাকে সন্দেহের চোখে দেখল না, তারা ধরে নিল জেনারেলের সঙ্গে ঢুকছে যখন নিশ্চয় রাশিয়ান কোন মেয়েই হবে।

আলোচনা যা হবার তা নাদিরার বাগানে বসে আগেই হয়েছে, ঘাঁটিতে অনুপ্রবেশ করার পর দ্রুত কাজ শুরু করে দিল চন্দ্রা দেবযানি। সরাসরি জেনারেলের বেডরূমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল ওরা। অলংকারগুলোই চন্দ্রার অস্ত্র–কানের ঝুমকো, গলার লকেট, হাতের বালা–প্রতিটিতে কিছু না কিছু লুকানো আছে: গ্যাস বোমা, মিনি মাইক্রোফোন, কনসেনট্রেটেড ডায়াজিপাম। কোনটা কি, জেনারেল গোরস্কিকে দেখাল সে, তারপর নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিল।

ওদের জন্যে ওখানেই অপেক্ষা করছিল নার্স ওলগা আর পেটি অফিসার ডুবচেঙ্কো। সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়ার আগে ডুবচেঙ্কো স্টুডিওতে মেকআপ ম্যানের কাজ করত। চন্দ্রাকে বদলে ওলগায় পরিণত করার দায়িত্বটা তার ঘাড়েই চেপেছে।

চন্দ্রা ও ওলগার দৈহিক গড়ন প্রায় একই, গায়ের রঙও উনিশ-বিশ। তবে চন্দ্রার কালো চোখ লেন্স লাগিয়ে নীলচে করতে হলো। চুল তো কাটতে হলোই, রঙ বদলে করতে হলো সোনালি।

প্রবল তাগাদা দেয়ায় ডুবচেঙ্কো আধঘণ্টার মধ্যে কাজটা শেষ করে ফেলল। সময় নষ্ট না করে তখুনি জেনারেলের সঙ্গে সাইলোগুলোর উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল চন্দ্রা। ওরা না ফেরা পর্যন্ত এখানেই অপেক্ষা করবে ওলগা।

মাটির তলায় এই মিসাইল ঘাঁটি বিশাল একটা জায়গা দখল করে রেখেছে। গ্রাউন্ড লেভেলে ঘাস ঢাকা মাঠ, গাছপালা আর বাগান ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না–ওগুলোর ঠিক নিচেই কংক্রিটের ছাদ। গাছ বা ঘাস জন্মেছে ছাদে ফেলা মাটির বুকে। সারফেস থেকে নিচে নামার কয়েকটা উপায় আছে। ঘাসের ভেতর লুকানো আছে ইলেকট্রনিক সেনসর, রিমোট কন্ট্রোলের বোতামে চাপ দিলে সাড়া দেয়। গাছপালার গুঁড়ি বা কাণ্ডের গায়ে লুকানো আছে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার লেন্স, ওটার সামনে দাঁড়িয়ে সংকেত দিলে আন্ডারগ্রাউন্ডের গার্ডরা বোতাম টিপে মোটর চালু করে, কোথাও থেকে খানিকটা ছাদ সরে যাওয়ায় এক প্রস্থ সিঁড়ি বেরিয়ে পড়ে। আবার লিভার সিস্টেমও আছে, টানলে নিচে নামার পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়।

গ্রাউন্ড লেভেল থেকে প্রায় একশো ষাট ফুট নিচে সব মিলিয়ে বাইশটা সাইলো তৈরি করা হয়েছে। দশটা সাইলো আকারে বেশি বড় নয়, এগুলোয় নিউক্লিয়ার ওঅরহেডসহ দশটা মিসাইল রাখা হয়েছে। এগুলো পাশাপাশি। একশো গজ দূরে আরও ছ'টা সাইলো, এগুলো একেকটা সম্ভবত ঢাকা স্টেডিয়ামের চেয়ে বড় হবে। বাকি সব মিসাইল এই ছ'টা সাইলোয় রাখা হয়েছে। দুশো গজ দূরে আরও ছ'টা বড় আকারের সাইলো থাকলেও, সেগুলো এখন পর্যন্ত খালিই পড়ে আছে।

মিসাইল কমপ্লেক্সটা দু'ভাগে ভাগ করা। ঘাঁটির কন্ট্রোল অ্যান্ড কমিউনিকেশন সেন্টার, এক্সপার্ট ও টেকনিশিয়ানদের কোয়ার্টার ইত্যাদি গ্রাউন্ড লেভেল থেকে ষাট ফুট নিচে। অর্থাৎ সাইলোগুলোয় পৌঁছাতে হলে আরও একশো ফুট নামতে হবে-হয় সিঁড়ি বেয়ে, নাহয় এলিভেটরে চড়ে। সবাই জানে না, ঢালু ও প্যাঁচানো একটা প্যাসেজও আছে। আর আছে এস্কেপ হ্যাচ, দুর্ঘটনাবশত বিস্ফোরণ ঘটলে বা আগুন ধরে গেলে লোকজন যাতে পালাতে পারে।

প্রথম দশটা সাইলোর প্রতিটির বন্ধ গেটের সামনে দু'জন করে সশস্ত্র গার্ড পাহারা দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, ভেতরেও দু'জন করে লোক আছে। বাকি ছ'টা সাইলো পাহারা দেয় দশজনের একটা দল। পালা করে ডিউটি দেয় তারা। মাঝেমধ্যে রাশিয়ানদের কোয়ার্টারেও টহল দিতে যায়।

মিসাইল রক্ষণাবেক্ষণ জটিল ও সময়সাপেক্ষ একটা কাজ। রুশ টেকনিশিয়ানরা প্রতিদিন সকাল ও বিকেল দু'বেলা সাইলোগুলোয় ঢুকে প্রতিটি মিসাইল খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে। আজ বিকেলেও এলিভেটর থেকে নেমে সাইলোয় ঢুকতে শুরু করল তারা। রাশিয়ানদের প্রতিটি দলে তিনজন করে টেকনিশিয়ান রয়েছে। সব মিলিয়ে চল্লিশ জন। আর আছে পাঁচজনের একটা ইন্সপেকশন টীম। টেকনিশিয়ানরা কাজ শেষ করে সাইলো থেকে বেরিয়ে গেলে তাদের কাজ পরীক্ষা করার জন্যে ভেতরে ঢোকে ইন্সপেকশন টীম। ওলগার ছদ্মবেশ নিয়ে এই টীমেই রয়েছে চন্দ্রা দেবযানি।

চন্দ্রার লক্ষ্য হলো, নিউক্লিয়ার ওঅরহেড সহ দশটা মিসাইল যেভাবে আছে সেভাবেই থাকবে, শত চেষ্টা করেও কেউ যাতে ওগুলোর নাগাল না পায়। এ-ব্যাপারে কৈলাস জাঠোরের নির্দেশ পরিষ্কার। এই দশটা মিসাইলের টার্গেট লক করা আছে, সেই লক খুলে কেউ যেন নতুন কোন টার্গেট নির্ধারণ করতে না পারে।

এই নির্দেশ পালন করার একটাই উপায়। নাদিরার অনুগত ইরানীদের বদলে সাইলোর ভেতরে ও বাইরে ভারতের অনুগত গার্ড থাকতে হবে। ভারতের অনুগত বলতে এখানে রাশিয়ানদের বুঝতে হবে।

গার্ড বদলের কাজ পানির মত সহজেই সারা গেল। সাইলোর ভেতরে ও বাইরে নার্ভ গ্যাস ফাটিয়ে ইরানী গার্ডদের অজ্ঞান করল চন্দ্রা, দম আটকে রাখায় তার কোন ক্ষতি হলো না। তার রাশিয়ান সহযোগীরা অজ্ঞান ইরানীদের সাইলোর ভেতর স্তূপ করে রাখা কাঠের বাক্সের আড়ালে নিয়ে এসে রশি দিয়ে হাত-পা বাঁধল। তারপর মুখে কাপড় গুঁজে টেপ লাগিয়ে দিল। এই বাক্সে মিসাইলগুলোর স্পেয়ার পার্টস আছে।

সাইলোর চল্লিশজন ইরানীর জায়গায় এখন ডিউটি দিচ্ছে ওই একই সংখ্যক রাশিয়ান, তাদের প্রত্যেকের কাছে পিস্তল, রাইফেল, বেয়োনেট ও গ্রেনেড আছে। সাফল্যের আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে আছে চন্দ্রার মুখ, জেনারেল গোরস্কিকে বলল, 'নাদিরার শক্তি অনেকটাই কমিয়ে এনেছি আমরা। আমাদের হাতও এখন খালি নয়, হামলা হলে লড়তে পারব। আপনার লোকদের বলে দিন, যে-কোন মূল্যে মিসাইলগুলো সবার ধরাছোঁয়ার বাইরে রাখতে হবে।'

'সে নির্দেশ ওদেরকে আগেই দেয়া হয়েছে,' জেনারেল বলল। 'আমি ভাবছি নাদিরার কথা। আমার সঙ্গে জঘন্য প্রতারণা করেছে সে। আমি ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করিনি যে সে পাকিস্তানের একজন স্পাই। সুযোগ আসুক, আমি এর প্রতিশোধ নেব। তবে তার আগে, আজই ওর নতুন প্রেমিক-প্রবরটিকে খতম করব।'

প্রায় চমকে উঠল চন্দ্রা। 'কার কথা বলছেন আপনি? মাসুদ রানা? তাকে আপনি পাচ্ছেন কোথায়...!'

'অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে অনেকের সঙ্গেই তাল মিলিয়ে চলতে হচ্ছে আমাকে,' বিব্রত হতে গিয়ে জোর করে হেসে স্বাভাবিক

থাকার চেষ্টা করল গোরস্কি। 'শাহ বকশীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে আমার। উনি বললেন, চেষ্টা করে দেখবেন মাসুদ রানাকে মিসাইল কমপ্লেক্সে পাঠানো যায় কি না। রানাকে পাঠাবেন আমাকে খুন করার চ্যালেঞ্জ দিয়ে। আর আমাকে বলেছেন, তাকে যেন আমি জ্যান্ত ফিরে যেতে না দিই।'

সতেরো

সশস্ত্র ইরানী প্রহরীদের জীপ ও ভ্যান রোলসরয়েসের সামনে ও পিছনে থাকল, গাড়ির বহরটা দ্রুত কেল্লার দিকে ছুটছে। দূর থেকে দেখা গেল সাদা কাপড়ের ওপর কালো খুলি প্রিন্ট করা দশ-পনেরোজন স্থানীয় শয়তান উপাসক বিশাল ফটকের আশপাশে ঘুর ঘুর করছে, কোমর থেকে ঝুলছে খাপে মোড়া তলোয়ার। 'পয়গম্বর'- কে এক নজর দেখার লোভে প্রায়ই কিছু লোক ভিড় করে এখানে, কাজেই ব্যাপরটা নাদিরার কাছে অস্বাভাবিক বা বিপজ্জনক বলে মনে হলো না। ড্রাইভারও খোলা ফটক দিয়ে দ্রুতবেগে কেল্লার প্রকাণ্ড উঠানে ঢুকে পড়ল।

গাড়ি ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে নাদিরা আর রানার বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল। উঠানের দু'পাশে কয়েকশো নয়, কয়েক হাজার শয়তান উপাসক জড়ো হয়েছে। একপাশে শাহ বকশীর অনুগত ইরানী দেহরক্ষীরা তাদের মধ্যে থেকে বাছাই করা কিছু লোককে পিস্তল অথবা রাইফেল বিলি করছে। আরেক পাশে দেয়া হচ্ছে পোশাক, মশাল, টর্চ, ছোরা ইত্যাদি।

ঘাড় ফিরিয়ে ঝট করে একবার পিছন দিকে তাকাল রানা। পিছনের ভ্যান গাড়িটা ভেতরে ঢোকার পর দু'পাশে দাঁড়ানো কয়েকজন শয়তান উপাসক দ্রুত বন্ধ করে দিচ্ছে ফটকটা। 'এটা একটা ফাঁদ,' বিড়বিড় করে বলল রানা।

'আর সেই ফাঁদে স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছি আমরা,' রুদ্ধশ্বাসে বলল নাদিরা।

ড্রাইভারের পাশ থেকে মেহেরবান বলল, 'এ-সব আপনারা কি বলছেন–ম্যাডাম, সার! এখানে কি ঘটছে আমার কাছ থেকে শুনুন। পাকিস্তানী নেভি চরসে আসছে, এ-কথা শুনে নিজের শিষ্যদের যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি নিতে বলেছেন শাহ্ বকশী। ব্যাপারটা আমাদের জন্যে কোন ফাঁদ নয়...'

'তুমি চুপ করো!' ধমক দিল নাদিরা। রানার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'এখন কি কেল্লা থেকে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব, রানা?'

'সম্ভব, তবে রক্তপাত এড়ানো যাবে না,' বলল রানা। 'কে বাঁচবে, কে মরবে বলা মুশকিল।'

'তোমার সাজেশন কি?' জানতে চাইল নাদিরা।

'চলো, শাহ্ বকশীর সঙ্গে দেখা করি। সে কি বলে শোনা দরকার।' রানা ও নাদিরা নিঃশব্দে দৃষ্টি বিনিময় করল।

মেহেরবান সত্যি কথাই বলেছে. শাহ্ বকশী ওদের জন্যে তার খাস দরবারে অপেক্ষা করছিল। অনুগত ইরানীদের সঙ্গে নিয়েই ভেতরে ঢুকল ওরা। বিশাল দরবার হলের প্রতিটি দরজায় স্থানীয় শয়তান উপাসকদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ করা গেল। এখন যদি দু'পক্ষে লড়াই বাধে, রক্তের নদী বয়ে যাবে। স্ত্রীকে সম্মান দেখিয়ে সিংহাসন ছেড়ে দাঁড়াল সে। 'আমার পিয়ারা বেগম! জানের জান!' বলতে বলতে অতি আদরের সঙ্গে পাশের আসনটিতে বসাল তাকে। তারপর এগিয়ে এসে পুরোপুরি ইউরোপিয়ানদের কায়দায় হ্যান্ডশেক করল রানার সঙ্গে, প্রশংসার সুরে বলল, 'এ আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনার মত বিরল

একটা প্রতিভার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছি। আমাকে বলা হয়েছে, মাসুদ রানাকে এসপিওনাজ জগতের একজন অবতার বলা যেতে পারে।' ইঙ্গিতে একটা সোফা দেখাল। 'প্লীজ, বসুন।'

হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে দাঁড়িয়েই থাকল রানা, বলল, 'আমিও শুনেছি যে লোকে নাকি আপনাকে পয়গম্বর বলছে। দুটোই আসলে মিথ্যে কথা।'

শাহ বকশীর চেহারা থমথমে হয়ে উঠল। স্ত্রীর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'জনাব মাসুদ রানার সঙ্গে কি আমাদের কোন চুক্তি হয়েছে? তিনি কি আমাদের একজন বিজনেস পার্টনার হবার প্রস্তাব গ্রহণ করছেন?'

'প্রস্তাব গ্রহণ না করলে রানাকে আপনি আমার সঙ্গে দেখতে পেতেন?' নাদিরা পালটা প্রশ্ন করল স্বামীকে। 'জনাব শাহ বকশী, আপনি বরং আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন। আমি রানাকে আনতে যাবার সময় যে পরিস্থিতি ছিল, তার কি কোন পরিবর্তন ঘটেছে?'

'কেন, তুমি কিছু জানো না? গোটা পরিস্থিতিই তো বদলে গেছে, বেগম। একদিকে শুনছি, পাকিস্তান এই দ্বীপ দখল করে নিতে আসছে। আরেকদিকে শুনছি ভারতীয় স্পাই চন্দ্রা দেবযানি জেনারেল গোরস্কির সঙ্গে হাত মিলিয়ে মিসাইল কমপ্লেক্স দখল করে নিয়েছে। এই মাত্র টেলিফোনে খবর পেলাম, কমপ্লেক্সে যে ক'জন বেঈমান ইরানী ছিল তাদের সবার অস্ত্র কেড়ে নিয়েছে ওরা। আর যারা বিশ্রামে ছিল, তাদেরকে ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। চু-চু-চু, তোমার অনুগত ইরানীরা এভাবে মার খাবে, ভাবা যায়!'

'আমি কি তাহলে আপনার হাতে বন্দী?' জিজ্ঞেস করল নাদিরা, কণ্ঠে বিদ্রূপ।

'ছি, নিজের স্ত্রীকে কেউ বন্দী করে রাখে?' দাড়িতে হাত বুলিয়ে হাসল শাহ বকশী। 'তবে স্ত্রীর নিরাপত্তা স্বামী দেখবে না তো কে

দেখবে, বলো? চারদিকে বিপদের আলামত দেখতে পাচ্ছি, তাই তোমাকে আমি এই কেল্লার বাইরে যেতে দিতে পারি না। এটা তোমাকে বুঝতে হবে যে এই ব্যবস্থা তোমারই ভালর জন্যে।'

'আর রানা? ওকেও কি আপনি বন্দী করে রাখার কথা ভাবছেন?'

'বেগম, তুমি কি পাগল হলে!' আঁতকে ওঠার চমৎকার অভিনয় করল শাহ বকশী। 'ওর বীরত্ব সম্পর্কে এত রকমের গল্প শুনেছি, ওকে বন্দী করে রাখার স্পর্ধা আমার চোদ্দপুরুষেরও হবে না। তবে–,' এটুকু বলে নাটকীয় ভঙ্গিতে থেমে গেল সে।

'তবে?' নাদিরার কণ্ঠস্বর যতটুকু কর্কশ হতে পারে।

'তবে জনাব মাসুদ রানার বুদ্ধি ও দক্ষতা সম্পর্কে যা শুনেছি তা সত্যি কিনা যাচাই করে দেখব আমি,' বলল শাহ বকশী। 'ওঁকে এখন মিসাইল কমপ্লেক্সে গিয়ে জেনারেল গোরস্কির একটা ব্যবস্থা করতে হবে, ফিরে আসতে হবে চন্দ্রা দেবযানিকে নিয়ে। কি,' রানার দিকে তাকাল সে, 'জনাব? রাজি?'

'কেউ না বললেও মিসাইল কমপ্লেক্সে আমাকে একবার যেতে হবে,' বলল রানা। 'তবে এখনই নয়।'

'এখনই নয় কেন?' ভুরু কোঁচকাল শাহ বকশী।

'শাহ বকশী, আমি অত্যন্ত ক্লান্ত,' বলল রানা। 'ঠিক মনে করতে পারছি না শেষ কবে ঘুমিয়েছি। তাছাড়া, গৃহকর্তাকে মেহমানদারির একটা সুযোগও দিতে চাই। আপনার দাস-দাসীদের ডেকে বলুন তারা যেন আমাকে গেস্টরূমে পৌঁছে দিয়ে আসে। চার-পাঁচ ঘণ্টা পর ঘুম থেকে উঠে আপনার সঙ্গে ডিনার খেতে ইচ্ছে করি। তারপর মিসাইল কমপ্লেক্সের উদ্দেশে রওনা হব। তবে একটা শর্ত আছে।'

শাহ বকশী সকৌতুকে রানার কথা শুনছিল। 'কি শর্ত?'

'ওখানে আমি একা যাব,' বলল। 'আমার সঙ্গে আর কেউ থাকবে না। আন্ডারগ্রাউন্ডে নামার রাস্তাটা বলে দেবেন আপনি,

যাতে আমাকে কোন গাইডের সাহায্য নিতে না হয়।'

'কিছুটা বুঝতে পারছি কেন আপনি এতটা নাম করেছেন,' বলল শাহ্ বক্শী। 'বৈরি একটা পরিবেশেও এমন ভাব খুব কম লোকই দেখাতে পারে, যেন সে-ই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। ভাল লাগল, জনাব রানা, সত্যি ভাল লাগল। আমি এরকম বন্ধু পছন্দ করি। আরও বেশি পছন্দ করি এরকম শত্রু। আপনি যা চাইছেন তাই হবে। এই, কে আছ, মেহমানকে গেস্টরুমে নিয়ে যাও!'

দাস-দাসীরা এগিয়ে আসছিল, শাহ বকশীর অনুগত কয়েকজন ইরানী তাদেরকে থামতে বলল। 'গেস্টরুমে যাবার আগে ওঁকে আমরা সার্চ করতে চাই।'

'জনাব!' আসন ছেড়ে সটান দাঁড়িয়ে পড়ল নাদিরা, বুকটা ঘন ঘন ওঠা-নামা করছে, আগুন ঝরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে স্বামীর দিকে। 'ওদেরকে জানান, রানা আমাদের একজন ইকুয়েল পার্টনার। এইমাত্র আপনি ওকে সম্মানীয় মেহমান বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ওকে সার্চ করার অর্থ হবে আপনাকে অপমান করা!'

শাহ্ বকশী হাসল। 'জনাব রানার কাছে কি-ই বা থাকতে পারে—একটা পিস্তল, একটা ছুরি, দু'চারটে গ্রেনেড। এ-সব তো আরও অনেকের কাছেই রয়েছে, একজনের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে কি লাভ? এই, সরে যাও তোমরা, বিশিষ্ট মেহমানকে বিব্রত কোরো না।' নাদিরার দিকে ফিরল সে। 'খুশি তো, বেগম?'

আবার নিজের আসনে বসল নাদিরা, স্বামীকে মধুর একটুকরো হাসি উপহার দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, খুশি।' দাস-দাসীরা রানাকে নিয়ে দরবার ত্যাগ না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে, তারপর আবার বলল, 'জাঁহাপনা, এবার অনুমতি দিন, আমি আমার মহলে ফিরে গিয়ে একটু বিশ্রাম নিতে চাই।'

'আলবৎ, বেগম, আলবৎ!' বলল শাহ বকশী। 'তবে ডিনারের সময় আমি কিন্তু ডাইনিং হলে তোমাকে দেখতে চাই।'

মাথা ঝাঁকাল নাদিরা। 'আমি ঠিক সময়ে পৌঁছে যাব। ভাল

কথা, আমার অনুগত লোকজন কিন্তু আমার মহলেই থাকবে। আমার নিরাপত্তার ব্যাপারে ওরা কোন ঝুঁকি নিতে রাজি নয়।'

'আমার কয়েক হাজার শিষ্যও তাই বলছে, আমার নিরাপত্তার কারণেই গোটা কেল্লা ঘেরাও করে রেখেছে ওরা। শুধু বাইরে নয়, ভেতরেও আছে কয়েকশো। শুনবে, ওরা আমাকে কতটা ভালবাসে? এই দ্বীপ যে কারও জন্যেই নিরাপদ নয়, এ তো সবাই জানে। আমার শিষ্যদের জন্যে বড় বড় কয়েকটা জাহাজ ভাড়া করা হয়েছে, ওরা যাতে মেইনল্যান্ডে চলে গিয়ে জান বাঁচাতে পারে। এই খানিক আগে জাহাজগুলো ভিড়েছে, কিন্তু আমাকে ফেলে কেউ ওরা পালাতে রাজি নয়।'

নিজ মহলে যাবার জন্যে তৈরি হলো নাদিরা। আসন ছেড়ে বিদ্রূপাত্মক সুরে বলল, 'স্বামী-স্ত্রীতে এতই যখন মহব্বত, দু'জনের আলাদা দুটো শক্তিকে আমরা একটা শক্তিতে পরিণত করতে পারি না, জনাব শাহ বকশী?'

'হয়তো পারি,' মুচকি হেসে বলল শয়তানের মুখপাত্র। 'কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে তৃতীয় পক্ষ। ওই বাধাটা দূর হোক, তুমি আমাকে বিল্ট-ইন কমপিউটরের পাসওয়ার্ড জানাতে রাজি হও...'

'বিল্ট-ইন কমপিউটর সম্পর্কে আপনি জানেন!' বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেলো নাদিরা।

'আমি এ-ও জানি যে তুমি পাকিস্তানের এজেন্ট ছিলে, কিন্তু এখন আর তারা তোমার ওপর এতটুকু ভরসা রাখতে পারছে না। নাদিরা, এখনও সময় আছে, তুমি আমার দলে ফিরে এসো। আইএসআই তোমাকে বাঁচতে দেবে না...'

'আপনি ভেবেছেন পাকিস্তানীদের আমি ভয় পাই?' বুক টান টান করল নাদিরা। 'ভুলে যাবেন না, জনাব, আমি একজন চেচেন নারী। চেচনিয়ায় আমরা হাজার বছর ধরে সাহস ও বীরত্ব দেখিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছি। আমাদের অভিধানে ভয় বলে কোন শব্দ নেই।' মঞ্চ থেকে নেমে যাচ্ছে নাদিরা, শেষ

ধাপটা টপকে মেহেরবানের সামনে থামল। 'আমি চাই, সারাক্ষণ তুমি আমার কাছাকাছি থাকবে, ডাকলেই যেন সাড়া পাই। কি, মনে থাকবে!'

মেহেরবান মাথা ঝাঁকাল। 'ইয়েস, ম্যাডাম!'

রাত আটটায় গেস্টরুমে লোক পাঠিয়ে খবর দেয়া হলো—ডিনার তৈরি, মেহমানের অপেক্ষায় মহামান্য প্রেরিতপুরুষ ডাইনিংরুমে অপেক্ষা করছেন।

রানা দরজাই খুলল না। বলল, 'তোমরা যাও। আমি একটু পরেই আসছি।'

আধঘণ্টা পর আবার ওকে ডাকতে এলো প্রহরীরা। 'জনাব, আমাদের মহামান্য নবীজী আপনার দেরি দেখে বিরক্ত বোধ করছেন। তাঁর তৃতীয় বেগমও অসন্তোষ প্রকাশ করছেন। আপনি কি এখুনি আমাদের সঙ্গে আসছেন?'

'না,' দরজা খুলে বলল রানা। 'তোমরা যাও, আমি দাড়িটা কামিয়েই আসছি।' আর কিছু শোনার অপেক্ষায় না থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

দাড়ি কামাবার পর অপেক্ষা করছে রানা। আরও আধঘণ্টা পার হলো। এখন আর কেউ ডাকতে আসছে না ওকে। এক, দুই করে মিনিটগুলো পার হয়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে আপন মনে হাসছে রানা। ওর বিশ্বাস, পাঁচ-ছয় ঘণ্টা অপেক্ষা করাটা সার্থক হয়েছে।

দরজা খুলল রানা। করিডরে বেশ কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, দরজার দিকে মুখ করে। আট-দশজন ইরানী, দশ-বারোজন স্থানীয়। সবাই সশস্ত্র। ইরানীরা সেই আগের মতই ইন্ডিয়ান আর্মির ইউনিফর্ম পরে আছে। তাদের একজন বলল, 'আমরা ম্যাডামের লোক, সার। ম্যাডাম আপনাকে পাহারা দেয়ার জন্যে পাঠিয়েছেন।' স্থানীয় শয়তান উপাসকদের একজন বলল, 'আমরা নবীজীর সিপাই।'

'আমি ডাইনিংরুমে যাব,' বলল রানা। 'পথ দেখাও।'

শাহ বকশীর এক শিষ্য জবাব দিল, 'আপনার এখন ডাইনিংরুমে না গেলেও চলবে। হঠাৎ করে নবীজী অসুস্থবোধ করায় নিজের খাস কামরায় ফিরে গেছেন।'

করিডর ধরে হাঁটা ধরল রানা, লক্ষ করল খানিক পর পর এখানে সেখানে জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকজন। সবাই তারা স্থানীয় শয়তান উপাসক, শাহ বকশীর দীক্ষা পাওয়া শিষ্য। তাদের মধ্যে দু'একজন ইরানীকেও দেখা যাচ্ছে, নিশ্চয়ই শাহ বকশীর অনুগত, কারণ এদের পরনে ছাই রঙের ঢোলা সালোয়ার ও শার্ট। সবার চোখে-মুখে উদ্বেগ আর অনিশ্চয়তার ছায়া। কেল্লার পরিবেশ হঠাৎ করেই যেন বদলে গেছে।

পিছু নিয়ে যারা আসছে তাদের উদ্দেশে প্রশ্ন করল রানা, 'শাহ বকশী অসুস্থ হবার আগে কি কোন মেসেজ বা খবর রিসিভ করেছেন?'

একজন ইরানী জবাব দিল, 'সার, ছাদে ওনার একটা অফিস আছে। আমি যতটুকু শুনেছি, ওই ছাদের অফিস থেকে একটা টেলিফোন আসার পরই উনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।'

রানা আন্দাজ করল, শাহ বকশীর ছাদের অফিসে রেডিও নিয়ে অপেক্ষা করছিল মেহেরবান। সম্ভবত নাদিরার বদলে তাকেই চরসে কাজ করার দায়িত্ব দিয়েছে আইএসআই। পাকিস্তানের নৌ-বাহিনী কখন এসে পৌঁছাবে, চরস অভিযানে এয়ারফোর্সও অংশগ্রহণ করবে কিনা, এ-সব খবর জানার চেষ্টা করছিল সে। কিন্তু হরিষে বিষাদ! আইএসআই হেড অফিস থেকে মেহেরবানকে জানানো হয়েছে, ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীতে তাদের যত এজেন্ট ছিল, মিলিটারি পুলিস তাদের সবাইকে গ্রেফতার করছে। শুধু তাই নয়, মেহেরবানকে এ-খবরও নিশ্চয়ই দেয়া হয়েছে যে ভারতীয় নৌ-বাহিনী চরসের উদ্দেশে রওনা হচ্ছে, ফলে পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর চরস অভিযান বাতিল করা হয়েছে।

মেহেরবানের কাছ থেকে এ-সব খবর পাবার পর শয়তানের প্রতিনিধি শাহ বকশী আর সুস্থ থাকে কি করে।

রানার চিন্তায় বাধা দিল এক ঝাঁক ফাইটার জেটের সনিক বুম। প্রাচীন কেল্লার হাড়-পাঁজরা এমনভাবে কেঁপে উঠল, মনে হলো এই বুঝি ধসে পড়ল সব। আতঙ্কিত অনেক শয়তান উপাসক কেঁদে উঠে বলল, 'হে ভগবান, রক্ষা করো!'

আশ্চর্য! একজনকেও রানা বলতে শুনল না 'হে শয়তান, রক্ষা করো।'

সামনের বাঁকটায় দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। এখানে প্রচুর মানুষ ভিড় করেছে। প্রথমে হিন্দী, তারপর ইংরেজিতে তাদের উদ্দেশে কয়েকটা কথা বলল ও। 'যারা নিজেদের ভাল চাও, তারা এই মুহূর্তে কেল্লা ছেড়ে জাহাজে গিয়ে উঠে পড়ো। কারণ, চরসে পাকিস্তানী নৌ-বাহিনী আসছে না। আসছে ভারতীয় নৌ-বাহিনী। ওই প্লেনগুলোও ভারতের। একটু পরই ছত্রীসেনারা নামবে, তখন কিন্তু গুলি খেয়ে মরা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না। সবচেয়ে বড় কথা, তোমাদের গুরু শাহ বকশীই যেখানে পালিয়েছে, তোমরা কেন পড়ে থাকবে?'

প্রথমে একটু ইতস্তত ভাব লক্ষ করা গেলেও, সহজবোধ্য যুক্তির কাছে সমস্ত দ্বিধা ও সংশয় দূর হয়ে গেল। লোকজন ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। তারপর শুরু হলো কে কার আগে কেল্লা থেকে বেরিয়ে যাবে তার প্রতিযোগিতা।

রানাকে যে স্থানীয় লোকগুলো পাহারা দিচ্ছিল তারাও উল্টোদিকে ছুটল। ইরানীদের রানা বলল, 'একটা গাড়ি যোগাড় করতে পারলে তোমরা সবাই এখুনি জেটিতে চলে যাও। অস্ত্র দেখিয়ে একটা জাহাজ দখল করো, তারপর ক্যাপটেনকে বাধ্য করো দুবাই বা কুয়েত যেতে, যেখান থেকে ইরানে ফিরে যাওয়া সহজ হবে।'

'ইরানে নয়, ম্যাডাম আমাদেরকে চেচনিয়ায় পাঠাবেন বলে

কথা দিয়েছেন,' একজন বলল। 'কিন্তু এই বিপদের সময় ম্যাডামকে ফেলে কোথাও আমরা যাব না।'

ইতিমধ্যে প্রায় প্রতিটি করিডর ফাঁকা হয়ে এসেছে। কথা আর না বাড়িয়ে ওদেরকে সঙ্গে নিয়েই ডাইনিংরুমে পৌছাল রানা। ভারতীয় ফাইটার জেটের সনিক বুম ও রানার পরামর্শ, দুটোই কেল্লার প্রতিটি কোণে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়েছে; ফলে খালি হয়ে গেছে শাহ বকশীর কিচেন, ডাইনিংরুম, হারেম ও সার্ভেন্টস কোয়ার্টার।

ডাইনিংরুমের প্রকাণ্ড মেহগনি কাঠের চকচকে টেবিলে একা বসে রয়েছে নাদিরা, দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে প্রায় সত্তর আশিজন ইরানী দেহরক্ষী। মিসাইল কমপ্লেক্সের বাইরে নাদিরার অনুগত যত ইরানী যেখানে ছিল, সবাই তারা চলে এসেছে এখানে।

'শয়তানের বাচ্চাটা যে পালাচ্ছে, এ আমি ধরতেই পারিনি, রানা!' রানাকে দেখে বলল সে। 'বেডরুমে ফোন ধরতে গেল, ভাবলাম এখুনি ফিরে আসবে। কিন্তু...'

'কোন্ পথে, কিভাবে পালিয়েছে, জানো?' তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল রানা।

'কেল্লা থেকে বেরুবার এতগুলো টানেল আছে, খুব কম লোকই সবগুলোর কথা জানে,' বলল নাদিরা। 'তারই একটা ধরে এয়ারস্ট্রিপে পৌছে গেছে সে। এয়ারস্ট্রিপ থেকে ফোন পেয়েছি আমি, ভারতীয় ফাইটারগুলো আসার আগেই তার হেলিকপ্টার চরস ছেড়ে চলে গেছে।'

'রেডিও সেটটা?'

'নিশ্চয়ই ফেলে রেখে যায়নি।'

'কোথায় যাবে সে, আন্দাজ করতে পারো?'

'বিকল্প হেডকোয়ার্টার বা সেফহাউসে যাবে না,' চিন্তা করতে করতে বলল নাদিরা। 'কারণ আইএসআই এজেন্টরা জানে যে

ওগুলোর ঠিকানা আমার জানা আছে। ওরা তাকে নিজেদের নতুন কোন সেফহাউসে রাখবে, তবে সেটা নিশ্চয়ই ভারতের কোথাও হবে। মিসাইলের টার্গেট বদলে দিতে পারলে আইএসআই সম্ভবত টেলিফোনে বকশীকে খবরটা জানাবে, সঙ্গে সঙ্গে রেডিও সিগন্যাল পাঠিয়ে মিসাইলগুলো লঞ্চ করবে বকশী। কাজটা ভারতের মাটি থেকে করা হবে। কেউ যাতে পাকিস্তানকে দায়ী করার সুযোগ না পায়...'

বাধা দিল রানা। 'মিসাইলের টার্গেট কে বদলাবে?'

'আইএসআই যাকে আমার বদলে দায়িত্ব দিয়েছে।'

'রেডিও নিয়ে কেল্লার ছাদে ছিল সে, আইএসআই হেড অফিস থেকে দুঃসংবাদ পাবার পর টেলিফোন করে শাহ বকশীর বেডরুমে?'

'হ্যাঁ। মেহেরবান।' নাদিরার চেহারা উজ্জ্বল হলো। 'তার জানার কথা বকশী কোথায় লুকাবে।'

'তার হয়তো ধারণা, গোটা চরসে কেল্লার ছাদটাই সবচেয়ে নিরাপদ,' বলল রানা, হাসছে। 'এমন কি মরতে চাইলেও একটা লাফ দিলেই যথেষ্ট।'

এক লাফে চেয়ার ছাড়ল নাদিরা, চোখ দুটো আগুনের মত জ্বলছে। 'ওকে কিন্তু আমি মারব! কেটে টুকরো টুকরো করে কুত্তাকে দিয়ে যদি না খাওয়াই তো আমার নাম নাদিরা নয়, আমি পাগলও নই... না, মানে–কি বলতে কি বলেছি, ভুলে যাও!'

'তোমার সব কথা আমি ভাল করে শুনতেই পাইনি,' জোর করে একটু হেসে বলল রানা। 'তবে মেহেরবানকে ধরতে পারলেও, এখুনি তাকে আমরা মারতে পারছি না, নাদিরা।'

'কেন?'

'যতটা ভাবছ, তারচেয়ে অনেক বেশি শক্ত সে,' বলল রানা। 'এমন কি টরচার করেও মুখ খোলানো কঠিন হবে।'

'গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল ওরা,' বলল নাদিরা, তাকিয়ে

আছে যেন বহু দূরে। 'আমার বাবার গায়ে। ওরা জানতে চাইছিল, আমার দুই ভাই কোথায় লুকিয়েছে। আমার আধবুড়ি মাকে তখন ধর্ষণ করা হচ্ছে, সেই মা চিৎকার করে বাবাকে বলছিল, "বোলো না! ছেলেদের কথা বোলো না..."। কিন্তু আমার বাবার গায়ে যখন আরও খানিক পেট্রল ঢালা হলো, তিনি হাত দিয়ে মেঝেটা দেখিয়ে দিলেন। কাঠের পাটাতন তুলে আমার দুই ভাইকে টেনে-হিঁচড়ে বের করল রুশ সৈন্যরা। ওখানেই তাদেরকে গুলি করে মারা হয়। তারপর ওরা আমাকে ধরে। তো যা বলছিলাম, মেহেরবানের গায়ে আগুন ধরিয়ে দিলেও কি সে মুখ খুলবে না?'

নাদিরার দিকে রানা তাকাতে পারছে না। 'তুমি এখানেই অপেক্ষা করো, নাদিরা। আমি ছাদ থেকে ঘুরে আসি।' প্রহরীদের দিকে তাকাল। 'আমার সঙ্গে একজন এসো, সিঁড়িটা কোনদিকে দেখিয়ে দেবে। ভাল কথা, নাদিরা–কিছু ভেবেছ, ওরা কিভাবে চরস ছেড়ে যাবে?'

নাদিরা জবাব দিল। 'ওদের কয়েকজনকে আমি জোর করে জেটিতে পাঠিয়ে দিয়েছি। তারা এই মাত্র ফোন করে জানিয়েছে, যাত্রীবাহী একটা জাহাজ তারা দখল করতে পেরেছে।'

আঠারো

শাহ বকশীর টেবিলে বসে রেডিওর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে মেহেরবান। কেল্লার ছাদে বা ছাদের এই ছোট্ট অফিসে সে একা। রেডিওর নব ঘুরিয়ে নির্দিষ্ট একটা ফ্রিকোয়েন্সী ধরার প্রাণপণ চেষ্টা

করছে, যদিও জানে আইএসআই হেড অফিস ওর ব্যাপারে হাত ধুয়ে ফেলেছে। এই খানিক আগে আইএসআই চীফ ইউসুফ হায়দার নিজে শেষ মেসেজে তাকে স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, 'আর কিছুক্ষণের মধ্যে ভারতীয় সৈন্যরা প্যারাশুট নিয়ে চরসে নামতে যাচ্ছে। সম্ভবত আজ রাতের মধ্যে ওদের নৌ-বাহিনীর জাহাজ বহরও জেটিতে ভিড়বে। এই পরিস্থিতির জন্যে তুমিই দায়ী। কারণ ভারতীয় ইন্টেলিজেন্সকে নাদিরা আমাদের এজেন্টদের নাম জানিয়ে দেবে, এটা তোমার বোঝা উচিত ছিল। নাদিরাকে তুমি বাধা দিতে পারোনি...'

মেহেরবান করুণ স্বরে আবেদন জানাল, 'এই ভুলের জন্যে যে কোন শাস্তি মাথা পেতে নেব আমি, সার। এখন যেভাবে পারেন মেহেরবানি করে চরস থেকে আমাকে উদ্ধার করার ব্যবস্থা করুন, প্লীজ!'

'ছি, মেহেরবান, ছি! নাদিরা হলে এই অবাস্তব আবদার কখনোই করত না। এজেন্টদের আসলে নিজেদের চেষ্টায় আত্মরক্ষা করতে হয়, বুঝলে। তোমার সমস্যাটা অবশ্য কঠিন। বাঁচার কোন উপায় সত্যি নেই। সেজন্যেই তো নির্দেশ দিচ্ছি—আত্মহত্যা করো, মেহেরবান। তুমি অত্যন্ত গোপনীয় তথ্য জানো, ধরতে পারলে ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স ইন্টারোগেট করে সব বের করে নেবে। ডু ইট, ম্যান। কিল ইওরসেলফ।' এরপর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, শত চেষ্টা করেও আর সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

নিঃশব্দ পায়ে কখন রানা অফিস রুমে ঢুকেছে, মেহেরবান টেরই পায়নি। হাল ছেড়ে দিয়ে নিজের অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা ভাবছিল সে।

চমকে উঠলেও, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল না মেহেরবান। বলতে হলো না, হাত দুটো মাথার ওপর তুলল সে। তারপর বলল, 'ভারতীয় প্যারাট্রুপাররা একটু পরেই চরসে নামবে। শাহ বকশী

পণ্ডিচেরিতে পালিয়েছে। ওখানে আইএসআই-এর একটা সেফ হাউস আছে, সেখান থেকে রেডিও সিগন্যাল পাঠিয়ে মিসাইলগুলো ছুঁড়বে–সময়সীমা শেষ হবার পরও যদি তার ব্যাংকে চাঁদার টাকা জমা না হয়। যা জানি সবই বললাম, ম্যাডাম। এবার আপনার ইচ্ছা–মারতে চাইলে মারুন, আর দয়া হলে পালাবার একটা সুযোগ দিন।'

রানাও জানে না নিঃশব্দ পায়ে কখন ওর ঠিক পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে নাদিরা। জবাবটা সে-ই দিল, 'হ্যাঁ, মেহেরবান, পালাবার একটা সুযোগ তুমি পাচ্ছ।' তার হাতেও একটা পিস্তল বেরিয়ে এলো। 'চেয়ার ছেড়ে অফিস থেকে বেরোও, ছাদের শেষ মাথায় হেঁটে যাও, তারপর প্যারাপেটের ওপর উঠে সোজা নিচে লাফ দাও।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল মেহেরবান, নাদিরা হিসহিস করে বলল, 'কোন কথা নয়!'

এক সেকেন্ড পর কাঁধ ঝাঁকাল মেহেরবান। চেয়ার ছেড়ে বেরিয়ে এলো অফিস থেকে। পিছন ফিরে একবারও তাকাল না। পাঁচিলের মাথায় উঠে সত্যি সত্যি লাফ দিল শূন্যে।

চরসের আকাশে সনিক বুম-এর বিকট আওয়াজ আন্ডারগ্রাউন্ড মিসাইল কমপ্লেক্সেও পৌঁছাল। চন্দ্রা ও জেনারেল গোরস্কি প্রথমে ভয়ই পেল, কারণ তারাও এ-খবর পেয়েছে যে পাকিস্তানীরা দ্বীপটা দখল করতে আসছে। অনেক খুঁজেও ভাল একটা রেডিও সেট যোগাড় করা যায়নি, ফলে আইএসএস হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছে না চন্দ্রা। চরসে কি ঘটছে বা ঘটতে যাচ্ছে সে-ব্যাপারে সম্পূর্ণ অন্ধকারে সে। কন্ট্রোল ও কমিউনিকেশন সেন্টারে মাস্টার কমপিউটর, টিভি মনিটর, ক্লোজ সার্কিট টেলিভিশন আর টেলিফোন আছে, কিন্তু রেডিও সেটগুলো কে বা কারা ভেঙে রেখেছে।

টেলিফোন থাকলেই বা কি, একটাও জাতীয় বা আন্তর্জাতিক লাইনের সঙ্গে সংযুক্ত নয়, শুধু দ্বীপের ভেতর কাজ করে। এমনকি একটা মোবাইল ফোনও কারও কাছে পাওয়া গেল না।

শেষ পর্যন্ত ওদেরকে চমকে দিয়ে রাত বারোটার দিকে ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল একটা টেলিফোন। চরসের মাথায় তখনও এক ঝাঁক ফাইটার জেট চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছে, শুধু জানা যাচ্ছে না ওগুলো পাকিস্তান এয়ার ফোর্সের প্লেন, নাকি ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের।

টেলিফোন বেজেই চলেছে, বেজেই চলেছে, চন্দ্রার নিষেধ থাকায় রাশিয়ানরা কেউ রিসিভার তুলছে না। খবর পেয়ে অফিসার্স কোয়ার্টার থেকে ছুটতে ছুটতে কমিউনিকেশন রুমে চলে এলো চন্দ্রা। 'হ্যালো, কে বলছেন?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল সে।–কর্কশ ও ভারি একটা কণ্ঠস্বর, হিন্দীতে কথা বলছে, শুনে উল্লাসে তার বুকের রক্ত ছলকে উঠল।

'আমি ইন্ডিয়ান আর্মির পাঞ্জাব রেজিমেন্টের একজন কর্নেল, কর্নেল মলমল সিং। আপনি কে?'

'আমি ইন্ডিয়ান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চন্দ্রা দেবযানি,' বলল চন্দ্রা। 'ফ্রেন্ডশিপ মিশন-এর একজন সদস্য।'

'কোড, প্লীজ!' টেলিফোনে যেন বাঘের গর্জন শুনতে পেল চন্দ্রা।

'থ্যাঙ্ক ইউ!'

'মিস দেবযানি,' কর্নেল মলমল সিং বলল, 'এখানে নেমেই খবর পেলাম, ভুয়া পয়গম্বর শাহ বকশী পালিয়েছে, আপনারা তাকে আটক করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সে যাক, আমার ওপর নির্দেশ আছে, চরসে ল্যান্ড করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার সাথে যোগাযোগ করে জানতে হবে মিশনের টীম লীডার মাসুদ রানা মিসাইল কমপ্লেক্স সম্পর্কে গোপনীয় তথ্যগুলো জেনে ফেলেছে কি না। যদি জেনে ফেলে, তাহলে তাকে চরস থেকে ফিরতে দেয়া

যাবে না। এ-ব্যাপারে আপনি আমাকে রিপোর্ট করুন, প্লীজ।'

চন্দ্রা একটু বিরক্তই হলো, তবে সেটা চেপে রেখে বলল, 'নির্দেশ তো আছে, সে আমিও জানি; কিন্তু রানা কতটুকু কি জেনেছে, তা আমি বলতে পারব না। শুধু জানি মিসাইল কমপ্লেক্সে ঢোকার কোন সুযোগ এখনও তার হয়নি।' এক সেকেন্ড চিন্তা করল। 'তবে আইএসআই এজেন্ট নাদিরা মিসাইল, নিউক্লিয়ার ওঅরহেড ও কমপিউটর সম্পর্কে সব তথ্যই জানে। সে যদি রানাকে সব বলে দিয়ে থাকে তাহলে আলাদা কথা।'

'মাসুদ রানা এখন কোথায়?' গর্জে উঠল কর্নেল।

'সম্ভবত কেল্লায়,' বলল চন্দ্রা। 'আমি ঠিক জানি না, সে মারাও গিয়ে থাকতে পারে।'

'আমরা একটা কার্গো প্লেন নিয়ে এসেছি,' বলল কর্নেল মলমল সিং। 'আমার অধীনে দুশো অফিসার ও পেটি অফিসার রয়েছে। আমার ওপর নির্দেশ আছে, প্রথমেই মিসাইল কমপ্লেক্স দখল করতে হবে, দেখতে হবে মিসাইলগুলোর অরিজিনাল টার্গেট ঠিক আছে কি না; তারপর মাসুদ রানাকে ইন্টারোগেট...'

'রাশিয়ান বন্ধুদের সাহায্যে মিসাইল কমপ্লেক্স আমি আগেই দখল করে নিয়েছি,' একটু গর্বের সুরেই বলল চন্দ্রা। 'এখানে এসে শাহ বকশীর ইরানী ভক্তদেরও দেখতে পাবেন আপনি, কর্নেল। সব মিলিয়ে প্রায় একশো জন। হাত-পা বেঁধে, মুখে কাপড় গুঁজে লিভিং কোয়ার্টারের মেঝেতে ফেলে রেখেছি।'

'আমি কোন কাজ অর্ধ-সমাপ্ত রাখতে পছন্দ করি না,' বলল কর্নেল। 'কেল্লা দখল করার জন্যে এখুনি দেড়শো সৈন্য পাঠাচ্ছি, দু'জন মেজরের নেতৃত্বে। আর মিসাইল কমপ্লেক্সে আমি নিজে আসছি...'

'কমপ্লেক্সের বাইরে, গ্রাউন্ড ফ্লোরে রিসিভ করা হবে আপনাদের,' বলল চন্দ্রা। 'আমার সঙ্গে জেনারেল সের্গেই গোরস্কি আর তাঁর কয়েকজন অফিসার থাকবেন। ভাল কথা, তাদের সবার

মুখে রাবারের মুখোশ থাকবে।'

'ওহ্, ইয়েস!' হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল কর্নেল। 'জেনারেল সের্গেই গোরস্কি! মিস দেবযানি, তাঁর ব্যাপারেও আমাকে একটা নির্দেশ দেয়া হয়েছে...'

'কি নির্দেশ, কর্নেল?' তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল চন্দ্রা।

'সেটা আমি ওখানে গিয়েই দেখাব আপনাকে,' বলল কর্নেল মলমল সিং। 'আমাদের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়ের নিজ হাতে লেখা নির্দেশ।'

ভ্যান ও জীপগাড়ির ছোট একটা কনভয় ফাঁকা মাঠ পেরিয়ে বাগানের পথ ধরল, আরও দুশো গজ এগোবার পর দেখা গেল রাস্তার পাশে, লাইটপোস্টের নিচে বিশ-বাইশজনের একটা দল দাঁড়িয়ে আছে, একজন বাদে সবার মুখে রাবারের মুখোশ। কর্নেল মলমল সিং রয়েছে সামনের একটা জীপের ফ্রন্ট সিটে। জীপের ছাদে একটা মেশিনগান ফিট করা। চন্দ্রা ও রাশিয়ানদের দেখে হুংকার ছাড়ল সে, 'হল্ট!' তার ঘন ও লম্বা গোঁফ আর চওড়া জুলফি দেখার মত।

কনভয় দাঁড়িয়ে পড়ল। ভারতীয় সৈন্যরা লাফ দিয়ে ভ্যান ও জীপ থেকে নিচে নামছে, প্রত্যেকের হাতে বাগিয়ে ধরা অটোমেটিক রাইফেল, মাথায় হেলমেট বা ক্যাপ। কর্নেল সহ বেশির ভাগ সৈন্যের গায়ের রঙই কালো।

জীপ থেকে নেমে সরাসরি চন্দ্রার দিকে এগোল কর্নেল। 'মিস দেবযানি?' ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল। 'কর্নেল মলমল সিং।' হ্যান্ডশেক করার পর ইউনিফর্মের বুক পকেট থেকে খামটা বের করে নিজেই খুলল, ভেতর থেকে একটা কাগজ টেনে নিয়ে চিৎকার করে পড়তে শুরু করল, 'জেনারেল সের্গেই গোরস্কি এবং তাঁর দল, ভারতে যাদের উপস্থিতি ভারত সরকার স্বীকার করে না, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই নির্দেশনামার বলে কর্নেল মলমল

সিং তাদেরকে গ্রেফতার করতে পারবেন...'

সবাই দেখল কি ঘটছে, কিন্তু প্রতিবাদ করার বা বাধা দেয়ার সাহসই হলো না কারও। সৈন্যরা সংখ্যায় বেশি, বিশ-বাইশজন রাশিয়ানকে ঘিরে ফেলল তারা। রাশিয়ানদের কাছেও অস্ত্র রয়েছে, কিন্তু সেগুলো সৈন্যদের দিকে তাক করা ছিল না। এটাই সৈন্যদের জন্যে একটা অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করল। রাশিয়ানদের নিরস্ত্র করার কাজটা প্রায় নিঃশব্দেই সারল তারা। এমন কি, চন্দ্রাকেও সার্চ করতে ছাড়ল না।

'ঠিক আছে তো, মিস দেবযানি?' জিজ্ঞেস করল কর্নেল। 'প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর নির্দেশ আপনার কাছে আশা করি পরিষ্কার?'

কর্নেলের হাতে ধরা কাগজটার দিকে আরেকবার তাকাল চন্দ্রা। 'কিন্তু আপনার হাতে ওটাকে সাধারণ একটা কাগজ বলে মনে হচ্ছে, কর্নেল। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোন মনোগ্রাম বা সীল তো দেখছি না।'

'জেনারেল গোরস্কি আর তাঁর দলের ভারতে বসবাস করাটা কি বৈধ?' হেসে উঠে প্রশ্ন করল কর্নেল। 'ভারতে ওদের উপস্থিতি কি আমরা স্বীকার করতে পারি? পারি না। কাজেই ওদেরকে গ্রেফতার করে জেলখানায় পাঠাবার নির্দেশটা সাদা কাগজেই তো লেখা হবে। একটু ভেবে দেখুন।'

ইতিমধ্যে সৈন্যরা বসে নেই, গোরস্কিসহ সবার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিয়েছে।

'আমার পিস্তলটা কেন কেড়ে নেয়া হলো, কর্নেল?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল চন্দ্রা।

'ওটা আপনার পিস্তল নয়, রাশিয়ানদের কারও,' হাসিমুখে জবাব দিল কর্নেল, 'তাই। যদি প্রয়োজন মনে করেন আমাদের একটা পিস্তল নিতে পারেন আপনি, তবে এখুনি না।'

'আমাদের অপরাধটা কি?' এতক্ষণে মুখোশের ভেতর মুখ খুলল জেনারেল গোরস্কি। 'ভারত সরকারের সঙ্গে আমার একটা

চুক্তি ছিল...'

'সেই চুক্তির মধ্যে নিশ্চয়ই এ-কথা ছিল না যে সুযোগ পেলে আপনি পাকিস্তানে অ্যাটম বোমা ফেলবেন, ছিল কি?' হাসল কর্নেল। 'চুক্তির কথা বাদ দিন। আসলে আপনাদেরকে আশ্রয় দিয়ে ভারত খুব বড় একটা পাপ করেছে। এখন সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হওয়া দরকার। আজ রাতেই আপনাদেরকে জাহাজে তুলে মেইনল্যান্ডে পাঠিয়ে দেয়া হবে। আপনি, জেনারেল, একা আমাদের সঙ্গে আন্ডারগ্রাউন্ডে চলুন, প্লীজ। বাকি রাশিয়ানদের বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ করতে বললে খুশি হব।' ঝট করে চন্দ্রার দিকে ফিরল দীর্ঘদেহী, স্মার্ট কর্নেল। 'আপনি আমাদের সঙ্গেই থাকবেন, মিস দেবযানি। আমি যখন প্রথম দশটা সাইলোর প্রতিটিতে ঢুকে বিল্ট-ইন কমপিউটর অন করে টার্গেটিং সিকোয়েন্স ও লকিং সিস্টেম চেক করব, আপনি আমার পাশেই থাকবেন। দু'জন মিলে চেক করলে ভুল হবার ভয় কম থাকে...'

চন্দ্রা ম্লান সুরে বলল, 'কিন্তু কমপিউটর বা মিসাইল সম্পর্কে আমি তো কিছুই বুঝি না...'

'ও, তাই?' বলে চন্দ্রার দিকে কেমন যেন বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কর্নেল। 'তাহলে তো, কিছু মনে করবেন না, আপনাকে আমার কোন প্রয়োজনই নেই।'

'আছে,' বলল চন্দ্রা। 'রানাকে ইন্টারোগেট করার দায়িত্বটা আমি নিতে চাই।'

'ঠিক হ্যায়।' রাজি হলো মলমল সিং। 'তবে আগে তাকে ধরতে হবে। ইতিমধ্যে আমার সৈন্যরা কেল্লায় পৌঁছে গেছে, রানা ধরা পড়লে আমাকে অবশ্যই ফোন করে জানাবে। আপনি তাহলে আমার জীপে বসে অপেক্ষা করুন, আমাদের সঙ্গেই কেল্লায় যাবেন।'

চন্দ্রা মাথা নাড়ল, বলল, 'অন সেকেন্ড থট, আপনার সঙ্গে সাইলোতেই যাই চলুন। জানি না সত্যি, তবে আপনার হাতের

কাজ দেখে কিছু না কিছু শেখা তো হবে।'

ফোন একটা সত্যি এলো, দলবল নিয়ে কর্নেল মলমল সিং আন্ডারগ্রাউন্ড মিসাইল কমপ্লেক্সে নামার পরপরই। ইস্পাতের ঘরটা দেখে থমকাল সে, জিজ্ঞেস করল, 'এর ভেতরেই তো মাস্টার কমপিউটর, তাই না?'

সৈন্যরা এই মুহূর্তে বাকি রাশিয়ানদের গ্রেফতার করতে ব্যস্ত। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাদেরকে সাহায্য করছে জেনারেল গোরস্কি। চন্দ্রা জবাব দিল, 'হ্যাঁ। ভাল কথা, ব্যর্থতা যারই হোক, শাহ বকশী শুধু নিজের জান নিয়ে পালায়নি, রেডিও সেট বা রিমোট কন্ট্রোলটাও নিয়ে গেছে। আমাদের মিসাইলগুলোর টার্গেট যাই হোক, এখন যদি শাহ বকশী রেডিও সিগন্যাল পাঠায়, দশটা মিসাইলই রওনা হয়ে যাবে–নিউক্লিয়ার ওঅরহেড সহ–ভেবে দেখেছেন, তার পরিণতি কি হবে?'

'শাহ বকশী রেডিও সিগন্যাল পাঠাবে তার নির্ধারিত সময়-সীমা পার হবার পর, সাত হাজার কোটি টাকা চাঁদা না পেলে,' বলল কর্নেল। 'আমরা তার আগেই শয়তানের দালালটাকে গ্রেফতার করতে পারব বলে আশা রাখি।'

ঠিক এই সময় ফোনটা এলো। কাছে ছিল চন্দ্রা, সে-ই রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল। কয়েক সেকেন্ড পর রিসিভারটা কর্নেলের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, 'আপনার কল। মেজর প্রতাপ সিং।'

রিসিভার নিয়ে দু'মিনিট কথা বলল কর্নেল মলমল সিং। তার কথা শুনে বোঝা গেল, কেল্লাতেই পাওয়া গেছে মাসুদ রানাকে। তবে আইএসআই এজেন্ট নাদিরা বুলবুলি এখনও নিখোঁজ। মেজর প্রতাপকে কর্নেল জানাল, চন্দ্রা দেবযানিকে নিয়ে খানিক পরই কেল্লায় আসছে সে, তখন মাসুদ রানাকে ইন্টারোগেট করা হবে।

ফোনে কথা বলতে ব্যস্ত কর্নেল, পাশে দাঁড়িয়ে তার দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে রয়েছে চন্দ্রা। কমিউনিকেশন রুমে এই মুহূর্তে ছোটখাট একজন ক্যাপটেন ছাড়া আর কেউ নেই। হঠাৎ ঝট করে ক্যাপটেনের হোলস্টার থেকে এক টানে পিস্তলটা তুলেই কর্নেলের কানের ওপর খুলিতে মাজল চেপে ধরল চন্দ্রা। 'সাবধান, রানা! এক চুল নড়বে না! ক্যাপটেন, পিছু হটো! কুইক!',

কর্নেল মলমল ওরফে মাসুদ রানার মুখে মখমলের মত নরম হাসি। 'তুমি তাহলে ধরে ফেললে?'

'ওয়েল ডান, রানা!' চন্দ্রার ঠোঁটে নার্ভাস হাসি। 'রিয়েলি ওয়েল ডান! তোমার হিন্দীর যেমন কোন তুলনা হয় না, তেমনি মেকআপেরও। কাঠকয়লার পেস্ট তৈরি করে সারা গায়ে মেখেছে সবাই, সেজেন্যই প্রথমে সন্দেহ হয়নি যে ওরা ইরানী।'

'পিস্তলটা কি সরাবে, চন্দ্রা?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করল রানা।

'ভারতীয় সৈন্যরা এসে আমার কাছ থেকে মিসাইল কমপ্লেক্সের দায়িত্ব বুঝে নেবে, এই প্রত্যাশায় এতটাই ব্যাকুল হয়েছিলাম আমি, মনেই পড়েনি ইরানী লোকগুলোর কাছে ইন্ডিয়ান আর্মির প্রচুর ইউনিফর্ম আছে।' চন্দ্রা উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে, পিস্তলটা রানার খুলিতে আরও জোরে চেপে ধরল। 'যাই হোক, তোমরা সত্যি আমাকে বোকা বানিয়েছ। কিন্তু আমার দায়িত্ব আমি ঠিকই পালন করব। রানা, আমি সিরিয়াস। তোমার সঙ্গীদের বলো এখুনি তারা জেনারেল গোরস্কি আর তাঁর লোকজনকে মুক্ত করে দিক, অস্ত্রগুলোও ফিরিয়ে দিক; তা না হলে আমার গুলি খেয়ে এখানে দাঁড়িয়েই মারা যাচ্ছ তুমি।'

রানা বলল, 'বলছ দায়িত্ব পালন করবে। সেটা আসলে কি, চন্দ্রা? একটু ব্যাখ্যা করবে?'

'আমার ওপর নির্দেশ আছে, দূর পাল্লার দশটা মিসাইলের নির্ধারিত টার্গেট যেমন আছে তেমনি থাকবে, কোন অবস্থাতেই

কাউকে বদলাবার সুযোগ দেয়া যাবে না।'

'শুধু এই একটা দায়িত্ব, চন্দ্রা?' রানার গলায় কঠিন সুর। 'ওই দশটা মিসাইল কোথায় কোথায় টার্গেট করা হয়েছে তা যদি কেউ জেনে ফেলে–বিশেষ করে মাসুদ রানা যদি জেনে ফেলে–তাকে চরস থেকে জীবিত ফিরতে না দেয়ার দায়িত্বও কি তোমাকে দেয়া হয়নি?'

চন্দ্রার চোয়াল শক্ত হলো, গ্রীবা উঁচু করে স্পষ্ট উচ্চারণে সে বলল, 'হ্যাঁ, সে দায়িত্বও আমাকে দেয়া হয়েছে। সত্যি আমি দুঃখিত, রানা!' কঠিন ও নির্দয় হতে গিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল চন্দ্রা দেবযানি, পরমুহূর্তে আবার পাষাণে পরিণত হলো–পিস্তলের ট্রিগারটা টেনে দিল সে।

উনিশ

ছোটখাট ক্যাপটেন, অর্থাৎ নাদিরা, একহাতে জীপের স্টিয়ারিং হুইল ধরে আছে, অপর হাতের আঙুলে বাধিয়ে রেখেছে সদ্য ধরানো সিগারেট। ঝড়ের বেগে ছুটছে জীপ। পাশের সিটে চিন্তামগ্ন রানা।

'পাকিস্তানীরা মিসাইলগুলোয় হাতই লাগাতে পারেনি,' হঠাৎ করেই বলল রানা, 'কারিগরি ফলানোর তো প্রশ্নই ওঠে না। এর মানে, শাহ বকশীকে তারা মিসাইল ছোঁড়ার সবুজ সংকেত দেবে না, বরং তাকে খুন করে হলেও রেডিও সেটটা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করবে।'

'কাজেই জনাব শাহ বকশী ভুলেও আইএসআই-এর কোন সেফহাউসে যাবে না,' সায় দিয়ে বলল নাদিরা। 'আর নিজের কোন বিকল্প আস্তানাতেও যাবে না, কারণ আইএসআই তাকে জানিয়েছে ওগুলোর ঠিকানা আমি জানি।'

'তাহলে কোথায় যাবে সে?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল রানা, হাত তুলে দেখল রোলেক্সে ঘণ্টার কাঁটা রাত তিনটের ঘর ছুঁতে যাচ্ছে।

'ধরা না পড়লে কোথায় যেত, সত্যি আমি জানি না, রানা,' বলল নাদিরা। 'বড় পিচ্ছিল মানুষ, বুঝলে। কত্তো বড় হারামির হাড়, কল্পনা করো—তা না হলে কি মানুষকে নষ্ট করার ধর্ম প্রচার করে।'

'ধরা না পড়লে কোথায় যেত—তোমার এ-কথার মানে?'

'এয়ারস্ট্রিপের অফিসে তোমার জন্যে আরও একটা সারপ্রাইজ আছে,' বলল নাদিরা, হাসছে না।

'আরও একটা মানে?'

'কেন, ফাঁদ বলো, পরীক্ষা বলো, আয়োজনটা তো আমিই করেছিলাম,' বলল নাদিরা। 'চন্দ্রা দেবযানি সেই ফাঁদে ধরা পড়েছে বা সেই পরীক্ষায় ফেল করেছে। আমি বলেছিলাম, তোমাকে বাধা দেবে সে, প্রয়োজনে খুন করে হলেও। ঠিক তাই ঘটতে যাচ্ছিল। ভেবে দেখো, পিস্তলটায় যদি গুলি থাকত?'

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল রানা। 'ভাবতে খারাপ লাগছে যে চন্দ্রা আমারই মত একজন বাঙালী হয়েও...যাকগে, ভুলে যাওয়াই ভাল।'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল নাদিরার। 'আচ্ছা, রানা, রাশিয়ানদের তুমি পারসীদের জাহাজে উঠিয়ে দিলে কেন, সুরাট বা বরোদায় গিয়ে কি করবে ওরা? চন্দ্রা নাহয় জাহাজ থেকে নেমে নিজের বাড়ি চলে যাবে, কিন্তু রাশিয়ানরা?'

'শাস্তি বা পুরস্কার, যার যা প্রাপ্য, কমবেশি সবাই তো পেল

বা পাবে, রাশিয়ানরাই বা বাদ যাবে কেন?' হাসছে রানা। 'রাবারের মুখোশ পরাটা চরসে সম্ভব ছিল, কিন্তু মেইনল্যান্ডে? দুনিয়ার মানুষ কয়েকদিনের মধ্যে জেনে ফেলবে নিখোঁজ নিউক্লিয়ার ওঅরহেড আর মিসাইল নিয়ে কি করেছে জেনারেল গোরস্কি। সবচেয়ে উপযুক্ত শাস্তি পাবে ভারত। রাশিয়া তাদের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু, সেই বন্ধুর সঙ্গে বেঈমানী করে ধরা পড়ে যাচ্ছে।'

'আবার অবৈধ পন্থায় সংগ্রহ করা মিসাইল ও বোমাও হারাতে হচ্ছে,' বলল নাদিরা। তারপর হঠাৎ প্রায় আঁতকে উঠল। 'রানা! সত্যি করে বলো তো, ওই দশটা মিসাইলের টার্গেট বদলে নতুন কি কি টার্গেট দিয়েছ? আমি তোমাকে অন্তত একটা বোমা মস্কোয় ফেলতে বলেছি, মনে আছে? তাছাড়া, আমার ইরানী বন্ধুরা আরব সাগর ধরে গালফ অব ওমানের দিকে যাচ্ছে...'

'তাহলে চিন্তার কিছু নেই,' আশ্বস্ত করল রানা। 'মিসাইলগুলো ওদিকে যাবে না। আসলে তোমাকে খুশি করার জন্যে সবগুলোই রাশিয়ার দিকে তাক করেছি।'

'ঠাট্টা করছ করো, কিন্তু প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগটা হাতছাড়া হওয়ায় আমার খুব খারাপই লাগছে।'

'আমি খুনী নই, নাদিরা। আমি চাই তুমিও নিজেকে খুনী ভাববে না।'

'জানো, ওদের সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না,' বিষণ্ণ সুরে বলল নাদিরা। 'ওদের লীডার জানবাজকে একটা সুইস ব্যাংকের নাম ও লকারের চাবি দিয়েছি। ওখান থেকে প্রচুর টাকা পাবে ওরা...'

'কেন বলছ, ওদের সঙ্গে আর কখনও দেখা হবে না?'

'এটা একটা প্রশ্ন হলো?' নাদিরা সত্যি সত্যি অবাক, নাকি অবাক হবার ভান করছে বোঝা গেল না। 'তুমি জানো না, রানা? আমি তো তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। যেখানেই থাকি, দু'জন একসঙ্গে...'

সময় থাকতে বাধা দিতে চাইল রানা। 'সেই পাগলামিটা দেখছি আবার শুরু করছ তুমি। প্লীজ, নাদিরা–এ-সব বাদ দিয়ে আমার কৌতূহলটা মেটাও। আরেকটা সারপ্রাইজ মানে কি শাহ বকশী ধরা পড়েছে?'

মাথা ঝাঁকাল নাদিরা। 'সে একটা টানেল থেকে বেরিয়ে নিজের হেলিকপ্টারের দিকে যাচ্ছিল, এই সময় আমার সেসনার গার্ডরা দেখতে পেয়ে আটক করেছে।'

'একা?'

'একা।'

'এখন সে কোথায়?'

'মোবাইল ফোনে ওরা আমাকে জানিয়েছে, কোন রকম অসম্মান না করে ওরা তাকে একটা খালি অফিস কামরায় বসিয়ে রেখেছে–যে কামরা থেকে ফ্যাক্স মেসেজ পাঠিয়েছ তুমি।'

'রেডিও সেটটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'শাহ বকশীকে সার্চ করা হয়নি?'

'হয়েছে। দুটো পিস্তল ছিল, কেড়ে নিয়েছে ওরা। কিন্তু রেডিও সেটটার যে কি গুরুত্ব, গার্ডদের জানা নেই, ফলে ওটা শাহ বকশীর কাছেই রয়ে গেছে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর হঠাৎ রানা বলল, 'নাদিরা, তুমি কি বুঝতে পারছ আমার মিশন ব্যর্থ হতে যাচ্ছে?'

'মানে?' কি যেন ভাবছিল নাদিরা, রানার কথা শুনে তেমন বিচলিত হলো না।

'মিসাইলের বিল্ট-ইন কমপিউটর অপারেট করে আমি শুধু ওগুলোর টার্গেট বদলে দিতে পেরেছি,' বলল রানা। 'ওগুলো এখন কোন শহরে পড়বে না, পড়বে ভারত মহাসাগরে। কিন্তু যে লোকটা–এখানে শাহ বকশী–রেডিও সিগন্যাল পাঠিয়ে মিসাইল ছুঁড়বে, সে তো ওই একই পদ্ধতিতে নিউক্লিয়ার ওঅরহেডও অ্যাকটিভেট করবে, তাই না? তারমানে ভারত মহাসাগরের

পানিতে পড়লেও বোমাগুলো ফাটবে। পঞ্চাশ থেকে দুশো মেগাটনের দশটা পারমাণবিক বোমা পঞ্চাশ মাইল পরিধির মধ্যে সাগরে বিস্ফোরিত হলে তার পরিণতি কি ভয়াবহ হবে, কল্পনা করতে পারো?

'ভূমিকম্প হতে পারে। জ্যান্ত প্রাণীর মত ফুঁসে উঠে বহুদেশের ডাঙায় উঠে আসতে পারে ভারত ও আরব সাগরের পানি। সমস্ত মাছ তো মারা যাবেই, সাগরের তলায় জলজ উদ্ভিদ বলতে কিছু থাকবে না। সাগর সংলগ্ন প্রতিটি দেশের উপকূলের মানুষ তেজস্ক্রিয়তার শিকারে পরিণত হবে...'

'বুঝলাম, অনেক ক্ষতি হবে,' বাধা দিয়ে বলল নাদিরা। 'কিন্তু তোমার বা আমার কি করার আছে?'

'আছে, নাদিরা,' বলল রানা। 'শাহ বকশীকে তুমি বোঝাতে পারো, সে যেন কিছুতেই ওঅরহেডগুলো অ্যাকটিভেট না করে। অ্যাকটিভেট করা না হলে ভারত মাহসগরে পড়ে ডুবে যাবে ওগুলো; মানুষ, প্রকৃতি বা পরিবেশের কোন ক্ষতিই হবে না।'

'কেন ভাবছ, আমার কথা শুনবে সে?' মাথা নাড়ল নাদিরা। 'আমাকে দেখে বরং আরও খেপে উঠবে। না, রানা, আমাকে তুমি ওই ভণ্ড শয়তানটার সামনে দাঁড়াতে বোলো না, প্লীজ।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'কি আর করা, আমি নিজেই বোঝাবার চেষ্টা করব।'

বাঁক নিল জীপ। সামনে এয়ারস্ট্রিপ দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ ব্রেক কষে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে রানার দিকে তাকাল নাদিরা। 'তোমার সমস্যার সুন্দর একটা সমাধান আছে আমার কাছে...'

'এটা একা আমার সমস্যা নয়, নাদিরা,' গম্ভীর সুরে বলল রানা। 'গোটা দুনিয়ার সমস্যা। সমাধানটা বলো।'

'চলো মিসাইল কমপ্লেক্সে ফিরে যাই,' বলল নাদিরা। 'তারপর ইস্পাতের ঘরে ঢুকে মাস্টার কমপিউটরটা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিই। জনাব শাহ বকশী যতই রেডিও সিগন্যাল পাঠাক,

কমপিউটর না থাকলে সব বৃথা। ওঅরহেডও অ্যাকটিভেট হবে না, মিসাইলও উড়বে না।'

রানা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, ইস্পাতের ঘরে ঢোকা হবে কিভাবে, চাবি তো শাহ বকশীর কাছে? তবে বুঝতে পারছে যে নাদিরা মানসিক অস্থিরতায় ভুগছে, তাই প্রশ্নটা করল না। এটা যে কোন সমাধান নয়, সেটা অবশ্য বুঝিয়ে দিল। 'মিসাইল যদি না ছোঁড়া হয়, তাহলে মিসাইল ও ওঅরহেড ভারতের কাছেই থেকে যাবে। তুমি আমাকে এই তথ্য নিয়ে দেশে ফিরতে বলো যে আমার দেশের দুটো বড় শহরে ভারত পারমাণবিক বোমা তাক করে রেখেছে?' মাথা নাড়ল রানা। 'প্রাণ থাকতে নয়!'

জীপ ছেড়ে দিল নাদিরা। 'বেশ, তুমি যা ভাল বোঝো করো।'

কেউ বললে রানা বিশ্বাস করত না, কিন্তু নিজের চোখে দেখার পর অবিশ্বাস করে কিভাবে! একজন গার্ডের কাছ থেকে চাবি নিয়ে অফিস কামরায় একাই ঢুকেছে ও। তালা খোলার বা ওর পায়ের শব্দ শাহ বকশী বোধহয় শুনতেই পায়নি। পাবে কি করে, সে নিজেই কামরার ভেতর মারাত্মক শব্দদূষণের জন্ম দিচ্ছে। কোথা থেকে লোহার একটা রড যোগাড় করেছে, বারবার বাড়ি মেরে টেবিলে রাখা দুটো ফ্যাক্স মেশিনের একটাকে ভেঙে কিছু রাখছে না। এই একটাই নয়, মাঝে মধ্যে বিরতি নিয়ে অন্য কিছু কাজও করছে শাহ বকশী–তবে আত্মপীড়নকে কাজ বলা যায় কিনা সেটা তর্ক সাপেক্ষ ব্যাপার। রড ফেলে দু'হাত দিয়ে চাপ দাড়ি ধরছে, তারপর গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে টানছে, পাকা চুলগুলো মুঠোমুঠো ছিঁড়ে আনছে। আবার কখনও নিজের একটা হাত দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরছে–এই বয়সেও তার দাঁত খুব ধারালই বলতে হবে, তা না হলে অত গভীর ক্ষত সৃষ্টি হচ্ছে কিভাবে।

স্বভাবতই রানার ধারণা হলো, শাহ বকশী পাগল হয়ে গেছে। অত্যন্ত সাবধানে এগোল ও। টেবিলের ওপর কত রকমের অফিস

স্টেশনারি, আরেকটি ফ্যাক্স মেশিন, কাগজ-পত্র ছড়িয়ে রয়েছে; ওগুলোর চারপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে ছোট্ট একটা রেডিও সেট খুঁজছে। খুঁজতে খুঁজতে পেয়েও গেল। একজোড়া পেপারওয়েটের মাঝখানে কালো ও [illegible]্যাটে একটা আকৃতি, দেখতে টিভির রিমোট কন্ট্রোল-এর মত।

রডটা তুলে নিয়ে ভাঙা ফ্যাক্স মেশিনের ওপর আবার একটা বাড়ি মারল শাহ বকশী। একবারও তাকায়নি রানার দিকে, কাজেই কথা শুনে চমকে উঠতে হলো। 'ভেবেছ আমি পাগল হয়ে গেছি? না, হে শালা, না! এ হলো আমার নিষ্ফল আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ।' ধপ করে পিছনের চেয়ারটায় বসে পড়ল। 'প্রথমে আইএসআইকে ফ্যাক্স করে বললাম, এই বিপদ থেকে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাও, চাঁদার অর্ধেক টাকা দিয়ে দেব। উত্তরে শালা বানচোতরা বলে কি না, ভারত তো টাকা দিচ্ছেই না, ওদেরও আমাকে আর দরকার নেই। তারপর ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। বললাম, চাঁদা দেয়ার সময়-সীমা কমিয়ে আধঘণ্টা করেছি, এই আধঘণ্টার মধ্যে জানাও টাকা দিচ্ছ কি না, তা না হলে অবশ্যই মিসাইল ছুঁড়ব। ওরা জবাব দিল...কি জবাব দিল তা আর তোমার মত বেজন্মার শোনার দরকার নেই।'

'টাকা যদি না-ই দেয়, মিসাইল ছুঁড়ছো না কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'পারলে দিল্লি, বোম্বে আর কোলকাতাকে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দাও। তোমার বাপ, ব্যাটা শয়তানও খুব খুশি হবে–মানুষের অমঙ্গল আর ধ্বংসই তো সে দেখতে চায়।'

হঠাৎ দুম করে টেবিলে একটা ঘুসি মারল শাহ বকশী। 'তাহলে শোন রে, হারামজাদা! ভারত আমাকে টাকা দিতে চাইছে না, সেজন্যে তুই-ই দায়ী!'

'ছাগলটা বলে কি!' রানা অবাক। 'আমি দায়ী!'

'তুই শালা ন্যাকা সাজছিস!' খেপে গিয়ে আবার টেবিলে ঘুসি মারল ভণ্ড ধর্মপ্রচারক। 'মিসাইলের টার্গেট বদলে দিয়ে দিল্লি,

বোম্বে আর কোলকাতাকে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিতে বলছিস! আমকে ব্যঙ্গ করা হচ্ছে! ভারত সরকার এখন জানে মিসাইলগুলো ফাঁকা মহাসাগরে পড়বে...'

রানা ভাবছে, ভারত সরকার এত তাড়াতাড়ি খবরটা পেল কিভাবে? তারপর বুঝতে পারল কি ঘটেছে। চার্টার করা যাত্রীবাহী জাহাজে উঠেই আইএসএস হেড অফিসে ফ্যাক্স করেছে চন্দ্রা। 'ও, আচ্ছা, এতক্ষণে বুঝলাম। ভারত ভাবছে, বোমাগুলো যেহেতু তার মাটিতে কোথাও বা অন্য কোন দেশে পড়ছে না, তাই আর টাকা দেয়ারও কোন প্রয়োজন নেই।' হাসল রানা। 'যদিও ভারত কিছুটা ভুল তথ্য পেয়েছে। তবে এখানে আমরা পাগলা কুত্তার যে অভিনয় দেখলাম সেটা টাকা না পাবারই শোকে, এতে কোন সন্দেহ নেই।'

টেবিল থেকে ঝট করে খুদে রেডিও সেটটা তুলে নিয়ে রানাকে দেখাল শাহ বকশী। 'টাকা পাইনি, কাজেই মহান শয়তান আমাকে যা বলবেন আমি তাই শুনব। তিনি আমাকে মিসাইলগুলো ছুঁড়তে বলছেন। বলছেন, ওঅরহেডগুলো যেন এক এক করে অ্যাকটিভেট করতে না ভুলি।'

হার্টবিট বাড়ল, গলাও শুকাল, তবে চোখে-মুখে বিদ্রূপ ও চ্যালেঞ্জের ভাব ফুটিয়ে রানা বলল, 'একটু আগে যে বললাম, ভারত কিছুটা ভুল তথ্য পেয়েছে, সে-কথা কানে যায়নি?'

'ভুল তথ্য? কি ভুল তথ্য?' শাহ বকশীর চোখে সন্দেহ।

'টার্গেট বদলানোয় সবগুলো মিসাইল ভারত সাগরে পড়বে না,' বলল রানা। 'কারণ একটা মিসাইলকে টার্গেট হিসাবে দেয়া হয়েছে চরস দ্বীপ।'

'তারমানে?' শাহ বকশী হতভম্ব।

'এরমানে মিশন সফল করার স্বার্থে,' বলল রানা, গম্ভীর, 'আত্মহত্যা করছি আমি। চরস বলে কোন দ্বীপ থাকছে না।'

'মিথ্যে কথা!' গলা ফাটাল শাহ বকশী।

‘মিথ্যে কি সত্যি রেডিও সিগন্যাল পাঠালেই বুঝতে পারবে...’

‘কত নম্বর মিসাইল?’ রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করল শাহ বকশী। ‘দশটার মধ্যে কোনটা?’

হাসল রানা। ‘ওরে শালা ধূর্ত শেয়াল, আমাকে বোকা বানিয়ে বাঁচার পথ খোঁজা হচ্ছে! কত নম্বর মিসাইল বলে দিলে ওটা তুমি ছুঁড়বেও না, ওটার ওঅরহেডও অ্যাকটিভেট করবে না!’

হঠাৎ হাসল শয়তানের মুখপাত্র, রীতিমত গলা ছেড়েই। ‘আচ্ছা, আমাকে তো মরতেই হচ্ছে, তাই না? হয় তোর হাতে, নয়তো বোমা বিস্ফোরণে। তা মরতে যখন হবেই, তোকে নিয়ে কেন মরি না? সবগুলো মিসাইলই ছুঁড়ি, বোমাও সবগুলো অ্যাকটিভেট করি, তারপর যা ঘটার ঘটুক...’

‘যা খুশি তাই করতে পার, তবে তোমার একটা ভুল আমি শুধরে দিই,’ বলল রানা। ‘আমি ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করি না। তোমাকে মারার উদ্দেশ্য নিয়ে চরসে আসিনি আমি, এসেছিলাম বাংলাদেশকে বিপদমুক্ত করতে। কাজেই, আমার হাতে তোমাকে মরতে হবে, এটা তোমার ভুল ধারণা।’

‘তাহলে?’ ভুরু কোঁচকাল শাহ বকশী। ‘আমাকে নিয়ে কি করা হবে?’

‘স্বেচ্ছায় ধরা দিলে গ্রেফতার করে তুলে দেব ভারতীয় পুলিসের হাতে।’

‘নাহ্!’ মাথা নাড়ছে শাহ বকশী। ‘ভারতীয় কোর্ট নির্ঘাত আমাকে ফাঁসিতে লটকাবে।’

‘ওদের পার্লামেন্টে মৃত্যুদণ্ড বাতিল করার প্রস্তাব উঠতে যাচ্ছে,’ বলল রানা। ‘আমার ধারণা ওরা তোমাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেবে।’

‘সেটা আরও অপমানকর!’ হঠাৎ চিৎকার করে উঠল শাহ বকশী। ‘কয়েদীরা আমাকে শয়তানের চেলা, শয়তানের চামচা এই সব বলবে। ওরা খুব ঈশ্বর ভক্ত হয়, আমার জীবন একেবারে

নরক করে তুলবে। না, তা আমার সহ্য হবে না।' হঠাৎ কি যেন ভাবল সে, চোখমুখে করুণ একটা ভাব এসে যাচ্ছে। 'কি বলেছি ভুলে যান, জনাব মাসুদ রানা।' দু'হাত মাথার দু'পাশে তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করল। 'এই আমি সারেন্ডার করছি। প্লীজ, প্লীজ, একটু দয়া করুন–আমাকে সম্মানজনকভাবে মরতে দিন।'

'বুড়ো ভাম নিশ্চয়ই আবার কোন কুমতলব আঁটছে,' বিড়বিড় করল রানা।

'না, বিশ্বাস করুন, না!' বেহায়ার মত হাত জোড় করল শাহ বকশী। 'এ-ও আসলে মহান শয়তানের নির্দেশ। আমাকে তিনি নিজের কাছে ডেকে নিচ্ছেন। বলছেন, ঈশ্বর ভক্তদের দ্বারা লাঞ্ছিত হবার চেয়ে আমার কাছে ফিরে আয়। সার, জনাব, মহাশয়–আপনার ওই পিস্তলটা দিয়ে দয়া করে আমার মাথায় একটা গুলি করুন...'

মাথা নাড়ল রানা। 'একবার না বললাম, আমি ছুঁচো মারি না।'

'তাহলে ইরানী গার্ডদের কাউকে ডাকুন,' মিনতির সুরে কথা বলছে শাহ বকশী। 'কিংবা আমার স্ত্রী নাদিরাকে। অনুরোধ করে দেখি, একটু রহম দেখিয়ে আমাকে একটা গুলি করতে রাজি হয় কিনা।'

'তোমার কপালটা খারাপ হে, বুড়ো শয়তান,' বলল রানা। 'গার্ডদের নিয়ে অনেক আগেই জেটিতে চলে গেছে নাদিরা।'

উদভ্রান্ত, দিশেহারা দেখাচ্ছে শাহ বকশীকে। 'তাহলে একটা মাত্র বুলেট রেখে পিস্তলটা আমাকে একবার ধার দিন, প্লীজ।' আবার হাত জোড় করল সে।

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা, তারপর নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল। ওয়ালথারটা দু'হাতের ভেতর রেখে ম্যাগাজিন থেকে সব বুলেট বের করে নিল ও, তারপর সেটা উল্টো করে ধরে টেবিলের ওপর রাখল, পিছিয়ে এলো তিন পা। 'চেম্বারে কিন্তু একটা মাত্র

বুলেট আছে,' মনে করিয়ে দেয়ার সুরে বলল।

'ধন্যবাদ! মহান ঈশ্বর ও মহান শয়তান আপনার মঙ্গল করুন!' কৃতজ্ঞতায় বারবার নুয়ে পড়ছে শাহ বকশী। টেবিলের ওপর ঝুঁকে পিস্তলটা তুলল। ধীরে ধীরে উঁচু হলো হাত। রানার পিস্তল এখন রানার দিকেই তাক করা। 'গাধা কি গাছে ধরে, অ্যাঁ? শালা বাঙ্গাল লোগ বুদ্ধু হ্যায়! আর তুম শালা...' কথা শেষ না করেই রানার মাথা লক্ষ্য করে ধরা ওয়ালথারের ট্রিগার টেনে দিল।

রানার ছুরিটা ছুটল এক সেকেন্ড পরে। বিস্ময়ের ধাক্কা এমন অসাড় করে দিল, শাহ বকশী বুকে কোন ব্যথাই অনুভব করছে না, অথচ ছুরিটার সবটুকু ফলা বাম স্তনের নিচে অদৃশ্য হয়ে গেছে, বেরিয়ে আছে শুধু হাতলটা।

চোখ দুটো বিস্ফারিত, ছুরির হাতলটা দেখছে শাহ বকশী। এগিয়ে এসে তার হাত থেকে পিস্তলটা ছোঁ দিয়ে কেড়ে নিল রানা, অপর হাত দিয়ে টেবিল থেকে তুলে নিল খুদে রেডিও সেটটা।

অফিস কামরায় কোন গুলি হয়নি, কারণ শাহ বকশীকে খালি পিস্তল দিয়েছিল রানা। কিছু লোককে কখনোই বিশ্বাস করতে নেই, এই শিক্ষা বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে অর্জন করেছে ও।

শাহ বকশীর লাশ টেবিলের ওপাশের মেঝেতে পড়ে গেছে। সেদিকে না গিয়ে দ্বিতীয় ফ্যাক্স মেশিনটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিল রানা। সুইটজারল্যান্ডের একটা বিখ্যাত স্যানাটরিয়ামের ফ্যাক্স নাম্বার জানা আছে ওর, ওদেরকে একটা মেসেজ দিয়ে রাখল। চরস থেকে ওদিকে যাবার পথে বেশ কয়েকটা এয়ারপোর্টে যাত্রাবিরতির প্রয়োজন হবে, একটা ফ্লাইট প্ল্যান তাদেরকেও জানিয়ে রাখল।

হ্যাঙ্গার সংলগ্ন অফিস বিল্ডিং থেকে রানওয়েতে বেরিয়ে এসে নাদিরা বা ইরানী গার্ডদের প্রথমে কোথাও দেখল না রানা। তারপর দূরে তাকাতে একটা হেলিকপ্টারের পাশে দাঁড়িয়ে

থাকতে দেখল ওদেরকে। হাত নাড়ার ভঙ্গি দেখে বোঝা গেল, ইরানী ভক্তদের বিদায় জানাচ্ছে নাদিরা।

উঁকি দিয়ে তাকাতে খোলা হ্যাঙ্গারের ভেতর নাদিরার সেসনাটাকে দেখতে পেল রানা। ভারতীয় ফাইটার প্লেন থেকে শেল ছোঁড়া হতে পারে, এই ভয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে।

খোলা হ্যাঙ্গার থেকে বেরিয়ে আসা আলোয় দাঁড়িয়ে পকেট থেকে খুদে রেডিও সেটটা বের করল রানা। এরকম রেডিও সেট বা রিমোট কন্ট্রোল আগে কখনও দেখেনি ও, তাই একটু ভয় ভয় করছে–কোন্‌টা টিপতে ভুল করে কোন্‌টা টিপে ফেলবে, পরিণতিতে গোটা দ্বীপটাই না উড়ে যায়। তবে না, ওটা একটু নাড়াচাড়া করতেই প্লাস্টিকের একটা ঢাকনি সরে গিয়ে ছোট্ট চারকোনা ডিসপ্লে স্ক্রীন বেরিয়ে পড়ল, তাতে মিসাইল অপারেট ও নিউক্লিয়ার ওঅরহেড অ্যাকটিভেট করার নিয়ম লেখা আছে। বোতাম টিপে মাস্টার কমপিউটরকে প্রথমেই নির্দেশ দিল রানা: সমস্ত অ্যাকটিভেট সিকোয়েন্স বাতিল করো। উত্তরে কমপিউটর ওর স্ক্রীনে মেসেজ পাঠিয়ে জানাল–নতুন সিকোয়েন্স সেট না করলে কোন ওঅরহেডই অ্যাকটিভেট করা যাবে না।

অনেকক্ষণ পর আবার এক ঝাঁক ভারতীয় জেট ফাইটারকে দেখা গেল, বিশেষ করে এয়ারস্ট্রিপটাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে। এরপর আর দেরি না করে প্রথম দশটা দূরপাল্লার মিসাইলের প্রথমটার স্কেচ ডিসপ্লেতে নিয়ে এলো রানা, দেখল স্কেচের পাশে একটা লাল ফোঁটা জ্বলছে আর নিভছে, নিচে লেখা–লঞ্চিং বাটন। ডিসপ্লের নিচেই সারি সারি অনেক বোতাম, লালটা টিপে দিল রানা।

আন্ডারগ্রাউন্ড মিসাইল কমপ্লেক্স এয়ারস্ট্রিপ থেকে কয়েক মাইল দূরে, তারপরও পশ্চিম দিকের আকাশে ধাবমান ধূমকেতুর মত মিসাইলটাকে দেখা গেল, খাড়াভাবে কিছু দূর কিছুক্ষণ ওঠার পর দক্ষিণ দিকে ঘুরে দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে ।

ফাইটার প্লেনের ঝাঁকটা একরকম লেজ তুলেই পালিয়ে গেল।

হাততালির অস্পষ্ট শব্দ শুনে তাকাল রানা, দেখল হেলিকপ্টারের পাশ থেকে ওকে উৎসাহ দিচ্ছে নাদিরা আর তার সঙ্গীরা।

বাকি নয়টা মিসাইল এক মিনিট পরপর আকাশে তুলে ভারত মহাসাগরের গভীর প্রদেশে পাঠিয়ে দিল রানা, মনে মনে প্রার্থনা করল একটাও যেন কোন জাহাজে গিয়ে না পড়ে।

কাজটা শেষ হতে হ্যাঙ্গারে ঢুকে সেসনায় উঠল ও।

কো-পাইলটের সিটে বসে, হেডসেট পরে, প্রায় বিশ মিনিট অপেক্ষা করতে হলো রানাকে। চরসের আকাশে এখনও কোন ভারতীয় প্লেন নেই। এই সুযোগে হেলিকপ্টার নিয়ে পালাচ্ছে ইরানীরা। তাদেরকে বিদায় জানিয়ে এবার নাদিরাও হ্যাঙ্গারের দিকে ফিরে আসছে।

সেসনায় উঠে নাদিরা কোন প্রশ্ন করল না। রানাও তাকে কিছু জানাবার প্রয়োজন বোধ করছে না। দু'জনেই জানে চরস ত্যাগ করার এখনই সময়, এরপর অনেক দেরি হয়ে যেতে পারে। সম্ভবত অতি সাবধানতার কারণেই ভারতীয় ছত্রীসেনাদের চরসে নামানো হয়নি; তবে নৌ-বাহিনীর জাহাজগুলোর জেটিতে নোঙর ফেলার সময় ঘনিয়ে এসেছে।

হেডসেট পরে এঞ্জিন স্টার্ট দিল নাদিরা, প্লেন নিয়ে বেরিয়ে এলো হ্যাঙ্গার থেকে। এরপর আকাশে ওঠা। কেল্লা ও মিসাইল কমপ্লেক্সের মাথার ওপর একবার করে চক্কর দেয়া। অবশেষে কোর্স সেট করে দক্ষিণ দিকে ছোটা। এই প্রথম মাইক্রোফোনে কথা বলল নাদিরা। 'কোথায় যাচ্ছি জিজ্ঞেস করছ না। তার মানে তুমি জানো।'

রানার মুখ দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই কি চলছে ওর

মাথার ভেতর। 'না, নাদিরা, আমি জানি না। তবে একটু পরই কোর্স পশ্চিম দিকে সেট করতে বলতাম।'

'আমি ভারত মহাসাগরের ওপরই থাকতে চাইছি,' বলল নাদিরা। 'শ্রী লঙ্কাকে পাশ কাটিয়ে বঙ্গোপসাগরের দিকে যাব। রাডারকে ফাঁকি দিতে চাই, তাই কোন দেশের ওপর দিয়ে যাব না।'

'বঙ্গোপসাগরের দিকে যাবে...আমাকে বাংলাদেশে পৌঁছে দেয়ার জন্যে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কি আশ্চর্য! ভুলে গেছ? তোমাকে আমি বলিনি, আমার একটা প্ল্যান আছে, সেই প্ল্যানে এই প্লেনেরও একটা ভূমিকা আছে?'

হঠাৎ রানাকে অস্বাভাবিক গম্ভীর দেখাল। 'এ-ধরনের ওয়ার্নিং আমি কখনও ভুলি না, নাদিরা। কি বলছিলে বলো।'

'সেসনার ভূমিকা হলো–,' হেসে গড়িয়ে পড়ার দশা নাদিরার। 'আমাকে আমার মনের মানুষের বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছে ও।' এই মুহূর্তে আনন্দে এতটাই আত্মহারা, চোখ ও মুখের ভাব এত দ্রুত বদলে যাচ্ছে, মনেই হচ্ছে না সুস্থ কোন মানুষ সে। 'যতটুকু সাধ্য ছিল, তারচেয়ে বেশি করেছি তোমার জন্যে, রানা। তোমাকে আপন করে পাব, এই আশায়। নিজের ক্যারিয়ার ধ্বংস করেছি, আইএসআই-এর সঙ্গে বেঈমানী করেছি, ভণ্ড হোক যাই হোক নিজের স্বামীকে তুলে দিয়েছি তোমার হাতে। খুব বড় একটা পাপও করেছি, রানা। সে-ও ওই তোমাকে পাবার দুর্মর আশায়। কি পাপ শুনবে? বড় ইচ্ছা ছিল আমার মা-বাবা আর ভাইকে যারা খুন করেছে, আমার কৈশোরকে যারা লাঞ্ছিত করেছে তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দেব–অন্তত একটা বোমা ফেলবই ফেলব মস্কোয়। কিন্তু তুমি রাজি নও জানার পর আমি আর জোর করিনি। এটা আসলে চেচনিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। দেশের মাটির সঙ্গে বেঈমানী। এরচেয়ে বড়

পাপ আর কিছু হতে পারে না। এরকম পাপ আরও অনেক করতে পারব আমি। তবে তার আর দরকার হবে বলে মনে করি না। কারণ এত ত্যাগ স্বীকারের পর তোমাকে আমি নিশ্চয়ই পেয়েছি, রানা। কি, পাইনি?'

'হ্যাঁ, মানে, পরস্পরকে বন্ধু হিসেবে তো পেতেই পারি আমরা...'

'বন্ধুত্ব? বন্ধু শব্দটা তো কোন স্পষ্ট অর্থই বহন করে না, রানা! না-না, তোমার আমার সম্পর্কে এতটুকু অস্পষ্টতা বা দুর্বোধ্যতা থাকা চলবে না।' আঙুল তুলে রানাকে যেন হুঁশিয়ার করে দিল। 'আমি কি চাই সেটা বলি, সমস্ত ভুল বোঝাবুঝির অবসান হবে। আমি তোমার সন্তানের মা হতে চাই, রানা। সেই সন্তানকে অবশ্যই বৈধ হতে হবে। আমি হব তোমার কর্মজীবনের প্রেরণাদাত্রী...'

'এ নিয়ে আগেও আলোচনা হয়েছে, সম্ভবত ভুলে গেছ তুমি,' নরম সুরে বলল রানা। 'হ্যাঁ, নানাভাবে তুমি আমাকে অনেক সাহায্য করেছ। সত্যি কথা বলতে কি, তোমার সাহায্য না পেলে আমার এই মিশন সম্ভবত সফল হত না। কিন্তু কোন শর্ত ছাড়াই তুমি আমাকে সাহায্য করার প্রস্তাব দিয়েছিলে, মনে নেই?'

'আমি তো তোমাকে কোন শর্ত পূরণ করতে বলছি না।' নাদিরা নাছোড়বান্দা। 'শুধু বলছি, তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি। স্বপ্ন দেখছি তোমার সংসার করব। গর্ভে তোমার সন্তানকে ধারণ করব...'

'দুঃখিত, নাদিরা,' বলল রানা। 'সত্যি আমি দুঃখিত। এ সম্ভব নয়।'

'স্পষ্ট উত্তরই আমি পছন্দ করি।' নির্লিপ্ত দেখাল নাদিরাকে, মনের সমস্ত জোর এক করে নিজেকে সামলে রাখার চেষ্টা করছে। 'এটাই কি তোমার শেষ কথা, রানা?'

'সত্যি দুঃখিত, নাদিরা...'

'তাহলে আমিও দুঃখিত!' বলল নাদিরা, অকস্মাৎ উল্লাসে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মুখ, উত্তেজনায় চোখ দুটো কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। 'সেসনার একটা বিকল্প ভূমিকাও আছে, রানা!' মাইক্রোফোনে চিৎকার করছে সে, হাত বাড়িয়ে কন্ট্রোল প্যানেলের লাল একটা বোতামে আঙুল ছোঁয়াল। 'সেটা হলো বিস্ফোরিত হওয়া!' রানা বাধা দেবে, এই ভয়ে সময় নিল না, বোতামটা চেপে ধরল নাদিরা।

'একবার নয়, বারবার চাপ দিচ্ছে নাদিরা। কোন বোমা ফাটছে না। সেসনাও বিস্ফোরিত হচ্ছে না, তারপরও থামছে না সে। তার চোখ বেয়ে পানি গড়াচ্ছে। বিড় বিড় করে বলল, 'তোমাকে নিয়ে মরতে চেয়েছিলাম, তা-ও তুমি দিলে না!'

'অনেকেই আমাকে বুঝতে ভুল করে,' নিচু, নরম গলায় বলল রানা। 'আমার পেশাটা কিন্তু মানুষকে মারা নয়, তাদেরকে বাঁচতে সাহায্য করা।' হাত বাড়িয়ে কন্ট্রোল প্যানেলটা যতটুকু পারা যায় নিজের দিকে টেনে নিল রানা। 'লাল বোতামটা দেখেই আমার সন্দেহ হয়, নিশ্চয়ই তুমি কোথাও বিস্ফোরক লুকিয়ে রেখেছ। একটু খুঁজতেই সিটের তলায় পেয়ে গেলাম। কিছু করিনি, শুধু তারের কানেকশন ছিঁড়ে রেখেছি।' সেসনার কোর্স নতুন করে সেট করল ও। তারপর টেনে এনে নাদিরার মাথাটা নিজের কাঁধের ওপর রাখল।

'তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ, রানা?'

'আমাদের গন্তব্য সুইটজারল্যান্ড, নাদিরা,' বলল রানা। 'ওখানে খুব ভাল একটা স্যানাটরিয়াম আছে। আমার এক বন্ধু ওখানকার পরিচালক। আপাতত ওখানেই তুমি থাকবে।'

'কতদিন?'

'এই ধরো এক বছর।'

অনেকক্ষণ আর কোন কথা হলো না। এক সময় নাদিরাই নিস্তব্ধতা ভাঙল। 'এ কিন্তু আমিও জানি, রানা!' তার চোখ দুটো

ঢুলু ঢুলু হয়ে এলো।

'কি?'

'এই যে, আমার মাথায় কিছুটা গোলমাল আছে,' নাদিরার গলা জড়িয়ে আসছে। 'এ-ও জানি যে এক সময় আমি পাগল হয়ে যাব। কিন্তু, কই, চিকিৎসার কথা তো কেউ বলেনি! তুমি ঠিক জানো, এই রোগের চিকিৎসা আছে? পুরোপুরি সুস্থ আমি হব...?'

উত্তরে রানা কিছু বলতে গিয়েও বলল না। নাদিরা ওর কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে।

***

আলোচনা

এই বিভাগে রহস্য সংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোন রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সংকুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। —কা. আ. হোসেন।

চৌধুরী তানভীর রেজা,
শ্রীপুর, মাগুরা।

এইমাত্র রানা-৩১৩ ভাইরাস X-99 বইটা পড়লাম। এক কথায় দারুণ হয়েছে। 'কিলার কোবরা'র পর রানাকে আর কোনও বইতে রোমান্টিক ভাবে পাচ্ছি না। আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে রানার 'আই লাভ ইউ, ম্যান'। কিন্তু কষ্ট লেগেছে যখন রাফেলা বার্ড রানাকে ভুল বুঝল, যখন একে একে মারা পড়ল ল্যাম্পনি আর রডরিক।

* লিখতে গিয়ে আমারও কষ্ট লেগেছিল।

আ. চৌধুরী
কুষ্টিয়া।

এখন আমার বয়স পঞ্চাশ পার হয়-হয়। অনেক আগে যেদিন প্রথম রানা এলো, তখন আমি ঢাকাতেই। সেইদিন থেকেই রানাকে বন্ধু করে নিয়েছি। আজও অক্ষুণ্ন রয়েছে টানটা। অনেকে রানাকে নিয়ে নাক সিটকায়, যা বলে তা শুনলে মেজাজ ঠিক থাকে না। তবে একটা কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, যারা রানার ভক্ত, আর কিছু পারুক না পারুক, তারা রানারই মত সহজে হেরে যেতে জানে না।

তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা যে যাই বলুন, আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঠক রানার দুঃখে কেঁদেছি, হেসেছি ওর আনন্দে। আমার বিশ্বাস, ওদের সমালোচনার তুলনায় আমাদের ভালবাসার পাল্লাটা অনেক ভারী।

ওদের দোষ দিই না, হিংসার বেসাতী তো স্বাধীন দেশের জন্মলগ্ন থেকেই চলছে। এখন তো দেশে আর পশ্চিমারা নেই—খাওয়া-খাওয়ি যা করার নিজেদের মধ্যেই করছি আমরা।

মন খারাপ হলেই রানাকে নিয়ে বসি। পুরানো-নতুন যা পাই পড়ি। কিনতে পারি না খুব একটা, একটা লাইব্রেরীর সদস্য হয়েছি; ওরাও রানার ভক্ত। ওরাই দেয়, বলে: খালা, এখনও রানা পড়েন? বলি: রানা পড়ার জন্যে আবার বয়েস লাগে নাকি? তোদের জন্মের আগে থেকে রানাকে চিনি। ওরা অবাক হয়।

আমার ছেলেও আমারই মত রানা ভক্ত। মেয়েরা বাপের মত বুদ্ধিজীবীর দলে। আমি পড়লে ওরা বলে: আজ তরকারীতে নির্ঘাত নুন হবে না—যা অবস্থা! বলি: নুন দিয়ে নিয়ো। রানা পড়তে দেখে তোমাদের হিংসে হচ্ছে নাকি? মেয়েরা বলে: রানা তোমাকে দখল করে নিলে তো আমাদের হিংসা হবেই, মা তো আমাদেরই। বুঝি এ-হিংসা ভালবাসার, ভাল লাগে। রানা অনেকদিন বেঁচে থাকুক, ভাই, ওকে মারবেন না।

* কিছুতেই না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—আমার নিজের প্রাণের ভয় নেই নাকি! আপনারা সবাই মিলে পিট্টি দিলে পালাব কোথায়?

হাজারটা সাংসারিক ঝামেলার মধ্যে থেকেও আপনি রানার প্রতি যে অবিচল আকর্ষণ ধরে রেখেছেন, এটা বিরাট ব্যাপার, ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। রানা না হয়ে অন্য কোনও বই হলেও এটা একই সমান প্রশংসনীয় হতো। মনটাকে সবুজ রাখতে পারা জীবনের মস্তবড় অর্জন। আপনার ডাক্তার সাহেবও সমান কৃতিত্বের দাবিদার।

আপনাকে ধন্যবাদ।

আজাদ

রঘুরগাঁতী, বহুলীবাজার, সিরাজগঞ্জ-৬৭০০

মাসুদ রানা সিরিজ পড়ি আমি '৮৮ সাল থেকে। সব মিলিয়ে প্রায় ২৫০টির মত বই পড়েছি। দু'দিন আগে 'কর্কটের বিষ' বইটা পড়ে মন খারাপ হয়ে গেল। মামুনের ব্যাপারটা মেনে নিতে খুবই কষ্ট হয়েছে।

সেবা থেকে ভি.পি. যোগে বই নিলে কত পার্সেন্ট কমিশন পাওয়া যাবে? আমি যেখান থেকে বই কিনি তারা দাম তো কম নেয়ই না, কোন কোন বই দামের চেয়ে বেশি নেয়।

* ডাক যোগে বই নিলে তেমন সস্তা হবে না। যদিও কমিশন ২০% দেয়া হবে, ডাক খরচেই বেরিয়ে যাবে পাঁচ-ছয় টাকা। বইয়ের গায়ে লেখা দামই পড়ে যাবে প্রায়।